উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কথ্যভাষা : ইতিবৃত্ত, সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ

সত্যেন্দ্রনাথ বর্মণ
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. (কলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত
গবেষণা নিবন্ধ
১৯৮৩

সূচীপত্র

ভূমিকা

শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা বিশ শতকের '৭০'এর দশকে এসে আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলেও যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু এই জাতীয় গবেষণায় বাংলার উপভাষাসমূহ যে সমুচিত গুরুত্ব পায়নি এ কথাও স্বীকার না করে উপায় থাকে না। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনই সম্ভবতঃ এই ধারার প্রথম পথিকৃৎ। তাঁর 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থের পঞ্চম খন্ডের প্রথম অংশে সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও বাংলা উপভাষাগুলোর পরিচয় বিধৃত হয়েছে। গ্রিয়ারসনের পরেও একাধিক গবেষক বিক্ষিপ্ত ভাবে বাংলার একাধিক উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই বিষয়ে বিধিবদ্ধ এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অভাব পূরণ হয়নি।

গ্রিয়ারসন বা তৎপরবর্তী গবেষকদের এই বিষয়ক সমস্ত গবেষণা-কর্মের পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তাই একমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের খাতিরে এই জাতীয় কতিপয় প্রতিনিধিস্থানীয় গবেষণা-কর্মের একটি কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে উপস্থাপিত হ'ল -

(১) জি,এ,গ্রিয়ারসন — নোটস্ অন দি রঙ্গপুর ডায়লেক্ট্, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ভল্যুম-৪৬, পার্ট-১, নাম্বার-৩, ১৮৭৭, পৃঃ ১৮৬-২২৬

(২) সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী — রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ

(৩) পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবিশ — কামতাবিহারী ভাষা সম্পর্কে বৎকিঞ্চিৎ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

(৪) যতীন্দ্র মোহন চৌধুরী — রঙ্গপুর ভাষার ব্যাকরণ, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ

(৫) গোপাল হালদার — এ ব্রিফ ফোনেটিক স্কেচ অব দি নোয়াখালি ডায়লেক্ট্ অব সাউথ ইস্টার্ন বেঙ্গলী, জার্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অব লেটারস্, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ভল্যুম-১১, ১৯২৯

(৬) গোপাল হালদার — এ স্কেলিটন গ্রামার অব দি নোয়াখালি ডায়লেক্ট্ অব বেঙ্গলী, জার্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অব লেটারস্, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ভল্যুম-২৩, ১৯৩৩

(৭) মুহম্মদ এনামুল হক — চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য ভেদ, চট্টগ্রাম, ১৯৩৫

(৮) এস, সি, চৌধুরী — নোটস্ অন দি রংপুর ডায়লেক্ট্, ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিকস্, ভল্যুম -৭, ১৯৩৯

(৯) কৃষ্ণপদ গোস্বামী — লিঙ্গুইস্টিক নোটস্ অন ময়মনসিং ডায়লেক্ট্, ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিকস্, ভল্যুম-৭, ১৯৩৯

(১০) এস, সি, চৌধুরী — নর্থ বেঙ্গল ডায়লেক্টস্ : রাজশাহী, ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিকস্, ভল্যুম-৮, ১৯৪০

(১১) কৃষ্ণপদ গোস্বামী — লিঙ্গুইস্টিক নোটস্ অন চিটাগাং বেঙ্গলী, ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিকস্, ভল্যুম-৮, ১৯৪০

(১২) ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় — পুরুলিয়া জেলার গ্রাম্য ভাষাতত্ত্ব, পুরুলিয়া, ১৯৫৯

(১৩) শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী — সিলেটি ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৬১

(১৪) ডঃ সুধীর কুমার করণ — সাম আসপেক্টস্ অব সীমান্ত রাঢ়ী ডায়লেক্ট্, বি, পি, এস, সি, ক্যালকাটা, ভল্যুম-৪, পার্ট-১, ১৯৬৩

(১৫) রূপদেব সিংহ রায় — এ সিকসথ্ ডায়লেক্ট্ অব বেঙ্গলী, বি, পি, এস, সি, ক্যালকাটা, ভল্যুম-৪, পার্ট-২, ১৯৬৩

(১৬) বিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য — দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার উপভাষা, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম বর্ষ, ১৯৬৮

(১৭) ডঃ নির্মল দাশ — উত্তরবঙ্গের বাহীর ভাষা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বিশ্বভারতী, ১৯৭০

(১৮) ডঃ নির্মল দাশ — উত্তরবঙ্গের উপভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব, মধুপর্ণী, বালুরঘাট, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৯৭৭

(১৯) ডঃ সুধীর কুমার করণ — "রাজবংশী" লোকভাষা ও "দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙলা", মধুপর্ণী, বালুরঘাট, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৯৭৭

(২০) সুধাংশু শেখর তুঙ্গ — বেঙ্গলী অ্যান্ড আদার ডায়লেক্টস্ অব দি ডিস্ট্রিক্ট্ অব কাছার, গৌহাটি ইউনিভারসিটি, ১৯৭৭ (অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ)

(২১) ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক — প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষার সর্বনাম, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৭৮

লক্ষণীয় যে উপরে প্রদত্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ এবং গ্রন্থাবলীর আলোচনা কোনো কোনো উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোনো একটি উপভাষার পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এগুলিতে বিধৃত হয়নি। অথচ একটি ভাষার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরতে হলে তার উপভাষাগুলোর সম্যক পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ ভাবে উত্তরবঙ্গের উপভাষা সম্পর্কে ভাষা-বিজ্ঞান সম্মত আলোচনার বিষয়টি যে এ পর্যন্ত উপেক্ষিত উপরের তালিকায় তা ও স্পষ্ট

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ' (রুপা অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৭৫) এবং ডঃ সুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত '(ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৫) গ্রন্থে বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র। উপেন্দ্র নাথ বর্মণ এবং ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় যথাক্রমে 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস '(জলপাইগুড়ি, ১৯৫৬) গ্রন্থের ভাষা খন্ডে এবং 'দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল ' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের উপভাষার রূপ-ও রেখা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গ্রন্থকারদ্বয়ের মনোযোগ বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ থাকার ফলে বিশেষ ভাবে এই বিষয়টির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্যাপ্তি এবং ভাষা-তত্ত্বের বিচারে এই দুজনের আলোচনাও তাই অসম্পূর্ণ। ফলতঃ উত্তরবঙ্গের উপভাষা সম্পর্কে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা থেকেই গিয়েছে।

(উত্তরবঙ্গের উপভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়, প্রাচীন ও মধ্যবাংলার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে ভাষাতাত্ত্বিকদের নির্ভর করতে হয় প্রধানতঃ প্রাচীন ও মধ্যবাংলার কতিপয় সাহিত্যিক নিদর্শন, যথা-চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদির উপরে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সাহিত্যের ভাষা সর্বদেশে, সর্বকালে মুখের ভাষা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। কারণ সাহিত্য-কর্মের ভাষায় স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব, অলংকরণ এবং মার্জনার ছাপ পড়ে, এক্ষেত্রে যুগের ভাষাকে শিষ্ট ও সর্বজনীন রূপ দেওয়ার চেষ্টাও বরাবর থাকে। সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার উল্লিখিত নিদর্শনসমূহের ভাষা যে তৎকালীন বাংলাদেশের সাধারণ জনসমষ্টির মুখের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল একথা শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়। ফলতঃ এই সমস্ত নিদর্শনের ভাষাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে প্রাচীন ও মধ্যবাংলার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের চেষ্টা যে অংশতঃ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে একথাও না মেনে উপায় থাকে না। বলা যেতে পারে যে প্রাচীন ও মধ্যবাংলার কথ্য বা মৌখিক নিদর্শনের অভাবই বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনার এই আংশিক অসম্পূর্ণতার মুখ্য কারণ।

এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের উপভাষা এই মৌখিক বা কথ্য নিদর্শনের অভাব পূরণে সক্ষম। কারণ এই উপভাষা ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক কারণে বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে আর অগ্রসর হতে পারেনি। ফলতঃ প্রাচীন ও মধ্যবাংলার অনুমানু বহু উপাদান এই উপভাষায় এখনও বর্তমান।

আলোচ্য উপভাষাটিতে প্রাচীন ও মধ্যবাংলার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাদের সমীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে -

প্রাচীন বাংলা

প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলতে একমাত্র চর্যাপদকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে চর্যাপদের সঙ্গেই ধ্বনিগত ও রূপগত সাদৃশ্য প্রদর্শনের সূত্রে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রাচীন বাংলার বৈশিষ্ট্যসমূহ উদ্ধার করা হচ্ছে -

(১) ধ্বনিগত সাদৃশ্য

(ক) দন্ত্যধ্বনি এবং মূর্ধন্যধ্বনির পার্থক্য চর্যার যুগে সম্ভবতঃ ছিল না। অন্ততঃ চর্যায় অনুসৃত বানানরীতিতে দন্ত্য এবং মূর্ধন্যধ্বনির পার্থক্যের কোনো প্রমাণ নেই। যথা- যাণ এবং যান। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও দন্ত্য এবং মূর্ধন্যধ্বনির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ('ধ্বনিতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(খ) চর্যায় প্রচুর পরিমাণে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য উপভাষাটিতেও স্বরভক্তি প্রায় নিয়মিত ভাবে ঘটে থাকে। যথা- মসতুরার্ < মস্ত, মতুরার < মত্র ইত্যাদি।

(২) রূপগত সাদৃশ্য

(ক) চর্যায় 'সকল' ইত্যাদি বিশেষণ এবং 'জান', 'রোক' ইত্যাদি সমষ্টিবাচক শব্দ যোগে বহুবচনের রূপ গঠন করা হয়েছে। যথা- সকল সমাহিঅ, জোইনি জান ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও এই পদ্ধতিতে 'ঘর্' ইত্যাদি যোগে বহুবচনের রূপ গঠিত হয়। যেমন- ছাওয়ার্ ঘর্ 'ছেলেরা', বাবুর্ ঘর্ 'বাবুরা', ভাতুয়ারার্ ঘর্ 'ভাইয়েরা' ইত্যাদি।

(খ) পদের দ্বিরুক্তি দিয়ে বহুবচনের রূপ গঠন চর্যার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বিশেষতঃ প্রথম পুরুষের এবং সাপেক্ষ সর্বনামের ক্ষেত্রেই এই জাতীয় প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন- জে জে আইলা, তে তে গেলা ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও এই ভাবে প্রথম পুরুষের এবং সাপেক্ষ সর্বনামের ক্ষেত্রে পদের দ্বিরুক্তি দিয়ে বহুবচন জ্ঞাপন করা হয়। যেমন- জায়-জায় 'যারা', তায় তায় 'তারা' ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে আলোচ্য উপভাষাটিতে 'জায়' এবং 'তায়', এই দুটি সর্বনামের ক্ষেত্রে পদের দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে বহুবচনের রূপ গঠন সম্ভব নয়।

(গ) গৌরবার্থে বহুবচনের প্রয়োগ চর্যায় বহুলদৃষ্ট। যথা - তুই পাদাসাম, তুম্হে পাদাসাম, তুম্হু পাদাসাম ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও গৌরবার্থে সর্বদাই বহুবচনের প্রয়োগ ঘটে। যথা - তোমরা 'আপনি', হামরা 'আমি', উমরা 'তিনি', বাবার্ ঘর্ 'বাবা' ইত্যাদি।

(ঘ) চর্যায় বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত বিভক্তিচিহ্নসমূহ নিম্নরূপ -

কর্তৃ -	শূণ্য, এ	যথা - কুম্ভিরে খা, চোরে নিল	(চর্যা সংখ্যা - ২)
কর্ম -	র	যথা - ঠাকুরক পরিনিবিত্তা	(চর্যা সংখ্যা -১২)
সম্প্রদান -	ক, নাই	যথা - দেহু নিঅ নাই	(চর্যা সংখ্যা -৩৭)
সম্বন্ধ -	র	যথা - হরিণীর নিলঅ	(চর্যা সংখ্যা - ৬)
অধিকরণ -	ত	যথা - হাড়িত ভাত নাই	(চর্যা সংখ্যা -৩৩)

উল্লিখিত বিভক্তিগুলি উত্তরবঙ্গের উপভাষায় অভিন্ন ('রূপতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

(ঙ) স্ত্রীবোধক প্রত্যয়গুলি চর্যা এবং উত্তরবঙ্গের উপভাষা, উভয়তই অভিন্ন। যেমন-
চর্যা - শবর, শবরী (চর্যা সংখ্যা-২০), [illegible], শুন্ডিনী (চর্যা সংখ্যা -৩[illegible]),
উত্তরবঙ্গের উপভাষা - বাঙটা, বাউটি 'পুরুষ, স্ত্রী', বামোন্, বাম্নি 'ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী' ইত্যাদি।

(চ) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ব্যবহৃত 'মুই', 'তুই', 'মোর্' ইত্যাদি সর্বনামের ব্যবহার চর্যাতেও লক্ষ করা যায়। যেমন - মই (চর্যা সংখ্যা -১৮), মোর (চর্যা সংখ্যা -৩৩), তই (চর্যা সংখ্যা - ৩১) ইত্যাদি।

(৩) পদবিন্যাসগত সাদৃশ্য

ক্রিয়ার আগে নঞর্থক অব্যয়ের ব্যবহার চর্যায় লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন - ন জাই (চর্যা সংখ্যা-৩৮), না জানুরে (চর্যা সংখ্যা - ৩২) ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও নঞর্থক অব্যয়কে ক্রিয়ার আগে স্থাপন করে বাক্যের গঠন সম্পন্ন হয়। যেমন- ভাত্ না খাঙ্ 'ভাত খাই না', বাড়ি না জাঙ্ 'বাড়ি যাই না', তুই না আসুবু 'তুমি আসবে না' ইত্যাদি।

চর্যা পদের সংখ্যা সীমিত বলে তার বাক্যবন্ধে প্রাচীন বাংলার পদবিন্যাসরীতির সম্যক পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব নয়। ফলে এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গের উপভাষার সঙ্গে তার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের আলোচনায় এর বেশী অগ্রসর হওয়ার উপায় নেই।

মধ্যবাংলা

(১) ধ্বনিগত সাদৃশ্য

(ক) মধ্যবাংলার শেষ পর্বে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে /ই/ এবং /উ/-এর অপিনিহিতি বহুল পরিমাণে ঘটে যেতে থাকে। এই অপিনিহিত স্বরগুলি দুটি অভিশ্রুতি জনিত ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে রূপান্তরিত হয়ে রাঢ়ী অঞ্চলের উপভাষায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু মধ্যবাংলার আদি স্তরে অপিনিহিতি দেখা যায়নি। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও অপিনিহিতি প্রায় নেই বললেই চলে। ফলতঃ অভিশ্রুতি, যা রাঢ়ী উপভাষার ক্ষেত্রে ঘটেছে, তা উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ঘটেনি।

যেমন -

সং অদ্য>প্রাঃ অজ্জ>প্রাচীন ও মধ্যবাংলা আজি>রাঢ়ী আজ, কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় আজি।

সং দৃষ্টিত>প্রাঃ দেক্খিঅ >প্রাচীন বাংলা দেখিঅ>মধ্যবাংলা দেখিআ, দেখি, কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় দেখি বা দেখিয়া।

(খ) মধ্যবাংলায় অনেক ক্ষেত্রেই শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের আদিস্থিত হ্রস্বস্বর /অ/ দীর্ঘস্বর /আ/-তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন- অপর>অবর>আবর, অভিনয়>আভিনয় মহাদান>মাহাদান ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও শ্বাসাঘাত জনিত কারণে শব্দের আদিস্থিত /অ/ অনেক ক্ষেত্রেই /আ/-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন - অবস্থা>আবোস্থা, মহাজন>মাহাজন, অড়া>আড়া ইত্যাদি।

(গ) উত্তরবঙ্গের উপভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল পদান্তস্থিত স্বরধ্বনির দীর্ঘতা। এই বৈশিষ্ট্যটিও সম্ভবতঃ মধ্যবাংলা থেকেই অনুসৃত। যেমন- কুসুম>কুসুমা, কর্পটিক>কাপড়া, ডিম্বক>ডিমা ইত্যাদি।

(২) রূপগত সাদৃশ্য

(ক) 'ইল', 'ইব', প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত ক্রিয়াপদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার মধ্যবাংলায় অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই জাতীয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রচুর। যেমন-

আসিল্ দিন্ 'আগত বা আসন্ন দিন'

দেখিল্ কাম্ 'দৃষ্ট বা উপস্থিত কর্ম'

করিবা কাম্ 'কর্তব্য'

গেইল্ দিন 'বিগত দিন' ইত্যাদি।

(খ) প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত অধিকাংশ বিভক্তি মধ্যবাংলা স্তরে প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছে। ফলে মধ্যবাংলায় প্রচলিত অধিকাংশ বিভক্তি উত্তরবঙ্গের উপভাষার সঙ্গে অভিন্ন (কারক, বিভক্তি পর্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ্ভাবে আলোচনা করা হয়েছে)।

(৩) পদবিন্যাসগত সাদৃশ্য

প্রাচীন বাংলার মত মধ্যবাংলাতেও নঞর্থক অব্যয় অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়ার আগে ব্যবহৃত হয়ে [illegible] বাক্যের গঠন সম্পন্ন করেছে। যেমন- না জীবোঁ না জীবোঁ বিনি রাধা দরশনে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বুলখণ্ড)। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় যে এই বৈশিষ্ট্য এখনও বর্তমান তা ইতোপূর্বে প্রাচীন বাংলার সঙ্গে আলোচ্য উপভাষাটির সাদৃশ্য প্রদর্শন সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার মত মধ্যবাংলার নিদর্শনগুলিও প্রায় সমস্তই পদ্যে রচিত। তাই মধ্যবাংলার পদবিন্যাসরীতির সঠিক পরিচয় এই নিদর্শনগুলি থেকে পাওয়া যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রেও মধ্যবাংলার

সঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষার পদবিন্যাসরীতির তুলনামূলক বিচারে বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ নেই।

প্রাচীন ও মধ্যবাংলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষার এই তুলনাত্মক বিচার মূলতঃ প্রকট সাদৃশ্যের উপরে ভিত্তি করে করা হ'ল। ব্যাপকতর অনুসন্ধান চালালে উল্লিখিত সাদৃশ্যসূত্রগুলি ছাড়াও সাদৃশ্যের আরও সূত্রের আবিষ্কার সম্ভব।

দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন ও মধ্যবাংলার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি, যা আধুনিক বাংলার অধিকাংশ ক্ষেত্রে লুপ্ত, যা বাংলাভাষার ঐতিহাসিক উপাদানে পর্যবসিত, তা উত্তরবঙ্গের উপভাষার প্রাণবন্ত সজীব বৈশিষ্ট্য। এবং প্রাচীন এবং মধ্যবাংলার আরও অনেক বৈশিষ্ট্য উত্তরবঙ্গের উপভাষা থেকে আবিষ্কৃত হতে পারে, এমন সম্ভাবনাও আছে। সুতরাং এই উপভাষার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে অগ্রসর হলে বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে মৌলিক বা তথ্য নিদর্শনের অভাবই শুধু দূর হবে না বা প্রাচীন ও মধ্যবাংলার অনেক অনাবিষ্কৃত বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কারই শুধু সম্ভব হবে না, এর দ্বারা প্রাচীন ও মধ্যবাংলার সামগ্রিক পরিচয় তথা বাংলাভাষার বিবর্তনের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে। সেদিক থেকে বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চার কিছু অপরিহার্য্য বাধা অপসারণের জন্যই নয়, ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদেও উত্তরবঙ্গের উপভাষার বিজ্ঞান সম্মত চর্চার প্রয়োজন আছে।

প্রমুখ কারণে উত্তরবঙ্গের উপভাষাকে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপভাষা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বাচকগোষ্ঠীর ইতিহাস অনুসন্ধান, উপভাষাটির ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব এবং পদবিন্যাসরীতির চরিত্র বিশ্লেষণ এই গবেষণা নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

উত্তরবঙ্গে একাধিক ভাষা-সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী উত্তরবঙ্গে সুপ্রাচীন কাল থেকে তিব্বত-চীনাভাষী কোচ-রাভা, মেচ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতীয় আর্যভাষী রাজবংশী, পলিয়া, দেশীয়, জালিয়া, কৈবর্ত, মুসলমান ইত্যাদি সম্প্রদায় পাশাপাশিভাবে বসবাস করে আসছে। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে সংঘটিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব ইত্যাদি কারণে বিপুল সংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু উত্তরবঙ্গে এসে উপনিবিষ্ট হয়েছে। আগত এই বিপুল জনসমষ্টির যে অংশ রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ইত্যাদি জেলার বাসিন্দা ছিল তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ভাষাগত বৈসাদৃশ্য প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু উল্লিখিত জেলাগুলি ছাড়া অন্যান্য জেলা থেকে আগত জনসমষ্টির দ্বারা বাহিত ভাষা স্পষ্টতই উত্তরবঙ্গের উপভাষা থেকে স্বতন্ত্র। অবশ্য সম্প্রতি আগত জনসমষ্টির এই অংশটিও ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি দিক থেকে উত্তরবঙ্গের পূর্বতন অধিবাসী রাজবংশী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্ম হতে চলেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই শ্রেণীর মানুষেরা নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে যে ভাষা

ব্যবহার করে থাকে তার সঙ্গে পূর্বতন অধিবাসীদের মুখের ভাষার নানা বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। লক্ষণ বিচারে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত জনসমষ্টির এই অংশের ভাষাকে 'বঙ্গালী'-র অন্তর্ভুক্ত করা চলে। পক্ষান্তরে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী উত্তরবঙ্গের পূর্বতন অধিবাসীদের ভাষা ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে 'কামরূপী' উপভাষার অন্তর্গত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গে অন্ততঃ তিনটি বাক-সম্প্রদায় বর্তমান। এই বাক-সম্প্রদায়গুলি হ'ল (এক) তিব্বত-চীনাভাষী,(দুই) কামরূপী উপভাষাভাষী এবং (তিন) বঙ্গালী উপভাষাভাষী। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে দ্বিতীয়োক্ত বাক-সম্প্রদায়ই উত্তরবঙ্গে জনসংখ্যার দিক থেকে সর্ববৃহৎ এবং তিব্বত-চীনাভাষী বৃহৎ বোড়ো গোষ্ঠীর অন্তর্গত কোচ-রাভা,মেচ ইত্যাদি সম্প্রদায়কে বাদ দিলে অধিবাসী হিসেবে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে দ্বিতীয়োক্ত ভাষা-সম্প্রদায়ের ভাষা কামরূপীকেই আলোচনার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে(উত্তরবঙ্গের উপভাষা বলতে ভাষা-তাত্ত্বিকরা কামরূপীকেই বুঝিয়ে থাকেন।)

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বাইরে আসামের গোয়ালপাড়া এবং কামরূপ জেলার কিছু অংশে, সাম্প্রতিক বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর এবং বগুড়া জেলার কিছু অংশে, নেপালের ঝাপা এবং মোরঙ্গ জেলার কিছু অংশে এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলার উত্তর-পূর্বাংশে কামরূপী উপভাষা প্রচলিত। ক্ষেত্র-সমীক্ষা এবং উপাদান সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশস্থ অঞ্চলসমূহ ছাড়া উল্লিখিত, কামরূপীভাষী সমস্ত অঞ্চলেই অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। এইভাবে সংগৃহীত উপাদানসমূহের যথাযথতা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিলে কোনো কোনো অঞ্চলে একাধিকবার অনুসন্ধান চালিয়ে নিঃসংশয়িত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ এবং সংগৃহীত উপাদানসমূহের উপরে ভিত্তি করে, প্রধানতঃ বর্ণনামূলক (Descriptive) ভাষাতত্ত্বের সূত্র অনুসরণে, পূর্বসূরীদের মতামতকে যথাযথ মূল্য দিয়ে আলোচ্য উপভাষাটির ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, পদবিন্যাসরীতি এবং শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে বিশদ্ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া উপভাষাটির এবং তার বাচকগোষ্ঠীর ইতিহাস, শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলার সঙ্গে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, তার অঞ্চল এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক রূপবৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয়কেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আলোচ্য উপভাষাটির নামকরণ সম্পর্কে বিতর্ক যেমন রয়েছে, তেমনি সেই বিতর্কের সমাধানও একটি আয়াসসাধ্য কাজ। উপভাষাটিকে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষা-তাত্ত্বিকরা কামরূপী অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বিশেষতঃ স্যর আব্রাহাম গ্রীয়ারসন, ডঃ সুধীর কুমার করণ, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, শ্রী উপেন্দ্র নাথ বর্মণ প্রমুখ চিন্তাবিদরা এই উপভাষাকে একাধিক স্থানে 'রাজবংশী উপভাষা' বলে অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্বের নিরিখে বিচার করলে দুটি অভিধারই গ্রহণীয়তা বা বর্জনীয়তা সম্পর্কে সমান যুক্তি উত্থাপিত হতে পারে। তবে যে নামটিকেই

গ্রহণ করা হোক না কেন, ভাষাতত্ত্বের বিচারে তা প্রমাণিত হবে না। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে কোনো ভাষা বা উপভাষার জন্যই সমস্ত প্রকার বিতর্কের অতীত, উপযুক্ত কোনো অভিধা শেষ পর্যন্ত হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরন্তু বিষয়টি সামাজিক ভাষাতত্ত্ব (socio-linguistics) -এর এলাকাভুক্ত। একারণে নামকরণ সম্পর্কিত বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে, বাংলা উপভাষাসমূহের বিভাজনের ক্ষেত্রে অনুসৃত আঞ্চলিক বা ভৌম কাঠামোর তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়ে, বর্তমান নিবন্ধে আলোচ্য উপভাষাটিকে 'উত্তরবঙ্গের উপভাষা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই জাতীয় উল্লেখ উপভাষাটির নামকরণের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কোনো অভিমতের দ্যোতক নয়।

বর্তমান গবেষণা-কর্মটি আমার একক প্রচেষ্টার ফল, একথা বললে ভুল হয়। শুভানুধ্যায়ী বহু মানুষের সহযোগিতা এবং উৎসাহে এই গবেষণা প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। এতদঞ্চলের রাজবংশী সমাজের মানুষের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রথমেই জ্ঞাপন করি। কেননা, এই ভাষায় গবেষণার ব্যাপারে এই সমাজের মানুষের নৈকট্য, সহযোগিতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ আমার প্রধান প্রেরণার উৎস।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পুলিন দাস, নির্দেশক হিসেবে গবেষণা-কর্মের প্রতিটি স্তরে মূল্যবান পরামর্শ এবং নির্দেশ দিয়ে আমাকে অশেষ ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই ঋণ বিনিময়-মূল্যে পরিশোধ্য নয়।

এই বিষয়ে সহযোগিতা পেয়েছি বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপকদের কাছেও। বিশেষতঃ অধ্যাপক ডঃ প্রণয় কুমার কুণ্ডু মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করে নানা বিষয়ে উপকৃত হয়েছি। এই বিভাগেরই প্রাক্তন অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত তরুণীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও গবেষণাপত্রটির আদ্যন্ত পাঠ করে ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে, গবেষণা-কর্মের দুর্গমতা অতিক্রম করতে যেভাবে সাহায্য করেছেন, তা এক কথায় বিস্ময়কর। তাঁর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

গবেষণা-প্রচেষ্টায় অনেক সময় নানা সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের বর্তমান সহকারী-অধ্যাপক ডঃ সুভাষ চট্টোপাধ্যায় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাসমূহের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ শিশির দাশ মহাশয়ের সহৃদয় আনুকূল্য ও সহযোগিতায় এই সমস্ত সমস্যা ও জটিলতার অনেকখানি নিরসন ঘটেছে। এঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দিনহাটা মহকুমার অধিবাসী সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর নিজস্ব ব্যাকরণ বিষয়ক গবেষণা-কর্মের পাণ্ডুলিপি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন আর আমাদের বিলাসীপাড়া

কলেজের অধ্যাপক ডঃ রেবতীমোহন সাহা সরবরাহ করেছেন তাঁর নিজস্ব মূল্যবান গ্রন্থাদি। এঁদের দু'জনকেই আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

স্মরণ করি আমার পরম শ্রদ্ধেয়া পিতামহী শ্রীমতী কুঞ্জসুন্দরী দেবীকেও। তাঁর স্মৃতিসংরক্ষিত, এই উপভাষার অধুনালুপ্ত উপাদানসমূহ আমার গবেষণা-কর্মের মূল্যবান সহায়ক হয়েছে। এই সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রশ্ন একান্তভাবে অবান্তর। কেননা, তাঁর কাছে আত্মীয়তার মূল্য আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশী।

ক্ষেত্র-সমীক্ষার কাজে ঋণী করেছেন উত্তরবঙ্গের বাইরেও আসাম, নেপাল ও বিহারের গ্রামাঞ্চলের অগণিত মানুষ। তাঁদের আশ্রয়, সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণা-কর্মের বাস্তবায়ন সম্ভব হত না। শুধু গবেষণার ব্যাপারেই নয়, জীবনের ব্যাপারেও তাঁদের প্রভাব স্পর্শে আমি উদ্দীপনা অনুভব করেছি।

প্রথম অধ্যায়

রাজবংশী জাতির ইতিহাস

ইতোপূর্বে ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্তরবঙ্গের উপভাষার বাচকগোষ্ঠিতে রাজবংশী ছাড়াও একাধিক সম্প্রদায় রয়েছে। তবে জনসংখ্যার দিক থেকে এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে রাজবংশীই সর্বপ্রধান এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও উত্তরবঙ্গের অধিবাসী হিসেবে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর। এই কারণে অনুমান করা চলে যে রাজবংশীই উত্তরবঙ্গের উপভাষা ব্যবহারকারী সর্বপ্রাচীন জনসমাজ, অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি এই বিচারে অপেক্ষাকৃত নবীনতর। উল্লিখিত কারণে বর্তমান নিবন্ধে একমাত্র রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

যথোপযুক্ত ঐতিহাসিক উপাদান এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণার অভাবে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার অধিবাসী রাজবংশী জাতির ইতিহাস আজ অবধি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করতে পারেনি। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে সরকারী উদ্যোগে ভারতের ইতিহাস রচনা, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল অনুসন্ধান, জনতত্ত্ব নিরূপণ, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা এবং সমীক্ষার যে কাজ শুরু হয়েছিল, উল্লিখিত জাতিটির ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য চালাতে গেলে সেই সমস্ত গবেষণা-কর্মের ফলাফলের উপর নির্ভর করতে হয়। এই কাজের আর একটি সহায়ক উৎস হ'ল রামায়ণ, মহাভারত এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে রচিত বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ। প্রাক্‌স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী কালের বাংলা ও বাঙালী জাতির ইতিহাস ও তৎসম্পর্কিত গবেষণা-কর্মের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে এই জাতির ইতিহাস সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। আলোচ্য জাতির ইতিহাস সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্যের এটি তৃতীয় সহায়ক উৎস। রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে আমার জানা মতে প্রথম বই হরকিশোর অধিকারীর 'রাজবংশী কুলপ্রদীপ'। আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসী হরকিশোর অধিকারী মূলতঃ শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপরে ভিত্তি করেই রাজবংশী জাতির ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর বই আকারে পুস্তিকার সমগোত্রীয়। এর প্রকাশকাল ১৩১৪ বঙ্গাব্দ। এর পরে অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলার অধিবাসী মণিরাম কাব্যভূষণ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় দীপক' এবং ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কুল দীপিকা' নামে দুখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্যের অপেক্ষাকৃত সফল প্রয়াস ১৩৪০ বঙ্গাব্দে জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ বর্মনের 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস'। দুর্ভাগ্যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নির্ভর ইতিহাস রচনার অসম্পূর্ণতা দূর করার

জন্য প্রীবর্ধণ ১৩৭০ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই পরিবর্ধিত সংস্করণে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের সংযোগে সংশ্লিষ্ট জাতিটির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হ'ল স্বর্গত চারুচন্দ্র সান্যালের 'দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল' (এশিয়াটিক সোসাইটি, ক্যালকাটা, ১৯৬৫) গ্রন্থখানি। অবশ্য এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিকোণ পূর্ববর্তী সমস্ত প্রচেষ্টা থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু এই গ্রন্থেও রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে রূপ-রেখা নির্ধারণের চেষ্টা রয়েছে। রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে আর একটি গ্রন্থ হ'ল স্বর্গত পতিরাম সিংহার 'কামতারাজ্যে গৌস্থর বিয়' (কোচবিহার, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ)।

ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত গ্রন্থ ছাড়া হাতে লেখা বিভিন্ন পুঁথিতেও রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই জাতীয় পুঁথির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল দুর্গাদাস মজুমদার কর্তৃক পদ্যে রচিত, ১৭৬ পত্রে সমাপ্ত 'রাজবংশাবলী' (রচনা সমাপ্তি কাল ১২৭০ বঙ্গাব্দ) ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত রঙপুর জেলার চাকলা কতেপুরের অন্তর্গত ইটাকুমারী গ্রামের অধিবাসী কবি রতিরামের 'জাগসংগীত' (পুঁথিটির সঠিক রচনাকাল জানা যায়নি)। আসামের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শঙ্করদেবের শিষ্য পণ্ডিত রূপনারায়ণ কর্তৃক অসমীয়া ভাষায় রচিত 'কামতেশ্বর কুলকারিকা' নামক গ্রন্থেও রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজবংশী জাতির উদ্ভব, ভারতে প্রবেশ, অথবা ভারতই তাদের আদি বাসভূমি হলে প্রাচীন ভারতের মানচিত্রে এই বাসভূমির অবস্থান নির্ণয়, ভারতীয় আর্যভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে প্রাগুক্ত সূত্রগুলি উল্লিখিত হ'ল।

ভারতীয় জনতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণার পুরোধাপুরুষ ডাঃ স্যর ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন-এর উপরে ইংরেজ সরকার উনিশ শতকের প্রারম্ভে পূর্বভারতের অধিবাসীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৮০৭ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বুকানন এই তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু সংগৃহীত তথ্যগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্টোগোমারি মার্টিন বুকাননের সংগৃহীত তথ্য সমূহের উপরে ভিত্তি করে 'দি হিস্টরি, অ্যান্টিকুইটি, টোপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত বুকাননের রিপোর্ট অনুসারে বৃহৎ বোড়ো নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত কোচ ও রাজবংশীরা মূলতঃ একই জাতি[১]।

---

(১) মার্টিন মন্টোগোমারি, দি হিস্টরি অ্যান্টিকুইটি, টোপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ১৮৩৮, পৃঃ ৫৩৮

বুকানন ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমদিকে বহিরাগত রাজকর্মচারীদের অধিকাংশই ছিলেন ছিলেন বিদেশী। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই স্থানীয় ভাষা ও কৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি তাঁদের মধ্যে ছিল না। এই কারণে যে সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বুকানন উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তার প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়। আরও একটি কারণে বুকাননের প্রদত্ত রিপোর্টের যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে সংশয়িত হতে হয়। বুকানন মূলতঃ তৎকালীন উত্তরবঙ্গে উপনিবিষ্ট বহিরাগত বাঙালী, নেপালী, অসমীয়াদের প্রদত্ত তথ্যের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজবংশী সমাজের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য তাঁর কাছে যথোপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি। রংপুর জেলা সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টের পর্যালোচনা করলেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই রিপোর্টটি নিম্নরূপ :-

"In this district, by far most important and numerous of these tribes, by the Assamese, Nepalese and by all such Bengalis as are not under the influence of their chiefs, is called indiscriminately Koch and Rajbanshi, and the subdivision and distinctions which they themselves have introduced are considered as effusions of vanity and of no importance, the whole being though low and impure. This opinion is exceedingly disagreeable to their chiefs and many of them observe the Hindu law with such purity that the Mithila and Kamrupi Brahmins admit them to be real Sudras, but the Bengali hold them in the utmost contempt.

I have no doubt however that all the Koch are sprung from the same stock and that most of the Rajbansis are Koch".

---

(২৬) তদেব, পৃঃ ৫৪০

দেখা দেখা যাচ্ছে যে বুকানন তৎকালীন উত্তরবঙ্গে উপনিবিষ্ট বাঙালিদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। একটি শ্রেণী রাজবংশী সমাজপতিদের দ্বারা প্রভাবিত অন্যটি সেই প্রভাব থেকে মুক্ত। প্রকৃত অবস্থা যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে এমন অনুমান সম্ভবতঃ ভ্রান্ত নয় যে ঐ সময়ে বহিরাগত বাঙালি-দের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসী রাজবংশীদের প্রাথমিক সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালিদের একটি অংশের সঙ্গে রাজবংশীদের সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। এই অংশটিই খুব সম্ভব বুকানন কথিত রাজবংশী সমাজপতিদের প্রভাবমুক্ত বাঙালি। সুতরাং রাজবংশীদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর বাঙালিরা যে নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেননি এমন অনুমানও করা চলে। দ্বিতীয়তঃ উনিশ শতকের প্রারম্ভে উত্তরবঙ্গের সদরকেন্দ্রে যে সমস্ত নেপালীর বসবাস ছিল তাঁরা মূলতঃ অফিস-আদালতের দারোয়ান বা ঐ জাতীয় অন্য কোনো পদে কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার তখনও ঘটেনি। সুতরাং এই শ্রেণীর অশিক্ষিত দেওয়া তথ্য কতখানি নির্ভরযোগ্য এ প্রশ্নের অবকাশ শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। সব শেষে বলা যেতে পারে অসমীয়াদের কথা। উনিশ শতকের উত্তরবঙ্গে অসমীয়াদের বসবাস মূলতঃ পুরোহিত বৃত্তির সূত্রে। বর্তমান উত্তরবঙ্গেও অসমীয়া পুরোহিতরা পৌরোহিত্য করে থাকেন। এই অসমীয়া পুরোহিতদের উত্তরবঙ্গে আগমনের পূর্বে রাজবংশী সমাজেরই একটি শ্রেণী তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতেন। এই শ্রেণীটি রাজবংশী সমাজে অধিকারী বলে পরিচিত। আসাম থেকে আগত ব্রাহ্মণরা যে রাজবংশীদের হিন্দু বলে স্বীকার করতেন বুকাননের রিপোর্টেই তা স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, বুকানন তাঁর রিপোর্টে যে তথ্য লিপিবদ্ধ করেননি তা হ'ল এই যে এই ব্রাহ্মণরা রাজবংশীদের হিন্দু বলে স্বীকার করে যজুর্বেদীয় পদ্ধতিতে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। সুতরাং রাজবংশী এবং কোচ সমাজকে অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন করে তাঁরা যে প্রকারান্তরে স্ববিরোধী আচরণ করবেন না এমন অনুমানই সঙ্গত। সেই সঙ্গে বুকাননের রিপোর্টে একথাও স্পষ্ট যে মিথিলা থেকে আগত ব্রাহ্মণরাও রাজবংশীদের হিন্দুত্ব স্বীকার করেছেন। তাহলে বুকাননের কর্মচারীরা কোন শ্রেণীর অসমীয়াদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এ প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যায়।

একই গ্রন্থে সন্নিবেশিত বুকানন প্রদত্ত রিপোর্টের অন্যত্র বলা হয়েছে যে সমস্ত রাজবংশীই কোচ নয়, তবে তাদের অধিকাংশই কোচ। যে সমস্ত স্থানে তারা পালকি বহন করে পতিত হয়েছে সেখানে তাদের নাম কোচ। আবার তাদের মধ্যে যারা শূকর, মুরগী ইত্যাদি খেয়ে এবং পান করে আরো বেশী কলুষিত হয়েছে সেখানে তাদের পরিচয় হ'ল তাহোই বা পাড়োল।[3]

বুকাননের প্রদত্ত রিপোর্টের এই অংশ সম্পর্কে বলা চলে যে রাজবংশীরা সম্পূর্ণভাবে কৃষিজীবি। সাম্প্রতিক কালে এই সমাজভুক্ত অপেক্ষাকৃত নিম্ন অর্থনৈতিক মানের অধিকারী ব্যক্তিদের কেউ কেউ

---

(৩) তদেব, পৃঃ ৫৪৩

হডসনের পরবর্তী গবেষক ই, টি, ডালটন দেহাকৃতির দিক [illegible] থেকে রাজবংশীদের অনার্য বংশোদ্ভূত দ্রাবিড় অথবা বৃহৎ ভুটিয়া গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে চিহ্নিত করেছেন।[৫]

এইচ, বেভারলীর মতে কোচ, রাজবংশী এবং পলিয়া উৎপত্তির দিক থেকে একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তিনি মনে করেন যে রাজবংশী নামটি ভিত্তিহীন এবং সম্ভবতঃ রাজবংশীদের একটি বংশ অন্য জাতির লোক। নিম্নবঙ্গের রাজবংশীরা তাঁদেরই একটি বংশ, কিন্তু দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং গোয়ালপাড়ার অধিবাসী রাজবংশীরা কোচ এবং পলিয়াদের সমগোত্রীয়।[৬]

[illegible] কোচবিহার রাজ্যের একজন ডেপুটি কমিশনার ক্যাপটেন লেউইস-এর মতে কোচবিহার রাজ্যের অধিবাসীরা কোনো নির্দিষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়। ভুটান দুয়ারের অধিবাসী মেচরা এক সময় দক্ষিণাগত অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসাতে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের প্রচলন ঘটে। কোচবিহার রাজ্যের অধিবাসীরা তাদেরই বংশধর। এই মতের যৌক্তিকতা একারণেই স্বীকার্য নয় যে দক্ষিণ দিক থেকে আগত [illegible] গোষ্ঠীর কোনো পরিচয় এতে নেই[৭] এবং মেচ রাজবংশীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি উপজাতি। মঙ্গোলয়েড [illegible] বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মেচরা সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার অধিবাসী। মেচ উপজাতির এই রক্তশুদ্ধতার জন্যই তাদের মধ্যে অন্য কোনো রক্তের সংমিশ্রণ বিশেষ ঘটেনি। এই কথার সত্যতা তাদের গাত্রবর্ণ এবং দেহাকৃতির মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে রাজবংশীরা এই দুদিক থেকেই মিশ্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বলা যেতে পারে যে ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও মেচ ও রাজবংশীদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। মেচদের ভাষা হল [illegible] তিব্বত-চীনা-ভাষার অন্তর্গত। পক্ষান্তরে রাজবংশীরা যে ভাষায় কথা বলে তা ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত। মেচদের সঙ্গে রাজবংশী সমাজের সামাজিক বা বৈবাহিক কোনোপ্রকার সম্পর্কই নেই। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও দুটি সমাজের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

হান্টারের মতে কোচসর্দার হাজো [illegible] পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কামরূপে একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পৌত্র বিশুসিংহ রাজকর্মচারী এবং প্রজাবৃন্দ সহ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং কোচ নাম ত্যাগ করে রাজবংশী হিসেবে পরিচিত হন।[৮]

---

(৫) ডালটন, ই, টি, ডেসক্রিপটিভ এথনলজি অব বেঙ্গল, ১৮৭২, পৃঃ ৮৯-৯২

(৬) বেভারলী, এইচ, সেনসাস রিপোর্ট অব বেঙ্গল, ১৮৭২, অনুঃ-৬, পৃঃ ১৩০

(৭) ক্যাপটেন লেউইস ইন কোচবিহার স্টেট অ্যান্ড ইটস ল্যান্ড রেভিনিউ সেটলমেন্ট, রায়-চৌধুরী, এইচ, এন, ১৯০৩, পৃঃ ১২৫

(৮) হান্টার, ডব্লিউ, ডব্লিউ, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল, ১৮৭৬, অনুঃ-১০, পৃঃ ৪০২

আলোচনায় অন্যত্র হান্টার বলেছেন যে রাজবংশী নামটি, যা সাধারণভাবে রাজকীয় জাতিকে নির্দেশ করে, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার কৃষিজীবি ও সম্মানিত অধিবাসীরাই গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে জাতিপরিচায়ক কোচ নামটি শ্রমিক এবং পালকি বাহকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।[৯] তাঁর মতে রাজবংশীরা অর্ধহিন্দুকৃত আদিম উপজাতি।[১০]

এইচ, বি, রাওনি বলেছেন যে কোচদের সঙ্গে হিন্দুদের অসবর্ণ বিবাহের অনুমতিতে কোচদের পূর্বতন আদিম অভ্যাস, রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যায়। ফলে সবদিক থেকে তারা অন্যান্য উপজাতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাঙালিদের নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। এই ভাবে হিন্দু বা বাঙালীকৃত উপজাতির একটি অংশ হ'ল রাজবংশী। এই রাজবংশীরা কালক্রমে হিন্দু দেব-দেবীর পূজায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এভাবেই হিন্দু রীতি-নীতিকে গ্রহণ করে। রাওনির বক্তব্য অনুসারে কোচ এবং হিন্দুর মধ্যে সংমিশ্রণের ফলে কোচ জাতিরই একটি অংশ হিন্দুকৃত হয়ে রাজবংশীতে পরিণত হয়।[১১] অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য আসলে হান্টারের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র, স্বতন্ত্র কোনো সিদ্ধান্ত নয়।

এইচ, বি, রাওনির পরবর্তী গবেষক এইচ বভিউ-এর মতে কোচ ও রাজবংশীরা অভিন্ন এবং হিন্দু সমাজ বহির্ভূত একটি হিন্দুকৃত আদিম উপজাতি মাত্র। যেহেতু বৈকুন্ঠপুর এবং কোচবিহার রাজ্যের রাজবংশ নিজেদের শিববংশীয় বলে দাবী করে তাই তাদের অনুকরণে রাজ্যের অধিবাসী প্রজারাও, তারা রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত, এই অনুমানে নিজেদের রাজবংশী বলে দাবী করে। তৎকালীন রাজবংশী সমাজের পক্ষ থেকে তোলা ক্ষত্রিয়ের দাবী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে এই দাবীর পেছনে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি বা প্রমাণ নেই।[১২] মোটামুটি ভাবে দেখা যাচ্ছে যে বভিউ-এর এই সিদ্ধান্তও তাঁর পূর্ববর্তী গবেষকদের অনুরূপ।

কিন্তু এইচ, এফ, জে, টি, মেগায়ের-এর বক্তব্য উল্লিখিত গবেষকদের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর মতে- "বৈষ্ণব এবং শৈব, এই দুই শ্রেণীর রাজবংশীদের মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। শৈব রাজবংশীরা কোচ মোঙ্গোলীয়ান বংশগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত [illegible]। উত্তর দিক থেকে আগত এই কোচদের সঙ্গে 'কুম্রি'-দের নানা বিষয়ে সম্পর্ক রয়েছে। এবং এরা রাজবংশী সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব রাজবংশীরা দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত, কৃষিজীবি এবং রাজবংশী সমাজের

---

(৯) হান্টার, ডব্লিউ, ডব্লিউ, স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি অ্যান্ড কোচবিহার, ১৮৭৬, ভল্যুম-১০, পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮

(১০) তদেব, জলপাগুড়ি-পৃঃ ২৫০, কোচবিহার-পৃঃ৩৪১

(১১) রাওনি, এইচ, বি, ওয়াইল্ড ট্রাইবস্ অব ইন্ডিয়া, ১৮৮২, পৃঃ ১৪৪

(১২) বভিউ, এইচ, সেনসাস রিপোর্টস্ অব ইন্ডিয়া, ১৮৯১, মেজো নাম্বার-৩৮৭ জে, পৃঃ ২০

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ। উনিশ শতকের শুরুতে রাজবংশী সমাজে যে ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবী ওঠে সেই দাবী সম্পর্কে মেগায়রও অবহিত ছিলেন। পরিশেষে রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবী যে রংপুর ধর্মসভার অনুমোদন লাভ করেছিল তাঁর রিপোর্টে তাও উল্লিখিত হয়েছে।[১৩]

মেগায়র-এর বক্তব্যের আংশিক সমর্থন মেলে ও,ডোনেল-এর মন্তব্যে। অবশ্য তিনি মেগায়র-এর মত রাজবংশী সমাজকে কোচ এবং মোঙ্গোলীয়ান, এই দুটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করেননি। তাঁর মতে রাজবংশীরা পূর্ব দিকের তিব্বত থেকে আগত মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠীর তৃতীয় প্রবাহেরই একটি অংশ এবং মূল বাসস্থান থেকে অগ্রসর হবার পর তারা [illegible] প্রথমতঃ চন্ডাল, দ্বিতীয়তঃ কোচ এবং শেষতঃ মেচ, এই তিনটি স্বতন্ত্র পরিচয়ে তিনটি পৃথক উপজাতিতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ উৎপত্তির দিক থেকে তিনি সমগ্র রাজবংশী সমাজকে মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৪]

পরবর্তী গবেষক এইচ, এস, রিজলের মন্তব্যে এই মত সমর্থিত হয়নি। বরং এবিষয়ে মেগায়র-এর সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য অপেক্ষাকৃত বেশী। তিনি বলেছেন যে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গের অধিবাসী কোচ, কোচমান্ডি, রাজবংশী, পলিয়া এবং দেশী, এই কটি উপজাতি বৃহৎ দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত এবং তাদের মধ্যে সম্ভবতঃ মোঙ্গোলীয়ান রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবী সম্পর্কে রিজলেও অবহিত ছিলেন। রিপোর্টে এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ।

" উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক কোচ অধিবাসীরা নিজেদের রাজবংশী বা ভঙ্গক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। তারা ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে এবং ব্রাহ্মণসুলভ আচার অনুষ্ঠানও পালন করে। সম্প্রতি তারা এই ভাবে ব্রাহ্মণসুলভ গোত্র ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সেকারণে বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে তারা বর্তমানে একটি কৌতূহলোদ্দীপক [illegible] পরিবর্তনশীল অবস্থায় রয়েছে। যেহেতু তারা সকলেই এক গোত্রের (কাশ্যপ) অন্তর্ভুক্ত তাই তাদের মধ্যে একই গোত্রের ভিতরে বিবাহের প্রচলনও রয়েছে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ সমাজে একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এই ভাবে তারা ব্রাহ্মণদের গোত্রব্যবস্থার প্রাথমিক নিয়ম লংঘন করেছে। সুতরাং রাজবংশীরা আসলে রাজবংশী নামের অন্তরালে কোচ মাত্র। তারা যে ক্ষত্রিয়দেরই একটি শাখা এমন দাবীর পেছনে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তাদের সঠিক পরিচয় হ'ল এই যে তারা দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত।[১৫] রিজলে রাজবংশীদের একাধিক

---

(১৩) মেগায়র, এইচ, এফ, জে, টি, সেনসাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া (রংপুর), ১৮৯১, মেমো নাম্বার-৭০৬-১০, পৃঃ ১-৩

(১৪) ডোনেল, ও, সেনসাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া,, ১৮৯১, অধ্যায়-৩, পৃঃ ২৬২

(১৫) রিজলে, এইচ, এইচ, দি ট্রাইবস্ অ্যান্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল, ১৮৯১, অধ্যায়-১, পৃঃ ৪৯১, এথনোগ্রাফিক গ্লোসারি, ১৯০৩

গেটের মন্তব্য অনুসারে কোচ এবং রাজবংশী অভিন্ন।[১৭] তাঁর এই বক্তব্য পূর্ববর্তী অনেক গবেষকের মন্তব্যের সমর্থক।

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া-তে বলা হয়েছে যে কোচরা নিজেদের রাজবংশী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাদের এই পরিচয় সত্য নয়। দুটি জাতির উৎপত্তি সম্পূর্ণ পৃথক দুটি উৎস থেকে। কোচ রাজারা মোঙ্গোলীয়া মহাগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত, পক্ষান্তরে রাজবংশীরা দ্রাবিড় মহাগোষ্ঠীর বংশধর এবং কোচ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগেই সম্ভবতঃ এই রাজবংশী নামটিকে তারা গ্রহণ করেছে। কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীরা, দেহাকৃতির দিক থেকে যারা সুস্পষ্ট মোঙ্গোলীয়ান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, হয় বিশুদ্ধ কোচ অথবা কমতাপীন কোচদের সঙ্গে অন্য জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত সংকর জাতি বিশেষ, যাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই মোঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য সূচিত হয়েছে।[১৮] এই রিপোর্টেও রাজবংশীদের একটি অংশকে দ্রাবিড় এবং [illegible] আরেকটি অংশকে মোঙ্গোলীয়ান মহাগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধরনের অভিমত ইতোপূর্বে বেগায়ের এবং রিজলের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। তবে উল্লিখিত গবেষকদ্বয় কোচ এবং রাজবংশীকে পৃথক জনগোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেননি, যা এই রিপোর্টে করা হয়েছে। আর একটি দিক থেকে এই রিপোর্টের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। পূর্ববর্তী গবেষকদের প্রায় সকলেই রাজবংশীদের কোচবিহার রাজ-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু এই রিপোর্টে কোচবিহার রাজপরিবার এবং রাজ্যের অধিবাসীদের পৃথক পৃথক মহাগোষ্ঠীর বংশধর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মতের সমর্থন মেলে এইচ, এন, চৌধুরী কৃত 'কোচবিহার স্টেট অ্যান্ড ইট্স ল্যান্ড রেভিনিউ সেটেলমেন্ট' গ্রন্থে প্রকাশিত অভিমতে।[১৯] এই প্রসঙ্গে বিশ শতকের গোড়ার দিকে কোচবিহার রাজপরিবারের প্রতি রাজবংশী সমাজের মনোভাবের কথা উল্লেখ করার মত। রাজানুগ্রহ লাভের আশায় তৎকালে রাজবংশী সমাজের কতিপয় ব্যক্তি কোচবিহার রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলেও সাধারণ লোক এই বিষয়ে অনাগ্রহী ছিল। এই অনাগ্রহের ভাব সাম্প্রতিক কালেও বর্তমান। একালে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়া সত্ত্বেও এই প্রসঙ্গে রাজবংশী সমাজের এই মনোভাব অপসৃত হয়নি। এই বিষয়ে রাজবংশী সমাজের যে স্পষ্ট আপত্তি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটিতে। বলা হত যে-"উমুরা হইল কোচ আর হামরা হইলোঙ্ ক্ষত্রিয়" অর্থাৎ "ওরা কোচ আর আমরা ক্ষত্রিয়"। রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীটি আলোচনা সাপেক্ষ। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক রাজবংশী সমাজ বর্তমান

---

(১৭) গেইট, ই, এ, সেনসাস রিপোর্ট অব বেঙ্গল, ১৯০১, অ্যাপেনডিক্স-১, পৃঃ ৩৮
(১৮) ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া, ১৯০৮, ভল্যুম-১০, পৃঃ ৩৮৩
(১৯) চৌধুরী, এইচ, এন, কোচবিহার স্টেট অ্যান্ড ইট্স ল্যান্ড রেভিনিউ সেটেলমেন্ট, ১৯০৩, পৃঃ ১২৬

কালে ও কোচবিহার রাজপরিবারের সঙ্গে জাতিগত কোনো সম্পর্ক স্বীকার করেনা। রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক দিক থেকে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের বংশধরদের পদবী 'দেওয়ান', 'প্রামানিক' ইত্যাদি সাধারণভাবে রাজবংশীদের পদবী নয়।

ও,ম্যালে রাজবংশীদের বর্তমান সদস্যদের সঙ্গে এক মতে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে রাজবংশীরা বাঙালি মাতা ও ব্রহ্মদেশীয় পিতার সন্তান, অথবা আরাকানী মাতা ও বাঙালি পিতার সন্তান।[20] রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবী সম্পর্কে তিনিও অবহিত ছিলেন। রাজবংশীদের প্রথম দাবী কোচ জাতি থেকে পৃথক জাতি হিসেবে তাদের সেনসাস রিপোর্টে অন্তর্ভুক্তকরণ যে মঞ্জুর হয়েছিল ও,ম্যালের রিপোর্টে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর মত হ'ল এই যে উৎপত্তির দিক থেকে যা-ই হোক না কেন বর্তমানে রাজবংশী ও কোচ যে দুটি পৃথক জাতি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং জাতি হিসেবে ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো বাধা নেই।[21] দেখা যাচ্ছে যে উৎপত্তির প্রশ্নটিকে সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে, এমনকি কোচ ও রাজবংশীকে পৃথক পৃথক জাতি বলে স্বীকার করে নিয়ে এবং রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবী পর্যন্ত মেনে নিয়ে সেনসাস সুপারিনটেনডেন্ট ও,ম্যালে প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান বা প্রশ্নের উত্তর তাঁর রিপোর্টে অনুদ্ঘাটিতই থেকে গিয়েছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী রিপোর্টে ডব্লিউ, এইচ, টমসন বলেছেন যে- "রাজবংশীরা উত্তরবঙ্গের স্থানীয় অধিবাসী এবং প্রদেশের তৃতীয় বৃহৎ হিন্দু জাতি। ময়মনসিংহ, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের কিছু মৎস্যজীবি সম্প্রদায় নিজেদের রাজবংশী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করায় রাজবংশীদের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গের কিছু কোচ নিজেদের রাজবংশী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। রাজবংশীদের মধ্যে অনেকে উপবীত ধারণ করেছে এবং ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবীর স্বপক্ষে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।" বোঝা যাচ্ছে যে রাজবংশী সমাজে ক্ষত্রিয়সমাজভুক্তির দাবীকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা টমসনকে ভাবিত করে তুলেছিল। রিপোর্টের অন্যত্র তিনি বলেছেন যে-" এই দাবী বা মনোভাব এমন প্রবল আকার ধারণ করেছিল যে রাজবংশী সমাজকে তাদের দাবীর অনুকূল প্রতিশ্রুতি না দিলে রংপুরে আদমসুমারীর সমস্ত পরিকল্পনাই বাতিল হয়ে যেত।"[22] অর্থাৎ ও,ম্যালে এবং টমসন মূল প্রশ্নের মীমাংসা ব্যতিরেকেই তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং রাজবংশী জাতির উদ্ভব বিষয়ক আলোচনায় এই দুজনের মতামতের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। তবে আলোচ্য

---

(২০) ও,ম্যালে, এল, এস, এস, সেনসাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯১১, ভল্যুম-৫, পার্ট-১, পৃঃ ৩৯৯

(২১) তদেব, পৃঃ ৪৪৫

(২২) টমসন, ডব্লিউ, এইচ, সেনসাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯২১, ভল্যুম-৫, পার্ট-১, পৃঃ ৩৫৩-৩৫৪ ও ৩৫৮

জাতিটির অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এই দুজনের মতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইতোপূর্বে রিজলের মন্তব্যে জানা গিয়েছে যে যেহেতু রাজবংশীদের মধ্যে সকলেই এক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং একই গোত্রভুক্ত পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক বিধি লংঘন করেছে তাই তাদের হিন্দুত্ব সংশয়াতীত নয়। কিন্তু এ, ই, পোর্টার-এর মন্তব্যে জানা যাচ্ছে যে রাজবংশীদের মধ্যে কাশ্যপ ছাড়াও শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, গৌতম, সাবর্ণা, কপিল, ভাণ্ডি, বাৎস্য, মৌদ্গল্য, আর্তি, পরাশর, কৌশিক, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি গোত্রেরও সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে। তবে তাঁর মতে এই গোত্রগুলির প্রচলন রাজবংশী সমাজে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে ঘটেছে। প্রধানতঃ তাদের ক্ষত্রসমাজভুক্তির দাবীর ভিত্তি দৃঢ় করার জন্যই রাজবংশী সমাজ এই গোত্রগুলিকে গ্রহণ করে।[২৩]

পোর্টার তাঁর মন্তব্যের শেষ অংশে রাজবংশীদের কোচ, পলিয়া ইত্যাদি জাতির সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে আসাম ও উত্তরবঙ্গবাসী কৈবর্তদের সঙ্গে রাজবংশীদের সাদৃশ্য আছে। উনিশ শতকের প্রথমভাগে রাজবংশী সমাজ ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির যে দাবী তুলেছিল সে সম্পর্কে সেনসাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট পোর্টারও অবহিত ছিলেন। তাঁর রিপোর্টে এ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।[২৪]

ইংরেজদের উদ্যোগে পরিচালিত ভারতীয় জনতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণা এবং বিভিন্ন লোকগণনার রিপোর্ট ছাড়াও একাধিক স্থানে রাজবংশী জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ফার্সী ইতিহাসগ্রন্থ মিনহাজের 'তবকাত ই নাসিরী'-তে বর্ণিত তুর্কীদের তিব্বত আক্রমণের বৃত্তান্তে জানা যায় যে বখতিয়ার খিলজী ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত আক্রমণ করেন। জে, এ, দাস,-এর মতে এই আক্রমণের সময় ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ।[২৫] সে যাই হোক না কেন, এই আক্রমণের বৃত্তান্ত থেকে অবগত হওয়া যায় যে সেই সময় লখনাবতী এবং তিব্বত, এই দুটি রাজ্যের মধ্যবর্তী ভুটান পর্বত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সেই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে 'কোচ', 'মেচ' এবং 'থারু' এই তিনটি উপজাতি বাস করত।[২৬]

মিনহাজ এর এই বিবরণের উপরে নির্ভর করে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন-"তুর্কীরা মহম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ(গৌড়) এবং পশ্চিমবঙ্গ(নদীয়া) অধিকার করার পর ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত অধিকারের উদ্দেশ্যে কামরূপ আক্রমণ করে। মিনহাজ-স-সিরাজ রচিত ফারসী ভাষায় ইতিহাসগ্রন্থ, যা তুর্কীদের বঙ্গদেশ অধিকারের কাহিনী বর্ণনা করে(১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) অনুসারে কামরূপ 'কুচ', 'মেজ' এবং 'থারু' (আধুনিক নাম কোংচ বা কোচ, মেচ ও থারু) এই তিনটি উপজাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, যাদের মোঙ্গোলিয়ান অবয়ব এবং তাহা তুর্কীদের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে সম্ভবতঃ তারা এবং তুর্কীরা একই জাতিভুক্ত। ফারসী

---

(২৩) পোর্টার, এ, ই, সেনসাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯৩১, ভল্যুম-৫, পার্ট-১, পৃঃ ৪৭৪

(২৪) তদেব, পৃঃ ৪৭৩

(২৫) দাস, জে, এ, রংপুর গেজেটিয়ার, ১৯১১, পৃঃ ৮

(২৬) মিনহাজ-স-সিরাজ, তবকাত ই নাসিরী(রেভার্টি অনূদিত), লণ্ডন, ১৮৮১

ইতিহাসগ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে এই সমস্ত উপজাতির দেহাকৃতি এবং গাত্রবর্ণ তুর্কীদের অনুরূপ ছিল। (চোখ বোঁজা, নাক বোঁচা, চোয়ালের হাড় উঁচু এবং গাত্রবর্ণ হলুদের দিকে, যা মোঙ্গোলিয়ান বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক) এবং তারা মূল ভারতীয় ভাষা থেকে স্বতন্ত্র এক ধরনের ভাষায় কথা বলত।[২৭]

আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অতঃপর মন্তব্য করেছেন-" উত্তরবঙ্গের স্থানীয় অধিবাসীরা বোড়ো নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত অথবা মিশ্র অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলিয়ান নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সঙ্গে পরবর্তী কালে নিম্নবঙ্গ(ভাটিদেশী) এবং বিহার থেকে আগত জনপ্রবাহ এসে প্রবেশ করে। তারা বর্তমানে প্রধানতঃ কোচ নামে অভিহিত হতে পারে। এই কোচরা হ'ল হিন্দুকৃত অথবা অর্ধহিন্দুকৃত বোড়ো। তারা তাদের নিজস্ব তিব্বত-ব্রহ্মী ভাষা পরিত্যাগ করে বাংলার উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত উপভাষাকে গ্রহণ করেছে,(যার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার নিকট সাদৃশ্য বর্তমান) । যখন থেকে তারা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, তখন থেকে(প্রধানতঃ বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণের আমল থেকে) নিজেদের অস্পষ্ট ও মিথ্যা অতীত গৌরবকে অবলম্বন করে নিজেদের ক্ষত্রিয় বংশী এবং ক্ষত্রিয় বলে দাবী করছে। অথচ একই সময়ে তারা রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য হিন্দুসমাজের একেবারে নিম্নতম শ্রেণী তপশিলী বলে পরিচয় দেয়।"[২৮]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিমত নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে উত্তরাঞ্চল সহ সমগ্র বঙ্গদেশ আর্যভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল। হিউয়েন সাঙের কামরূপের ভাষাকে মধ্য-ভারতের ভাষা থেকে সামান্য স্বতন্ত্র বলার কারণ হিসেবে তিনি কামরূপের ভাষায় তিব্বত-ব্রহ্মী উপাদানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে আর্যভাষা কামরূপের উচ্চারণে ঈষৎ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছিল।[২৯] এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে প্রশ্ন থাকে যে তাহলে হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের ছয়শত বৎসর পরে বখতিয়ার খিলজীর তিব্বত আক্রমণের কালে তিনি অনার্য কোচ তিনটি উপজাতির সঙ্গে পরিচিত হন, যাদের ভাষা মূল ভারতীয় ভাষা থেকে স্বতন্ত্র? ছয়শত বৎসরের ব্যবধানে মধ্যভারতের ভাষার সঙ্গে কামরূপের ভাষার পার্থক্য তো আরও অনেক পরিমাণে কমে আসার কথা। দেখা যাচ্ছে যে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত এই দুটি বিবৃতি পরস্পরের বিরোধী। কিন্তু যদি বলা যায় যে বখতিয়ার খিলজী মূলতঃ পার্বত্য পথ দিয়েই কামরূপ অভিযানে গিয়েছিলেন বলে সমতলবাসী, আর্যভাষী জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি তাহলে একটি বৃত্তান্ত অন্যটির সহগামী এবং পরিপূরক হতে পারে। সুকুমার

---

(২৭) চ্যাটার্জি, সুনীতি কুমার, কিরাত জন কৃতি, ১৯৭৪, পৃঃ ১০০-১০১

(২৮) তদেব, পৃঃ ১১২

(২৯) চ্যাটার্জি, সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলাপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭৫, ভল্যুম-১, পৃঃ ৭৮-৭৯

দাসের 'উত্তরবঙ্গের ইতিহাস' গ্রন্থে তবকাত ই নাসিরী— এর [illegible] অনুসরণে বখতিয়ার খিলজির অভিযানপথের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা এই অনুবাদেরসমর্থক।[৩০] ফলতঃ পার্বত্য কিছু [illegible] উপজাতি এবং তাদের ভাষার সঙ্গেই বখতিয়ার খিলজী এবং তাঁর সৈন্য সামন্তদের পরিচয় ঘটেছিল। কামরূপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বখতিয়ার খিলজির সমতলবাসীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটবার সুযোগ ছিল। কিন্তু পরাজিত, সামান্যসংখ্যক অনুচরের সঙ্গে পলায়নপর বখতিয়ার যে স্বাভাবিকভাবেই সে চেষ্টা থেকে বিরত ছিলেন এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। তার পলায়নের পূর্বেও, যখন বখতিয়া খিলজী যখন সৈন্য-সামন্ত সহ কামরূপ থেকে পশ্চাদপসরণ করছিলেন তখন তিনি কামরূপের অধিবাসীদের গণ অসহযোগের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ফলে যে পথ দিয়ে তিনি ফিরছিলেন তার দুই পার্শ্ববর্তী জনপদ জনশূন্য এবং খাদ্য এবং পশুখাদ্যশূন্য হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সমতলের আর্যভাষী জনসাধারণের সঙ্গে কোনো দিক থেকেই তাঁর পরিচিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। অতঃপর একথা বলা যেতে পারে যে তবকাত ই নাসিরী-এর [illegible] অনুসরণে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশীদের যে পরিচয় দিয়েছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়।

রাজবংশীদের ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তার সঙ্গে ইংরেজ ও দেশীয় গবেষকবৃন্দের মতামতের সাযুজ্য খুবই কম। বলা চলে যে এই সমস্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রাগুক্ত সমস্ত গবেষণা কর্মের ফলাফল থেকে স্বতন্ত্র।

যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে যে [illegible]পুত্রের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়েরা পত্নীপুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুদের সঙ্গে পৌণ্ড্র দেশ থেকে রত্নপীঠে এসে বসবাস শুরু করে। সেখানে ম্লেচ্ছাচারে তারা ক্রমশঃ স্বধর্মচ্যুত হয়। এই স্বধর্ম-চ্যুত ক্ষত্রিয়রাই পরবর্তীতে রাজবংশী নামে খ্যাত।[৩১]

কালিকা পুরাণে উক্ত হয়েছে যে জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়রা ম্লেচ্ছের ছদ্মবেশে ভগবান জল্পীশ দেবের শরণাপন্ন হয় এবং ম্লেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হয়ে ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করতে থাকে। তারা গোপনে মহাদেবকে জপ করে তাঁর পূজা করত।[৩২]

দেখা যাচ্ছে যে কালিকাপুরাণ এবং যোগিনীতন্ত্রের মতে কিছুটা অসামঞ্জস্য রয়েছে। যোগিনীতন্ত্রের মতে ক্ষত্রিয়রা [illegible]পুত্রের ভয়ে রত্নপীঠে এসে আশ্রয় নেয়। পক্ষান্তরে কালিকাপুরাণের মতে তারা জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত হয়ে জল্পীশ দেবের শরণ নেয়। এখন দেখা প্রয়োজন যে যোগিনীতন্ত্রের [illegible]পুত্র এবং কালিকা-পুরাণের জামদগ্ন্য একই না পৃথক পৃথক ব্যক্তি।

---

(৩০) দাস সুকুমার, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, প্র ১৯৮২, পৃঃ ১০৬-১০৫

(৩১) যোগিনীতন্ত্র, ২য় পটল

(৩২) কালিকাপুরাণ, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৪বঙ্গাব্দ, পুষ্পমুক্তি মুখোপাধ্যায়

এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে জামদগ্ন্য পরশুরাম ত্রেতাযুগের ক্ষত্রিয় নিধনকারী বলে প্রসিদ্ধি থাকায়, ঐতিহাসিক পুরুষ নন্দীসুত মহাপদ্মনন্দের সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করে মহাপদ্মনন্দকেই পরশুরাম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আসলে কালিকাপুরাণোক্ত পরশুরাম এবং তামরীতন্ত্রোক্ত নন্দীসুত একই ব্যক্তি। এই অনুমানের সমর্থনে বিষ্ণুপুরাণের কিছু অংশ উদ্ধারযোগ্যঃ-

মহানন্দীসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধ মহাপদ্মনন্দঃ
পরশুরাম ইবাপরোঽখিল ক্ষত্রান্তকারী ভবিতা। ।৪। ।
ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাঃ ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি।[৩৩]

অর্থাৎ মহানন্দীর ঔরসে শূদ্রানীর গর্ভে অতিলোভী মহাপদ্মনন্দের জন্ম হবে। এই মহাপদ্মনন্দ পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় নিধন করবে এবং তখন থেকে শূদ্রই ভূমিপালক বা রাজা হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুরূপ উক্তি করা হয়েছে। বলা হয়েছে "মহানন্দীর ঔরসে, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে ক্ষত্রিয় বিনাশকারী রাজা মহাপদ্মনন্দের জন্ম হবে। সেই রাজা শূদ্রের ন্যায় অধার্মিক হবে এবং পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় নিধন করে পৃথিবীর একচ্ছত্র শাসক পরিগনিত হবে।"[৩৪]

এই প্রসঙ্গে পুরাণ এবং তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে অনুসৃত সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সেখানে সাধারণতঃ একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি এবং এক বা একাধিক শ্রোতা থাকেন। এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি সম্মুখবর্তী শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে কিছু ভবিষ্যৎবাণী করেন। বলাই বাহুল্য, এই ভবিষ্যৎবাণীগুলি, ভবিষ্যৎবাণীতে উক্ত ঘটনাগুলির বিবরণমাত্র। আসলে এইসব ঘটনা পূর্বেই সংঘটিত হয়েছে। ফলতঃ অনেক সময় দেখা যায় যে সর্বদ্রষ্টা ঋষির ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে ঘটনা মিলে যাচ্ছে। আঙ্গিকের এই বিশেষ কৌশলই হ'ল পুরাণ এবং তন্ত্রসমূহের মাহাত্ম্য এবং জনপ্রিয়তার মূল চাবিকাঠি। এইভাবে সর্বদ্রষ্টা ঋষির জবানীতে সংঘটিত ঘটনা [illegible] বর্ণনা করার সময়ে পুরাণ এবং তন্ত্রকারেরা [illegible] নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হতেন। ফলে একই ঘটনার বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রকমের হত। যেমন- কালিকাপুরাণের জামদগ্ন্য তামরীতন্ত্রে হয়েছেন নন্দীসুত। সুতরাং কালিকাপুরাণোক্ত পরশুরাম এবং তামরীতন্ত্রোক্ত নন্দীসুত যে একই ব্যক্তি এ বিষয়ে মোটামুটিভাবে নিঃসংশয়িত হওয়া চলে। অতঃপর প্রশ্ন ওঠে যে তামরীতন্ত্রোক্ত রত্নপীঠ এবং কালিকাপুরাণোক্ত জল্পীশ দেবের অবস্থানভূমি কি এক?

কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে যে কামরূপের বায়ুকোণে অবস্থিত জল্পীশ নামে একটি স্থানে ত্রিপুরারি

---

(৩৩) বিষ্ণুপুরাণ, বরদা এবং সাক প্রকাশিত ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, চতুর্থাংশ, চতুর্বিংশতি অধ্যায়

(৩৪) শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়

মহাদেব আপনার অতুলনীয় লিঙ্গ প্রদর্শন করেন। সেখানে হিমালয় থেকে নিঃসৃত সুতপ্রবাহী নদী জটোদ্ভবা প্রবাহিত। সেই নদীতে স্নান করলে গণাধ্যক্ষের তুল্য পুণ্য লাভ হয়।[34] কালিকাপুরাণোক্ত এই জল্পীশ বর্তমানে জল্পেশ নামে পরিচিত এবং তা জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানা শহরের চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পুরাণোক্ত জটোদ্ভবা নদী 'জর্দা' নামে পরিচিত হয়ে বর্তমানে জল্পীশ বা জল্পেশ দেবের মন্দিরের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত।

মার্টিনের গ্রন্থে বুকাননের প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে কামরূপ 'কামপীঠ', 'যোনিপীঠ', 'মনিপীঠ' এবং 'রত্নপীঠ', এই চারটি পীঠ বা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এবং রাজ্যের সর্বপশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল রত্নপীঠ।[36] খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদের বক্তব্যও এই তথ্যকে সমর্থন করে।[37] যোগিনীতন্ত্রেও এই তথ্যের সমর্থন মেলে।[38] সুতরাং প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত রত্নপীঠেই যে জল্পীশ দেবের অবস্থানভূমি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতঃপর কোনো বাধা থাকে না।

এর পরে যে প্রশ্নটির মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন তা হ'ল এই যে রামগীতোক্ত পৌণ্ড্রদেশ কোথায় অবস্থিত ছিল। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দু'টি পৌণ্ড্রদেশের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[39] অনুমান করা যেতে পারে যে এই দুটি পৌণ্ড্রদেশের একটি দক্ষিণভারতে কেরল প্রদেশের কাছাকাছি এবং অপরটি ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ছিল। আমাদের আলোচ্য ভারতের পূর্ব প্রান্তস্থ পৌণ্ড্রদেশ। মহাভারত বর্ণিত ভারতের ১৫৪ টি প্রদেশের মধ্যে পৌণ্ড্র নামে একটি রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।[40] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হয়েছে যে পৌণ্ড্রদেশ ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ছিল।[41] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন -" পৌণ্ড্র একটি জাতির নাম। ইঁহারা উত্তরবঙ্গে বসবাস করিত বলিয়া এই অঞ্চল পুণ্ড্রদেশ ও পুণ্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত ছিল।---পুণ্ড্রদেশের রাজধানীর নামও ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। প্রাচীনকালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। বগুড়ার সাত মাইল দূরে অবস্থিত মহাস্থানগড়ই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। কারণ মৌর্যযুগের একখানি শিলালিপিতে এই স্থানটি পুণ্ড্রনগরী বলিয়া উল্লিখিত --।[42] মনুসংহিতায়

---

(৩৫) কালিকাপুরাণম্, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, [illegible]

(৩৬) মার্টিন, এম, দি হিস্ট্রি, অ্যান্টিকুইটি, টোপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস্ অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ১৮৩৮, ভল্যুম -৩, পৃঃ ৪০৪

(৩৭) খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, ১৯৩৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩ - ৪

(৩৮) যোগিনীতন্ত্র, একাদশ পটল

(৩৯) বাল্মীকি রামায়ণ, উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

(৪০) মহাভারত (বেদব্যাসকৃত), কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, ১৯৬০, সভাপর্ব, একপঞ্চাশোধ্যায়

(৪১) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ৫৭ ও ৫৮ সংখ্যক শ্লোক

(৪২) মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৭৪, প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ), পৃঃ ৭

বলা হয়েছে যে পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীনা, কিরাত, দরদ, খশ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়রা উপনয়নাদি সংস্কারের অভাবে এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।[৪৩] মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৪ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় কুল্লুক মন্তব্য করেছেন যে ক্ষত্রিয়রা, যারা পৌণ্ড্রদেশে বাস করত, বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করে এবং শূদ্রে পরিণত হয়। মনুসংহিতার বিধান অনুযায়ী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যরা যে কোনো কারণেই হোক, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধান লংঘন করলে ব্রাত্য পদবাচ্য।[৪৪]

সুতরাং যোগিনী তন্ত্র এবং কালিকাপুরাণোক্ত পরস্পরবিরোধী তথা পরস্পর সহযোগী সূত্রের সাহায্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে উপস্থাপিত করলে বিষয়টি এই রকম দাঁড়ায় যে- যোগিনীতন্ত্রের বশীভূত এবং কালিকাপুরাণের জামদগ্ন্য একই ব্যক্তি- ঐতিহাসিক পুরুষ রাজা মহাপদ্মনন্দ। যোগিনীতন্ত্রের রত্নপীঠ এবং কালিকাপুরাণের জল্পীশ দেবের অবস্থানভূমি একই ভূখণ্ড। পৌণ্ড্রদেশ থেকে রাজা মহাপদ্মনন্দের ভয়ে ভীত কিছু সংখ্যক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় করতোয়া নদী অতিক্রম করে রত্নপীঠ বা জল্পীশ দেবের অবস্থান ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণের অভাব বা অদর্শন জনিত কারণে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে বিরত থেকে ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে ক্রমশঃ ম্লেচ্ছে পরিণত হয় ও ম্লেচ্ছতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রত্নপীঠে এসে সংখ্যালঘু পৌণ্ড্রজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানীয় অধিবাসীদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়বে এবং তাদের পূর্বতন ধর্মীয় আচার, ভাষা এবং সংস্কৃতিকে ভুলে যাবে এমন অনুমান অসংগত নয়।

এবিষয়ে অমূল্যচরণ সরকার মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন-"মোঙ্গলীয় শ্রেণীর অতি প্রভাবশালী বোড়ো গোষ্ঠীর লোকদের সংস্পর্শে এসে তৎকালীন দুর্বল রাজবংশী(পৌণ্ড্র ?) জাতি নিজেদের ভাষা হারিয়ে ফেলে। যদিও বহু বছর পরেও তাদের ভাষা ও সামাজিক রীতি কিছু পরিমাণে রূপ পেয়েছে।"[৪৫]

অনুরূপ মন্তব্য করেছেন 'দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল' গ্রন্থের লেখক ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল। তাঁর মতে-"কিছু পৌণ্ড্রদেশবাসী পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় (উত্তরাঞ্চলীয় রাজবংশী) করতোয়া অতিক্রম করে কামরূপে এসে উপনিবিষ্ট হয়েছে। এই ক্ষত্রিয়রা 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়', 'স্খলিত ক্ষত্রিয়' বা 'শূদ্রে পরিণত ক্ষত্রিয়' হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার দাবী করতে পারে।"[৪৬]

'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক উপেন্দ্রনাথ বর্মণও এই মর্মে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৪৭]

---

(৪৩) মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা - ৪৩;৪৪

(৪৪) কুল্লুক কৃত মনুসংহিতার ৪৩ ও ৪৪ সংখ্যক শ্লোকের টীকা

(৪৫) সরকার অমূল্যচরণ, কোচ-রাজবংশী জাতির ইতিহাস আর সংস্কৃতি, বোঙ্গাইগাঁও, ১৯৮৯, পৃঃ ১১

(৪৬) সান্যাল চারুচন্দ্র, দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল, ১৯৬৫, পৃঃ ১১

(৪৭) বর্মণ উপেন্দ্রনাথ, রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩-১৩

বিভিন্ন মত ও বক্তব্যের পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজবংশী সমাজের উদ্ভব বিষয়ে দেশীয় এবং বিদেশী গবেষকবৃন্দ কোনো একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। এই মতপার্থক্যের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে চারটি সুস্পষ্ট অভিমত সৃষ্টি হয়েছে। গবেষকদের একটি অংশের মতে রাজবংশীরা মোঙ্গোলিয়ান নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। একটি অংশের মতে তারা দ্রাবিড় নরগোষ্ঠী ভুক্ত। কারও কারও মতে উল্লিখিত জাতিটি মিশ্র অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় এবং মোঙ্গোলিয়ান নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত। অন্যদিকে পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে উপস্থাপিত করে যে মতটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে সেই মত অনুসারে ক্ষত্রিয় বিরোধী রাজা মহাপদ্মনন্দের অত্যাচারে বিতাড়িত পৌণ্ড্রদেশবাসী ক্ষত্রিয় সমাজের একটি অংশ উত্তরবঙ্গে এসে উপনিবিষ্ট হয়। বর্তমান রাজবংশী জাতি সেই লুপ্তপরিচয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উত্তরপুরুষ।

এই চারটি মতের মধ্যে এককভাবে কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। মতগুলির মধ্যে প্রথম দুটি গ্রহণযোগ্য নয় এই কারণেই যে কোনো একটি জাতি অবিমিশ্রভাবে একটি নির্দিষ্ট জাতির বংশধর, একথা বলা যায় না। ইতিহাসের নিজস্ব নিয়মেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ইত্যাদি সংঘটিত হয়। উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে একাধিক জনপ্রবাহ বয়ে গিয়েছে। কিন্তু এইসব জনপ্রবাহের সবগুলিই যে উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়েছে তা নয়। বরং বলা যায় যে এক একটি জনপ্রবাহ এই অঞ্চলে কিছুকাল অবস্থান করে, ইতিহাসের প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার পরে স্থানান্তরে যাওয়ার সময় এখানকার মাটিতে, জনগঠনে, সংস্কৃতিতে কিছু না কিছু অবশেষ রেখে গিয়েছে। এই অবশিষ্ট অংশই পরবর্তী জনপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখানকার মাটিতে তৈরী করেছে একটি সমন্বিত জন। এই সমন্বিত জনই হ'ল উত্তরবঙ্গের বর্তমান অধিবাসী রাজবংশী সমাজ। মোঙ্গোলিয়ান নরগোষ্ঠীর প্রবেশের পূর্বে এই অঞ্চল নিশ্চয়ই জনহীন ছিল না। অন্ততঃ এই অঞ্চলের বাসযোগ্য সমতল-ভূমিতে তখন কোনো না কোনো জাতি বা উপজাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। সেক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট মোঙ্গোলিয়ান জাতির লোকদের সঙ্গে তাদের কোনো না কোনো প্রকারে সংমিশ্রণ ঘটেছে। কারণ একই ভূখণ্ডের অধিবাসী দুটি জনগোষ্ঠী কখনোই দীর্ঘকাল এক সঙ্গে বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের পরস্পর নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে নিখুঁত সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখতে পারেনা। অবশ্য একেবারেই যে পারে না এমন কথাও বলা যায় না। পারে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল উত্তরবঙ্গের একটি আদিম উপজাতি 'টোটো' উপজাতি। এই উপজাতিটি বিশ শতকের এই সময়েও প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী এবং বহির্জগতের প্রভাব থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য বজায়ের যে চেষ্টা, তার ফল টোটোদের পক্ষে শুভ হয়নি। এর প্রমাণ হ'ল টোটোদের বর্তমান অবস্থা। বর্তমানে টোটো উপজাতির সমস্ত সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকমের একটি ছোট

থেকে এসে ঠেকেছে। বলা যেতে পারে যে টোটো উপজাতির এই রক্ষণশীলতা যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে হয়তো টোটোরা হিন্দুদিনের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু রাজবংশীরা আর্য ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে একটি বিকাশশীল, ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীতে তিব্বতি পরিনত হয়েছে। ফলতঃ এমন অনুমানই সঙ্গত যে বর্তমান রাজবংশী সমাজ যে জাতিরই উত্তরপুরুষ হোক না কেন, তারা আদিম অবস্থা থেকেই প্রতিবেশী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় ছিল অপেক্ষাকৃত গ্রহণশীল এবং উদার মনোভাবাপন্ন। যদি তা না হত তাহলে তাদের সম্ভাবনা পরিনতি হত টোটো উপজাতির মত। গ্রহণ বর্জনের ঐতিহাসিক প্রবাহের সূত্র রাজবংশী সমাজে আদিম অবস্থা থেকেই কার্যকরী হয়েছিল বলেই আর্য ভাষা এবং সংস্কৃতিকে তারা গ্রহণ করতে পেরেছে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বহু জনপ্রবাহ এবং তাদের সংস্কৃতিকে ধারণ করে রাজবংশী জনের গঠন সম্পূর্ণ হতে পেরেছে।

উল্লিখিত যুক্তির ভিত্তিতে রাজবংশীদের উদ্ভব বিষয়ক তৃতীয় মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। রাজবংশী সমাজ ক্ষত্রিয় কি না তা প্রমাণ করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কারণ বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় , বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি বিভাগ নিরর্থক। তাছাড়া অন্য জাতির সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেনি এমন সভ্য জাতিও (জাতি শব্দটি এখানে জনগোষ্ঠীর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে) ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ নেই। সুতরাং রাজবংশী সমাজের জনগঠনে কি কী কী উপাদান রয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য অতঃপর সংশ্লিষ্ট জাতিটির উদ্ভব বিষয়ক চতুর্থ মতটিকে তৃতীয় মতটির পরিপূরক মত হিসেবে গ্রহণ করে নিম্নরূপ তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে গৃহীত মত যুক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে দ্রাবিড়দের আগমনের পূর্বে কোচ্যূহ উত্তরবঙ্গ (পৌণ্ড্রদেশ) মোন-খের নামক একটি জাতির লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তিব্বত-চীনা জাতির লোকেরা তখনও উত্তরবঙ্গে আসেনি। সেই সময়ে বঙ্গ এবং কলিঙ্গ থেকে দ্রাবিড়রা ক্রমশঃ কোচ্যূহ উত্তরবঙ্গে এসে বসবাস শুরু করে। এবং কালক্রমে সেখানকার শাসক শ্রেণীতে পরিনত হয়। এই দ্রাবিড়রাই পরবর্তী কালে নিজেদের আর্যব ধ্বজাকৃত বলে দাবী করতে থাকে।[৪৮] অনুমান করা যেতে পারে যে এই দ্রাবিড়রাই হ'ল পুরাণ এবং তন্ত্রোক্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। এখানে ঐতিহাসিক একটি ঘটনার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সম্ভবতঃ পৌণ্ড্রদেশে উপনিবিষ্ট দ্রাবিড়রা শাসক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে পূর্বতন অধিবাসী মোন-খেরদের শূদ্র আখ্যা দিয়ে তাদের উপরে সামাজিক শোষণ এবং অত্যাচার চালাতে থাকে। ফলতঃ প্রথমদিকে মোন-খেরদের উপরে আধিপত্য ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেও অত্যাচারিত এবং শোষিত মোন-খের জাতি ক্রমশঃ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আর এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন খুব সম্ভব মঙ্গ নামে কোনো একজন সামন্ত রাজা, যিনি সম্ভবতঃ মোন-খের গোষ্ঠীরই লোক ছিলেন। পুরাণ এবং তন্ত্রগুলিতে যে মঙ্গ

---

(৪৮) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭৫ ভলুম-১, পৃঃ ৬৮-৬৯

বা মহাপদ্মনন্দের কথা বলা হয়েছে এই বিদ্রোহের নায়ক নন্দ বা মহাপদ্মনন্দ এবং তিনি একই ব্যক্তি নাও হতে পারেন। জামদগ্ন্য পরশুরামের সঙ্গে চারিত্রিক সাদৃশ্য বশতঃ মহাপদ্মনন্দ যেমন পুরাণ এবং তন্ত্রকারদের দ্বারা পরশুরাম বলে অভিহিত হতে পারেন তেমনি তাদের পৌণ্ড্র দেশের পণবিদ্রোহের নায়ক নন্দ সম্ভবতঃ মহাপদ্মনন্দের সঙ্গে চারিত্রিক সাদৃশ্য বশতঃ মহাপদ্মনন্দ বলে আখ্যাত হয়েছেন। অথবা ঐতিহাসিক পুরুষ মহাপদ্মনন্দ এবং পণবিদ্রোহের নায়ক নন্দ একই ব্যক্তিও হতে পারেন। সে যাই হোক না কেন, পৌণ্ড্র দেশে এই পণবিদ্রোহ দেখা দিলে সেখানকার আর্য বলে পরিচিত দ্রাবিড় বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বিদ্রোহ দমনে অক্ষম হয়ে রত্নপীঠে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই রাষ্ট্রবিপ্লব এবং দ্রাবিড় বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পৌণ্ড্রদেশ থেকে পলায়ন এবং উত্তরবঙ্গে তাদের আশ্রয়-গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার সংঘটনকাল এবং মহাপদ্মনন্দের রাজত্বকালের মধ্যে যদি কোনো সম্পর্ক থাকে তাহলে বলতে হয় যে উত্তরবঙ্গে দ্রাবিড়দের প্রবেশের সময়সীমা হ'ল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগ। প্রচলিত ইতিহাসে রাজা মহাপদ্মনন্দের রাজত্বকাল হ'ল ৩৬৮ থেকে ৩৩৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। এই সময়-সীমার দিকে লক্ষ্য রেখেই দ্রাবিড়দের উত্তরবঙ্গে প্রবেশের এই সম্ভাব্য সময় নির্দেশ করা হ'ল।

আমাদের গৃহীত মত অনুসারে রাজবংশীরা দ্রাবিড় এবং মোঙ্গোল এই দুই নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে, বাংলাদেশে যখন আর্যীকরণ শুরু হয় এবং রাজবংশীদের পূর্বপুরুষরা এই আর্যীকরণের আওতায় আসে তখন তাদের সঙ্গে আর্যরক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। উপরের আলোচনায় উত্তরবঙ্গে দ্রাবিড়দের প্রবেশের কাল সম্পর্কে একটি আপাতস্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গিয়েছে। অতঃপর মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠীর উত্তরবঙ্গে প্রবেশের সময় সম্পর্কিত প্রশ্নটির মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন যে যদিও আসাম এবং উত্তরপূর্ববঙ্গে তিব্বত-চীনা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বোড়ো নামধারী তিব্বত-ব্রহ্মীদের আগমনের সঠিক সময়সীমা জানা যায়নি, তবু বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্টজন্মের কিছু পূর্বে তারা আসাম এবং পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করে ও সেখান থেকে ক্রমশঃ উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।[৪৯] এ বিষয়ে যেহেতু অন্য কোনো প্রামাণ্য তথ্যের উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায় না, তাই আলোচ্য বিষয়টির মীমাংসায় এই মতটিকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণের পক্ষে কোনো বাধা নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গের মাটিতে প্রথমে দ্রাবিড় এবং পরে মোঙ্গোল জনগোষ্ঠীর লোকেরা এসে উপনিবিষ্ট হয়। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমোক্তটির প্রায় তিনশত বৎসর পরে দ্বিতীয়টি উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। সুতরাং এই প্রত্যাশাই স্বাভাবিক যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা মোঙ্গোলীয়ানদের উপরে প্রভাব

---

(৪৯) তদেব, পৃঃ ৬৯-৭০

বিস্তার করে শাসক শ্রেণীতে পরিণত হবে। কিন্তু কার্যতঃ তা হয়নি। বরং দেখা গিয়েছে যে কি জনগঠনে, কি সংস্কৃতিতে, কি রাজনৈতিক আধিপত্যে, সর্বত্র মোঙ্গোলীয়ানরা দ্রাবিড়দের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাক্‌মুসলীম যুগে বাংলাদেশে দশম শতাব্দীতে মোঙ্গো শাখার অন্তর্ভুক্ত কম্বোজ বা কোচরা বাংলাদেশের উত্তরাংশে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। উত্তরবঙ্গে এবং আসামের পশ্চিম অংশে বিশ শতকের প্রথমার্ধেও মোঙ্গোলীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত কোচ রাজারা রাজত্ব করতেন। সর্বক্ষেত্রে মোঙ্গোলীয়ানদের এই প্রাধান্যের কারণ হ'ল এই যে তারা দ্রাবিড়দের তুলনায় সংখ্যায় অধিক ছিল। পক্ষান্তরে পৌণ্ড্রদেশ থেকে বিতাড়িত দ্রাবিড়রা সংখ্যায় ছিল অনেক কম। অনুমান করা যেতে পারে যে পৌণ্ড্রদেশের রাষ্ট্রবিপ্লব অধিক কারণে কম সংখ্যক দ্রাবিড় বা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়কেই দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সে যাই হোক না কেন এই দ্রাবিড়রা পৌণ্ড্রদেশে সাময়িকভাবে গোপ-দের জাতির উপরে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলেও বিতাড়িত হয়ে উত্তরবঙ্গে এসে সংখ্যা গরিষ্ঠ মোঙ্গোলীয়ানদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে দ্রাবিড়রা কি মোঙ্গোলীয়ানদের আধিপত্য বিস্তারে বাধা দেয়নি, এবং এই বাধা দানের ফলশ্রুতিতে কি দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয়নি? হওয়াই স্বাভাবিক, এবং সম্ভবতঃ তা হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস এ প্রসঙ্গে একেবারে নীরব। সুতরাং আমাদের অনুমান করতে হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে দ্রাবিড় এবং তার অন্ততঃ তিনশত বৎসর পরে মোঙ্গোলীয়ান কুশাণরা লোকেরা উত্তরবঙ্গে উপনিবিষ্ট হয়। প্রাথমিক ভাবে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের পরে সমঝোতার সূত্রপাত ঘটে এবং এই সমঝোতার সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতি পরবর্তীকালে সহাবস্থানসূত্রে বসবাসকারী দুটি গোষ্ঠী একটি অখণ্ড মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়, যার বর্তমান নাম রাজবংশী। আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বঙ্গদেশে আর্যীকরণ যখন শুরু হয় তখন রাজবংশীদের পূর্বপুরুষরা সেই আর্যীকরণের বাইরে ছিল না।[৫০] কারণ এই আর্যীকরণের ঢেউ উত্তরবঙ্গকেও প্লাবিত করেছিল। সুতরাং অতঃপর আমরা অনুমান করি যে সেই সময়ে রাজবংশী সমাজের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আর্যদের রক্তগত সংমিশ্রণ, অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে হলেও সংঘটিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক রাজবংশী সমাজ যে দ্রাবিড়, মোঙ্গোলীয়ান এবং আর্য এই তিন বৈশিষ্ট্যের, অর্থাৎ মিশ্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তার প্রমাণ মেলে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে। এই জাতিটি যে শুধু মোঙ্গোলীয়ান বা শুধু দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের শরীরের গঠন এবং গাত্রবর্ণের মধ্যে। উত্তরবঙ্গের মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠীর একটি অবিমিশ্র শাখা হ'ল মেচ উপজাতি। তাদের শারীরিক গঠন এবং গাত্রবর্ণই তার সবচাইতে বড় প্রমাণ। মেচদের সকলেই পীতাভ গাত্রচর্মের অধিকারী। পক্ষান্তরে রাজবংশীদের মধ্যে পীতাভ গাত্রচর্মের অধিকারী যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে কৃষ্ণবর্ণের গাত্রচর্মের অধিকারীরাও। তবুও বলা যেতে পারে যে রাজবংশীদের দেহের অন্যান্য

---

(৫০) চন্দ রমাপ্রসাদ, গৌড় রাজমালা, রাজসাহী, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৭

লক্ষণের বিচারে তাদের মধ্যে মোঙ্গোলীয়ান বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্যই সূচিত হয়। ঈষৎ আবৃত চক্ষু, শক্ত চোয়াল, প্রায় শ্মশ্রু গুম্ফবিহীন মুখমণ্ডল, উর্দ্ধাঙ্গের তুলনায় নিম্নাঙ্গের হ্রস্বতা ই হ'ল রাজবংশীদের শারীর সংস্থানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে দ্রাবিড়রা পৌণ্ড্রদেশে শাসকশ্রেণীতে রূপান্তরিত হওয়ার পরে নিজেদের আর্যবংশোদ্ভূত বলে পরিচয় দিয়েছিল। পরবর্তীকালে মোঙ্গোলীয়ান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সত্তাকে বিলীন করে দিলেও সম্ভবতঃ জাতিগত গৌরবের একটি বোধ তাদের মধ্যে বীজ আকারে নিহিত ছিল। এই বোধই সম্ভবতঃ দীর্ঘদিন পরে, উনিশ শতকের শেষভাগে একটি আন্দোলনের আকারে মাথা বাঁধতে থাকে এবং সমগ্র রাজবংশী সমাজকে ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে। অবশ্য রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির আন্দোলনের এটিই একমাত্র উদ্দীপক কারণ নাও হতে পারে। বাংলাদেশে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকেই আর্যীকরণ শুরু হয় এবং গুপ্ত শাসনকালে, অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে তা মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়।[৫১] কিন্তু বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে এই আর্যীকরণ একই সঙ্গে শুরু হয়ে একই সঙ্গে শেষ হয়েছিল এমন বলা বোধহয় সঙ্গত নয়। শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরম্পরার মধ্য দিয়ে এই আর্যীকরণের ধারা পরবর্তী শতাব্দীগুলি পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে এমন অনুমানই বোধহয় সঙ্গত। বিশেষতঃ বাংলাদেশের প্রান্ত অঞ্চলগুলি সম্পর্কে একথা আরও বেশী করে বলা চলে। উত্তরবঙ্গ ভৌগোলিক বিচারে এই ধরনের একটি অঞ্চল বলে পরিগণিত। সুতরাং এমন অনুমান করা যেতে পারে যে এখানকার অধিবাসী রাজবংশী সমাজে আর্যীকরণ অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়েছে বলে আর্যীকরণের এই ধারা এখানে উনিশ শতক পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। ফলে, সরকারী মহলে যখনই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন জাতি হিসেবে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে তখনই সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আর্যীকৃত রাজবংশী সমাজ নিজেদের আর্যত্বের দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে এই আন্দোলন যে তীব্র আকার ধারণ করেছিল তা তৎকালীন একাধিক জনগণনা আধিকারিকের প্রদত্ত রিপোর্টের পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমার অন্তর্গত খলিসামারী গ্রামের অধিবাসী পঞ্চানন বর্মা। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা আধিকারিকের নিকট যথাসময়ে ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবী পেশ করার উদ্দেশ্য পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে রংপুরে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।। এই অধিবেশনে সমাগত আসাম এবং উত্তরবঙ্গের চারশত প্রতিনিধি একটি দাবীপত্র রচনা করেন। এই দাবীপত্রের মূল কথা ছিল এই যে রাজবংশী এবং কোচকে

---

(৫১) চ্যাটার্জি, সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭০, ভল্যুম-১, পৃঃ ৭৯-৮১

সেনসাস রিপোর্টে পৃথক পৃথক ভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং রাজবংশীকে ক্ষত্রিয় হিসেবে গণনা করতে হবে। উল্লেখ্য যে এই সেনসাসে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে রিপোর্টে তাদের ক্ষত্রিয় বলে ধরা হয়েছিল। ইতোপূর্বে রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি তৎকালীন জনগণনা আধিকারিকের নির্দেশক্রমে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত একটি ব্যবস্থাপত্র তাঁর কাছে প্রেরণ করেছিল। উক্ত ব্যবস্থাপত্রে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। রিপোর্টে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসেবে উল্লেখ এই অনুমোদনেরই ফলশ্রুতি। এর পর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এবং ২৯ মে তারিখে অনুষ্ঠিত রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতির ২য় বার্ষিক অধিবেশনে রাজবংশীদের ব্রাত্যত্ব মোচন করে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৭শে মাঘ তারিখে দিনাজপুর জেলার ডোমার থানার অন্তর্গত পেরলবাড়ি গ্রামে ক্ষত্রিয় মহামিলন দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আসাম এবং উত্তরবঙ্গের নানা স্থান থেকে সমাগত প্রায় একুশ হাজার রাজবংশী ব্রাত্যত্ব মোচন করে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে এই অনুষ্ঠানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রাজবংশীরা ব্রাত্যত্ব মোচন এবং উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের অনুষ্ঠান করতে থাকে। ২৭ শে মাঘ তারিখটি এভাবেই রাজবংশী সমাজের কাছে একটি স্মরণীয় দিবসের মর্যাদা পায় এবং এই সংস্কার কার্যের কেন্দ্রীয় পুরুষ হিসেবে পঞ্চানন বর্মাকে রাজবংশী সমাজে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বর্তমান উত্তরবঙ্গেও নানা স্থানে ঠিক ২৭ শে মাঘ তারিখটিতে রাজবংশীরা সমবেতভাবে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে সেই দিনটিকে স্মরণ করে থাকে।[52] এইভাবে রাজবংশীরা তাদের ক্ষত্রসমাজভুক্তি সম্পর্কিত দাবীর রূপায়ণের প্রাথমিক পর্বটি নিজেরাই সমাপ্ত করে এবং অবশিষ্ট কাজটুকু সমাপ্ত হয় ১৯১৩ সালে তৎকালীন জনগণনা আধিকারিক ও,ম্যালের একটি রিপোর্টের মাধ্যমে। এই রিপোর্টে তিনি কোচ এবং রাজবংশীকে পৃথক পৃথক জাতি হিসেবে স্বীকার করেন।[53] বর্তমানে রাজবংশী সমাজ অনুন্নত জাতির তালিকাভুক্ত। সেনসাস রিপোর্টে জাতির ঘরে তাদের ক্ষেত্রে রাজবংশী লেখা হয় কিন্তু রিপোর্টে ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়।

রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির আন্দোলনের এই ইতিহাস থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আর্যীকরণের ধারায় এই গ্রহণশীল মানবগোষ্ঠী শুধু আর্য ভাষা ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করেই সন্তুষ্ট থাকেনি, আর্যদের সমান সামাজিক মর্যাদা লাভের একটি গণ অভিপ্রায়ও তাদের ভিতরে দীর্ঘকাল থেকে সংগুপ্ত ছিল। এই অভিপ্রায় ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত এইভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

---

(৫২) বর্মণ উপেন্দ্র নাথ, রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৬-৬৭

(৫৩) ও'ম্যালে, এল, এস, এস, সেনসাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯১১, ভল্যুম-৫, পার্ট-১, পৃঃ ৪৪৫

দুটি আদিম মানবগোষ্ঠী নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে এভাবেই একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে শেষ পর্বে এই দুটিগুলির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ রূপে একতাবদ্ধ হয়। রাজবংশী জাতির উদ্ভব ও বিবর্তন প্রসঙ্গে এখানেই এই ইতিকথার প্রাসঙ্গিক মূল্য নিহিত।

রাজবংশী জাতির আর্যিকরণ প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত বৃত্তান্তে কথিত ঘটনাটি এই ধারার সর্বশেষ বিশেষত্ব-চিহ্নিত ঘটনা হলেও এই জাতির ভিতরে আর্যিকরণের সূত্রপাত কিন্তু বহু পূর্বেই ঘটেছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলাদেশে আর্যিকরণ শুরু হয় মৌর্য শাসনকালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এবং গুপ্ত শাসনকালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে তা সমাপ্ত হয়। তাঁর মতে এই সময়ের মধ্যে আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসার লাভ করে। এই মন্তব্যের সূত্রে বলা যায় যে বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো একই সময়ে উত্তরবঙ্গেও আর্যিকরণ শুরু হয়। এবং সাম্প্রতিক রাজবংশীদের পূর্ব-পুরুষরাও সেই সময় থেকে আর্যীকৃত হতে থাকে, যার সমাপ্তি বিশ শতকের প্রথম ভাগে। খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে যে রাজবংশীরা আর্য ভাষাকে গ্রহণ করেছিল, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর মন্তব্যের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশের অধিবাসীরা ভারতীয় আর্যভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল।[৫৪] হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আসেন। অঙ্গ এবং কলিঙ্গ থেকে গঙ্গা পার হয়ে তিনি প্রথমে পুণ্ড্রবর্ধনে বা কেন্দ্রীয় উত্তরবঙ্গে আসেন। সেখান থেকে তিনি কামরূপে যান। তৎকালীন কামরূপের অধিবাসীদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হ'ল এই যে কামরূপের অধিবাসীরা সরল, ব্যবহারে সৎ, ক্ষুদ্র আকৃতিবিশিষ্ট এবং পীতবর্ণের গাত্রবর্ণের অধিকারী। তাদের ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে এই সব অধিবাসীদের ভাষা মধ্যভারতের ভাষা থেকে সামান্য পরিমাণে পার্থক্যযুক্ত।[৫৫]

লক্ষণীয় যে হিউয়েন সাঙ পৌণ্ড্রবর্ধন বা কেন্দ্রীয় উত্তরবঙ্গের ভাষা সম্পর্কে কিছু বলেননি, কেবল কামরূপ বা সাম্প্রতিক পশ্চিম আসামের ভাষাকে মধ্যভারতের ভাষা থেকে ঈষৎ পার্থক্যযুক্ত ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং এ অনুমান অসংগত নাও হতে পারে যে তৎকালীন পৌণ্ড্রবর্ধনের ভাষার সঙ্গে মধ্যভারতের ভাষার সাদৃশ্য থাকতেই তিনি সেই অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। এই অনুমান থেকে অতঃপর এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগেই কেন্দ্রীয় উত্তরবঙ্গে ভারতীয় আর্য-ভাষা অবিকৃতভাবেই গৃহীত হয়েছিল। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ভারতীয় আর্যভাষার যে উচ্চারণ-বৈষম্য বাংলা থেকে অসমীয়াকে পৃথক করেছে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ আসামের পশ্চিমাঞ্চল বা

---

(৫৪) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭৫ অধ্যায়-১, পৃঃ ৭৭-৭৯

(৫৫) বিল, এস, রেকর্ডস অব দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, লন্ডন, ১৯০৬, পৃঃ ১৯৪ এফ, এফ,

কামরূপের অধিবাসীদের মুখে ভারতীয় আর্যভাষার সেই ঈষৎ ভিন্নতাযুক্ত উচ্চারণই শুনে শুনে থাকবেন, যা থেকে তাঁর মনে হয়েছিল যে কামরূপের ভাষার সঙ্গে মধ্যভারতের ভাষার কিছু পার্থক্য আছে।৫৬ সুতরাং অতঃপর বাংলাদেশে আর্যভাষার অধিগ্রহণ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতকে পুরোপুরি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই এবং তার সঙ্গে একথাও যোগ করা যেতে পারে যে তৎকালীন কামরূপ এবং উত্তরবঙ্গের অধিবাসী রাজবংশীরাও আচার্য সুনীতিকুমার কর্তৃক নিরূপিত সময়সীমার মধ্যেই আর্যভাষাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিল।

পরিশেষে তথ্য, প্রমাণ এবং যুক্তির উপরে ভিত্তি করে রাজবংশী জাতির উদ্ভব সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে দ্রাবিড় বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি অংশ তৎকালীন কামরূপ, সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গে এসে বসবাস শুরু করে। এর কিছুকাল পরে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে তিব্বত-চীনা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বৃহৎ বোড়ো শাখার তিব্বত-ব্রহ্মভাষী কোচ, মেচ, বোড়ো, কাছারি, রাভা ইত্যাদি উপজাতির লোকেরা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এই উপজাতিগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু একটি অংশ, যারা অপেক্ষাকৃত কম রক্ষণশীল, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি সমন্বিত জন গঠন করে। এই সমন্বিত জনই হ'ল সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গের অধিবাসী রাজবংশী সমাজ, যাদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে আর্যদের রক্তগত সংমিশ্রণ ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান করা যায়। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই জনের অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা আর্যভাষা এবং সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করে চলেছে, এবং এই আর্যীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে, খ্রীষ্টপর সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই ভারতীয় আর্যভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছে। কিন্তু ধর্ম এবং সংস্কৃতির দিক থেকে আর্যীকরণের স্রোত এই মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও প্রবহমান। শিক্ষাবিস্তার এবং বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগস্থাপন, এই দুটি উপায়ে সাম্প্রতিক কালে এই গোষ্ঠীর লোকেরা একটি পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে আত্মবিস্তার করে চলেছে।

---

(৫৬) চ্যাটার্জি সুনীত কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭০
অধ্যায়-১, পৃঃ ৭৯

বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এ পর্যন্ত শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলাই ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, দ্বিজেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকরা মূলতঃ শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেছেন।[৫৭] অবশ্য বাংলার বিভিন্ন উপভাষা সম্পর্কে তাঁরা যে একেবারে নীরব একথাও বলা যায় না। এ সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত-ভাবে কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে কোনো আলোচনাতেই সবগুলি উপভাষার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সামগ্রিক নির্ধারণের চেষ্টা হয়নি। অর্থাৎ উপভাষা সমূহের ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্য সহ পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অভাব শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের অধিবাসী রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত ভাষাও একারণেই অদ্যাবধি প্রায় একটি অনালোচিত বিষয়। এ সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ চোখে পড়ে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন-এর সমীক্ষায়। তিনিই সর্বপ্রথম রংপুর এবং এই জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তবর্তী জেলা দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চল, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসী রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে যেহেতু প্রধানতঃ রাজবংশীরাই এই ভাষা ব্যবহার করে তাই সাধারণভাবে এটিকে রাজবংশী ভাষা বলা হয়। কিন্তু এটি আসলে বাংলারই একটি উপভাষা।[৫৮] গ্রীয়ারসনের শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি যে সঠিক আলোচনার অগ্রগতিতে তা প্রমাণিত হবে। কিন্তু আলোচ্য উপভাষাটির ভৌগোলিক পরিসীমা নির্দেশের ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত অসম্পূর্ণ। অবিভক্ত বাংলা দেশের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য অঞ্চলগুলি বাদে দার্জিলিং, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার উত্তর-পূর্বাংশ, নেপালের ঝাপা জেলার কিছু অংশ এবং আসামের গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার কিছু অংশেও রাজবংশীরা বসবাস করে। উল্লিখিত অঞ্চলসমূহে প্রচলিত তাদের মুখের ভাষায় অঞ্চলবিশেষে ধ্বনিগত এবং রূপগত কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও মূল কাঠামো মোটামুটিভাবে সর্বত্রই এক রকম। বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচিত সমীক্ষার ক্ষেত্র মূলতঃ উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা হলেও সাম্প্রতিক বাংলা-দেশের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ইত্যাদি জেলা থেকে আগত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য আসাম, নেপাল এবং বিহারের পূর্বোক্ত অঞ্চলগুলিতেও সমীক্ষা চালানো হয়েছে। পরিশেষে এই সমীক্ষার ভিত্তিতে এই মত গ্রহণ করা হয়েছে যে উত্তরবঙ্গের বাইরেও এই সমস্ত অঞ্চলে রাজবংশীদের দ্বারা ব্যবহৃত ভাষারূপটি প্রচলিত। সুতরাং অতঃপর একথা নিঃসংশয়িতভাবে

---

(৫৭) ক) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭০
খ) সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫ গ) বসু দ্বিজেন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা
১৯৭৫

(৫৮) গ্রীয়ারসন, জি, এ, লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ১৯৬৮, ভল্যুম-৫, পার্ট-১, পৃঃ ১৮, ১৬৩

বলা যেতে পারে যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত উপভাষার ভৌগোলিক সীমা নির্দেশের ক্ষেত্রে গ্রীয়ারসনের সিদ্ধান্ত অংশতঃ অসম্পূর্ণ।

গ্রীয়ারসনের মতানুসারে দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলে রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার একটি আঞ্চলিক বিভাষা রয়েছে, যাকে তিনি 'বাহে উপভাষা' নামে চিহ্নিত করেছেন।[৫৯] তাঁর এই সিদ্ধান্তও যুক্তিসহ নয়। দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষার উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষার কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে একথা সত্য। আমাদের সমীক্ষায় এই স্বাতন্ত্র্য আমরাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র উপভাষার পরিকল্পনা বা উল্লিখিত উপাদান বৈচিত্র্যের জন্য একটি অঞ্চলের ভাষাকে স্বতন্ত্র বিভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা সঙ্গত নয়। আর যদি যুক্তির খাতিরে একথা মেনেও নেওয়া হয় যে এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষা একটি স্বতন্ত্র বিভাষা হিসেবে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, তথাপি এর নামকরণ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ কিন্তু থেকেই যায়। আমাদের সমীক্ষালব্ধ তথ্য অনুসারে 'বাহে' রাজবংশীদের ভাষায় একটি সম্বোধন পদ। পিতৃস্থানীয় এবং মাতৃস্থানীয়রা পুত্রস্থানীয় এবং কন্যাস্থানীয়দের সম্বোধন করার সময়ে এবং অনুরূপভাবে পুত্রস্থানীয় এবং কন্যাস্থানীয়রা পিতৃস্থানীয় এবং মাতৃস্থানীয়দের সম্বোধন করার সময় এই পদটি দ্বারা সম্বোধন করে। ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় পদটি উভয়লিঙ্গবাচক। তুলনীয় বাংলা সম্বোধন পদ 'বাপুহে'। তবে এই অনুমানই সঙ্গত যে বাংলা সম্বোধন পদ 'বাবাহে' থেকেই বাহে শব্দটি নিষ্পন্ন। এই বিষয়ে একটি বিকল্প অনুমানও করা যায়। প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী কোচ-রাভাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে কোচ রাভা ভাষার অনেক শব্দ প্রায় অবিকৃতভাবেই রাজবংশীদের ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কোচ-রাভা ভাষায় 'বায়' শব্দটির অর্থ হ'ল বন্ধু বা দেবতা। আমাদের অনুমান, এই শব্দটি রাজবংশীদের ভাষায় গৃহীত হওয়ার পরে তার সঙ্গে বাংলা সম্বোধন পদ 'হে' যুক্ত হয়ে শব্দটি প্রথমতঃ 'বায়হে' এবং সবশেষে 'বাহে', এই রূপ নিয়েছে। কোনো কোনো অঞ্চলে বাহে-এর পরিবর্তে 'বায়' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত দুটি অনুমানের মধ্যে কোনটি সমর্থনযোগ্য এবিষয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু বাহে যে একটি সম্বোধন পদ মাত্র এবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সুতরাং বাহে নামে একটি অঞ্চলের উপভাষাকে চিহ্নিত করার বিষয়টি যে যুক্তিযুক্ত নয় একথা শেষ পর্যন্ত বলা যায়।

বাংলা এবং তার উপভাষাগুলির নামকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় যে এই নামকরণ মূলত আঞ্চলিক ভৌম কাঠামোর উপরে ভিত্তি করেই করা হয়েছে। ভাষা বা উপভাষার নামগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষা বা উপভাষার নামকরণের ক্ষেত্রে আর একটি পদ্ধতি অনুসৃত হতে দেখা

---

(৫৯) তদেব, পৃঃ ১৮

যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে সাধারণতঃ বাচকগোষ্ঠীর নাম অনুসারেই ভাষার নামকরণ করা হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হ'ল এই যে দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলে বাহে নামে কি কোনো সম্প্রদায় আছে, যার নামানুসারে তাদের ভাষার নাম 'বাহে উপভাষা' হতে পারে? এই প্রসঙ্গে একটি তথ্যের উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। রাজবংশীদের মুখে বাহে শব্দটির প্রয়োগের আধিক্য লক্ষ্য করে পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত অনেকেই রাজবংশীদের 'বাহে জাতি' বলে ভুল করে থাকেন। কিন্তু পূর্বোক্ত আলোচনার নিরিখে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে অঞ্চল নির্বিশেষে সমগ্র রাজবংশী সমাজে বাহে একটি সম্বোধনপদ, বাহে নামে কোনো পৃথক সম্প্রদায় দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলে নেই। রাজবংশীদের মধ্যেও বাহে নামে কোনো সামাজিক উপবিভাগ নেই। সুতরাং যদি ধরে নেওয়া হয় যে গ্রীয়ারসন ভাষার নামকরণের স্বীকৃতিযুক্ত পদ্ধতি অনুসারে দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের ভাষার নামকরণ করেছেন তাহলেও বলতে হয় যে এক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা সঠিক নয়।

গ্রীয়ারসনের এই ভ্রান্তির একটি সম্ভাব্য কারণ এখানে নির্দেশিত হচ্ছে। গ্রীয়ারসন মূলতঃ বিভিন্ন স্তরের সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে তাঁর সমীক্ষার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। ভারতের সমস্ত অঞ্চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে যে সম্ভব হয়ে ওঠেনি একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এমন হয়ে থাকতে পারে যে দক্ষিণ অথবা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কোনো বাঙালী তাঁকে উত্তরবঙ্গের ভাষা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছিলেন, যিনি তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের মুখে বাহে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করে তাদের বাহে বলে ভুল করেছিলেন। আর গ্রীয়ারসন যে রাজবংশীদের দ্বারা ব্যবহৃত ভাষাকে প্রথমতঃ রাজবংশী ভাষা বলে চিহ্নিত করেছিলেন একথা ইতোপূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও তিনি যে বাচকগোষ্ঠীর নাম অনুসারে ভাষার নামকরণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ একারণেই গ্রীয়ারসন দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের উপভাষাকে বাহে উপভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজবংশীদের ভাষা সম্পর্কে প্রথম সমীক্ষকের মর্যাদা গ্রীয়ারসনেরই প্রাপ্য। বর্তমান নিবন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তের শেষ অংশকে সমর্থন করে, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত ভাষাকে বাংলা ভাষারই একটি উপভাষা হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করা হবে।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা ভাষাকে চারটি প্রধান উপভাষায় বিভক্ত করেছেন। তাঁর বিভাজন অনুসারে রাঢ়, বরেন্দ্র, কামরূপ এবং বঙ্গ, বাংলা-ভাষার এই চারটি উপভাষা রয়েছে।[৬০] সুকুমার সেনের মতে বাংলা ভাষার উপভাষা পাঁচটি। এই উপভাষাগুলি হ'ল ১) রাঢ়ী, ২) ঝাড়খণ্ডী, ৩) বরেন্দ্রী, ৪) বঙ্গালী ও ৫) কামরূপী[৬১]। দেখা যাচ্ছে যে

---

(৬০) চ্যাটার্জি সুনীতিকুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭৫, ভল্যুম-১, পৃঃ ১৩৮-১৪০

(৬১) সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ১৮৪

উপভাষা বিভাজনের ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে সামান্য পরিমাণে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু উপভাষাগুলির ভৌগোলিকসীমানির্দেশের ক্ষেত্রে দুজনের মতে কোনো পার্থক্য নেই। অন্ততঃ কামরূপী উপভাষার ভৌগোলিক সীমানির্দেশ দুজনের ক্ষেত্রে একই রকম। তদনুসারে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে যে গ্রীয়ারসন কথিত 'স্বতন্ত্র উপভাষা' বা রাজবংশীদের ভাষাই হ'ল কামরূপী উপভাষা। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বলা যেতে পারে যে প্রকল্পভুক্ত মানবগোষ্ঠীটির ব্যবহৃত ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বাংলাভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ বাংলাভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও রাজবংশীদের ব্যবহৃত ভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাস অংশতঃ অভিন্ন। সুতরাং একারণেই আলোচ্য ভাষাটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত আলোচনা সুরু করার আগে বাংলা ভাষার বহু আলোচিত উৎপত্তির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন।

গ্রীয়ারসন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলাভাষার উৎপত্তি হয়েছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতানুসারে প্রাচ্য বৈয়াকরণদের দ্বারা কথিত 'গৌড়ী অপভ্রংশ' থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। উল্লিখিত এই দুটি মতের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত মতটির যৌক্তিকতা আলোচনা সাপেক্ষ। বাংলা-ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং গ্রীয়ারসনের মতটিই পরবর্তীকালের ভাষাতাত্ত্বিকদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। কারণ প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাভাষা নব্যভারতীয় আর্যস্তরে এসে তার নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করেছে। মধ্যভারতীয় আর্য হ'ল এর পূর্বস্তরের ভাষা। আর সংস্কৃত ভাষা হ'ল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষারই একটি শিষ্ট এবং বিধিবদ্ধ রূপ। অতএব সংস্কৃতের পরে অন্ততঃ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করার পরে যে বাংলা ভাষার উদ্ভব এ সম্পর্কে দ্বিমতের আর কোনো কারণ থাকে না। আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তা হ'ল এই যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচ্য রূপ থেকে বাংলাভাষা বিবর্তিত, কিন্তু সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার এই শাখার শিষ্ট রূপ নয়। তা মধ্যাঞ্চলীয় প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার শিষ্ট রূপ। মাগধী প্রাকৃত থেকেও যে বাংলাভাষার উৎপত্তি নয় এই যুক্তির সমর্থনে বলা যেতে পারে যে প্রাকৃত হ'ল মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরের ভাষা। পক্ষান্তরে বাংলার উৎপত্তি যে অপভ্রংশ থেকে তা মধ্য-ভারতীয় আর্যের তৃতীয় স্তরের ভাষা। সুতরাং পরিশেষে এই সিদ্ধান্তই ভাষাতাত্ত্বিকরা গ্রহণ করেছেন যে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার পূর্বী শাখায় মাগধী প্রাকৃতের পরবর্তী স্তরে গৌড়দেশী অপভ্রংশের সাদৃশ্যে মাগধী মাগধী অপভ্রংশের উদ্ভব ঘটে। সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে ভোজপুর, মিথিলা, মগধ, বাংলাদেশ, উড়িষ্যা ও আসামে এই অপভ্রংশ ভাষা পরস্পর নিরপেক্ষ কতকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে থাকে। দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে মাগধী অপভ্রংশের কতিপয় প্রাদেশিক রূপের উদ্ভব ঘটে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে এই প্রাদেশিক

রূপগুলিই হ'ল বাংলা, অসমীয়া, ভোজপুরী, মৈথিলী, উড়িয়া ইত্যাদি প্রাদেশিক ভাষা।

কিন্তু এবিষয়টি একটু স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য। ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে মাগধী অপভ্রংশের এই প্রাদেশিক রূপগুলির গঠন সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু আমরা মনে করি যে মাগধী অপভ্রংশের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বিবর্তনের পর্বটি দশম শতাব্দীর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি, ঐ সময়ের পরেও কিছুকাল ধরে তা চলেছিল। চর্যাপদের ভাষাকে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকরা প্রাচীন বাংলা বলে প্রমাণ করেছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে চর্যাপদকে প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলে ধরা হয়। এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্নেরই অবকাশ নেই একথা সর্বথাই স্বীকার্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বিবেচ্য যে চর্যার ভাষার সঙ্গে বাংলার প্রতিবেশী একাধিক ভাষার নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। এই সাদৃশ্য বাংলার চেয়ে বেশী, না প্রতিবেশী অন্যান্য ভাষাগুলির চেয়ে বেশী, এ প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। তবে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব, প্রতিবেশী অন্যান্য ভাষায় যেসব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত তা যে চর্যায় উপস্থিত এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তথাপি এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত একপ্রকার অনিবার্য হয়ে ওঠে যে চর্যাপদের যুগে (যদি এর রচনাকাল দশম শতাব্দীর মধ্যে হয়) পূর্ব ভারতে মাগধী অপভ্রংশের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়নি। মগধ, মিথিলা, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ইত্যাদি স্থানের ভাষায় মাগধী অপভ্রংশের কিছু সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য তখনও বর্তমান ছিল। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিই চর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে। একারণেই চর্যার ভাষার সঙ্গে অসমীয়া, উড়িয়া, ভোজপুরী ইত্যাদি ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং আমরা মনে করি যে একটি স্বতন্ত্র প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে বাংলার গঠন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নয়, তারও কিছুকাল পরে সম্পূর্ণ হয়েছে।

রাজবংশী জাতির উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে দ্রাবিড় বা দোঙ্গিরিয়রা, এবং খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক বা তারও কিছু পরে তিব্বত-ব্রহ্মভাষী মোঙ্গোলীয়ান নৃগোষ্ঠীর একটি শাখা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে একটি অখণ্ড মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে আর্যীকরণের সম্মুখীন হয়। আর্যীকরণের এই ধারায় এই সমন্বিত মানবগোষ্ঠী তাদের পূর্বতন ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে আর্যমূলত ধর্মীয় আচার এবং বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে যেমন গ্রহণ করেছে, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও তাদের পূর্বতন ভাষার পরিবর্তে ভারতীয় আর্যভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ভাষার ক্ষেত্রে এই গ্রহণ বর্জনের বিষয়টি সম্পর্কে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর মন্তব্য এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতকে স্বীকার করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে খ্রীষ্টপর সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই এই

মানবগোষ্ঠী, সাম্প্রতিক রাজবংশীদের পূর্বপুরুষরা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তরের ভাষা মাগধী অপভ্রংশকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অবশ্য তাদের ব্যবহারে মাগধী অপভ্রংশ যে ধ্বনিগত এবং রূপগত দিক থেকে কিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যযুক্ত হয়ে পড়েছিল হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ বিবরণ থেকেই তা জানা গিয়েছে। এ সম্পর্কে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তিকে সমর্থন করে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে আলোচ্য মানবগোষ্ঠীটির ব্যবহারে মাগধী অপভ্রংশ যে স্বতন্ত্র রূপটি পরিগ্রহ করেছিল তা আসলে মাগধী অপভ্রংশেরই একটি আঞ্চলিক রূপ। অতঃপর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুবর্তী আর একটি সিদ্ধান্ত এখানে যোগ করা যেতে পারে; বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যেই মাগধী অপভ্রংশের অঞ্চলভিত্তিক বিবর্তন শুরু হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ কামরূপে মাগধী অপভ্রংশের সেই অঞ্চলের বিবর্তিত রূপটিকে দেখেই উল্লিখিত মন্তব্য করেছিলেন।

সবশেষে আলোচ্য উপভাষাটির উদ্ভব বিষয়ক আলোচনার উপসংহারে প্রদর্শিত সমস্ত যুক্তি, তথ্য, ও প্রমাণের উপরে নির্ভর করে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই রাজবংশীদের পূর্বপুরুষরা বাংলা ভাষার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তরের ভাষা মাগধী অপভ্রংশকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অবশ্য এই গ্রহণ বর্জনের কাজ যে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজবংশীদের ভাষায় মধ্যভারতীয় আর্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি থেকে। তবে এই সিদ্ধান্ত মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য যে পূর্বকথিত সময়সীমার মধ্যেই রাজবংশীরা আর্য ভাষাকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে। তারপরে বাংলাভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে রাজবংশীদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা পরিগৃহীত ভাষাটিও প্রায় সেই একই নিয়মে নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তার এই বিবর্তন রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার জন্য মধ্যবাংলা স্তর পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বিবর্তনের স্রোত এখনও অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে। উনিশ শতকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কলকাতার গুরুত্ব অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতা এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের একাধিক উপভাষার বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করে জন্ম নিয়েছে শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলা, যা তার নিজস্ব গুণে সমগ্র বঙ্গদেশের শিষ্ট সমাজের ভাষা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। অন্যপক্ষে বঙ্গদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলের অধিবাসী রাজবংশীদের ভাষা, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক-দিক থেকে এই অঞ্চলের গুরুত্বহ্রাসের ফলে বিবর্তনের পথে আর অগ্রসর হতে পারেনি।। ফলে বাংলার মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য, যা সম্প্রতি বাংলাভাষার ঐতিহাসিক উপাদানে পর্যবসিত, তা এই অঞ্চলের ভাষার জঙ্গম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য

একটি প্রদেশে বা রাষ্ট্রে বা একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ভাষার ধ্বনিগত এবং রূপগত ঐক্য সাধারণভাবে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট প্রদেশ বা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে বা একই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী অংশের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান, সামাজিক জীবনে পারস্পরিক বিনিময় এবং ঘনিষ্ঠ সংযোগের উপর। এই আদানপ্রদান, বিনিময় এবং সংযোগের অভাবে একটি ভূখন্ডে প্রচলিত ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষার উদ্ভব ঘটে। ভাষাতত্ত্ববিদ অটো জেসপারসন-এর মতানুসারে ভাষা থেকে উপভাষার জন্মের কারণ-" ... not purely physical but want of communication for whatever reason... এবং ...linguistic unity depends always on intercourse, on a community of life.

"।[১] ভাষার রূপ এবং ধ্বনিগত একরূপতার মূলে বাচকগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং সান্নিধ্যের গুরুত্বকে সি, এফ, হকেট-ও স্বীকার করেছেন।[২] তবে একটি অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ভাষার ঐক্য সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সংযোগ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পারস্পরিক আদানপ্রদানের উপরেই শুধু নির্ভরশীল এবং এই সংযোগের বা আদানপ্রদানের অভাবেই একটি ভাষা থেকে একাধিক উপভাষার জন্ম হয়, এমন যদি বলা হয় তাহলে বিষয়টি সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের উত্তর অযুক্ত থেকে যায়। একটি অঞ্চলের অধিবাসী মানুষেরা একই ভাষাভাষী এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হলেও রাজনৈতিক ভাবে সেই অঞ্চলটি যদি বিভক্ত হয়ে যায় এবং বিভাজিত প্রত্যেকটি অংশে যদি পৃথক পৃথক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে একটি অখন্ড বাকসম্প্রদায় এভাবেই বিভক্ত হয়ে যায়। কালক্রমে এইভাবে বিভাজিত বাকসম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের ব্যবহারে একই ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক চারিত্র্য অর্জন করতে থাকে। এ বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড-এর অভিমত নিম্নরূপ।-" It is contained that, under older conditions, a new political boundary led in less than fifty years to some linguistic differences."[৩] এই কারণে একটি অঞ্চলের রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধন সেই অঞ্চলের ভাষাগত ঐক্য বা বিভিন্নতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কারণ দেখা

---

(১) জেসপারসন অটো, ম্যানকাইন্ডঃ ন্যাশান অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল, পৃঃ ৪৯, ৪৬

(২) হকেট, সি, এফ, ইনট্রোডাকশন টু লিঙ্গুইস্টিকস, লেসন-৫, ডায়লেকটস

(৩) ব্লুমফিল্ড, এল, ল্যাংগুয়েজ, লন্ডন, ১৯৬৯, পৃঃ ৩৪৩

গিয়েছে যে একই শাসনব্যবস্থা বা সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলে ভাষার দিক থেকে এক ধরনের সামান্যতা বজায় থাকে। লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড-এর মতে-" Apparently, common goverment and religion and especially the custom of inter marriage within the political unit, led to relative uniformity of speech".[৪]

গোয়ালপাড়া জেলা বর্তমানে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত। কিন্তু এক সময়ে এই জেলা এবং কামরূপ জেলার কিছু অংশ প্রাচীন কামরূপ বা কামতাপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পূর্ব আসামের সঙ্গে এই দুটি জেলার রাষ্ট্রনৈতিক সংযুক্তি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ঘটনা। তার আগে উল্লিখিত দুটি জেলার অধিবাসীরা পূর্ব আসামের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী অহোম রাজবংশকে বহিরাগত বলে ভাবত। সমানভাবে অহোমরাও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখত।[৫] অর্থাৎ একসময় পূর্ব আসাম এবং গোয়ালপাড়া ও কামরূপ রাজনৈতিক ভাবে দুটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ফলশ্রুতিতে এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য কোনোদিনই স্থাপিত হয়নি। গ্রীয়ারসন পূর্ব ও পশ্চিম আসামের মধ্যেকার এই ভাষাগত বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর 'লিংগুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে।[৬] এই পার্থক্যের ভিত্তিতে ডঃ বাণীকান্ত কাকতি শিবসাগর জেলা সহ আসামের পূর্ব সীমান্তবর্তী জেলা সদিয়া থেকে গৌহাটি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের ভাষাকে পূর্ব অসমীয়া বা 'ইস্টার্ন অ্যাসামীজ' এবং পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলা কামরূপ এবং গোয়ালপাড়ার ভাষাকে পশ্চিম অসমীয়া বা 'ওয়েস্টার্ন অ্যাসামীজ' বলে চিহ্নিত করেছেন।[৭] ডঃ উপেন্দ্র নাথ গোস্বামীও এই পার্থক্যকে স্বীকার করেছেন এবং পূর্ব আসামের সঙ্গে পশ্চিম আসামের রাষ্ট্রনৈতিক বৈষম্যকে এর অন্যতম কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন।[৮] পরন্তু তিনি নিম্ন আসামের ভাষা, বাণীকান্ত কাকতি কথিত পশ্চিম অসমীয়া বা 'ওয়েস্টার্ন অ্যাসামীজ'-কে কামরূপী উপভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন।[৯] এই 'ওয়েস্টার্ন অ্যাসামীজ' বা পশ্চিম অসমীয়ার সঙ্গে কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীদের ভাষার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ পার্থক্য থাকলেও কোনো কোনো বিষয়ে দুটি অঞ্চলের ভাষার মধ্যে অধিক সাদৃশ্যও বর্তমান।

---

(৪) তদেব, পৃঃ ৩৯৩

(৫) ভুঁইঞা, এস.কে, অ্যাংলো অ্যাসামীজ রিলেশনস্, পৃঃ ৬৭

(৬) গ্রীয়ারসন জি.এ, লিংগুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ১৯৬৮, ভল্যুম-৫, পার্ট-১, পৃঃ ৪৬

(৭) কাকতি বাণীকান্ত, অ্যাসামীজ, ইটস ফরমেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, ১৯৭২, পৃঃ ১৮-১৯

(৮) গোস্বামী উপেন্দ্র নাথ, এ স্টাডি অন কামরূপী, এ ডায়লেক্ট অব অ্যাসামীজ, ১৯৭০, পৃঃ ১৬-১৫

(৯) তদেব, পৃঃ ১-১৬

নৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে একীভূত হয়।

এই তিনটি বিভাগের মধ্যে একমাত্র বিভাগ কামরূপ বা কামতাপুর বর্মণ রাজবংশের ও খ্যাতনামা রাজা ভাস্করবর্মার শাসন থেকে কোচ রাজবংশের মধ্যবর্তী পুরুষদের রাজত্বকাল পর্যন্ত তার পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। ভাস্করবর্মার রাজত্বকালের শুরুপাত আনুমানিক ৬০২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর রাজত্বকালেই চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আসেন এবং কামরূপে এসে সেই অঞ্চলের এভাষা সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেন, যার সূত্র ধরে ভাষাতাত্ত্বিকরা উত্তরবঙ্গ এবং আসামে আর্য-ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের সন্ধান পেয়েছেন। ভাস্করবর্মার রাজত্বকাল সমাপ্ত হওয়ার পরে কামরূপে একাধিক রাজবংশ রাজত্ব করে। বিভিন্ন বংশের রাজত্বকালে কামরূপ রাজ্যের সীমা একাধিকবার পরিবর্তিত হয়। কোচ রাজবংশের অধস্তন রাজা নরনারায়ণ তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যের পূর্বভাগের শাসনভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজের হাতে অর্পণ করেন। এর ফলে পূর্বকামরূপ একটি পৃথক রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোচবিহার রাজবংশের সঙ্গে শুক্লধ্বজের পরবর্তী বংশধরদের সদ্ভাব কোচ রাজবংশের মধ্যবর্তী পুরুষদের শাসনকাল পর্যন্ত বজায় ছিল। একারণে বলা যেতে পারে যে অন্ততঃ এই সময় পর্যন্ত কোচবিহার(কামতাপুর বা কামরূপের অর্বাচীন নাম)বা কামরূপ রাজ্যের রাষ্ট্র-নৈতিক ঐক্য অক্ষুন্ন ছিল। উত্তরবঙ্গের অপর একটি বিভাগ পুন্ড্রবর্ধনের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব গুপ্ত শাসকাল পর্যন্ত বজায় থাকলেও এর পরবর্তী সময়ে তা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এই বিভাগটি কখনও কামরূপ, কখনও বা গৌড়ের শাসনের আওতায় আসে।

পৃথক পৃথক ভাবে তিনটি বিভাগের ইতিহাসের আলোচনা না করে একটিমাত্র বিভাগ কামরূপের ইতিহাসের আলোচনা করার সময়ে আমরা তিনটি বিভাগেরই শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করব। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আনুমানিক ৬০২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভাস্করবর্মা কামরূপের শাসনভার গ্রহণ করেন। পূর্বভারতের রাজনৈতিক পটভূমিতে তিনি নিজস্ব প্রভাব তৈরী করতে সক্ষম হন। তাঁর রাজত্বকালের অবসান ঘটে আনুমানিক ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সামরিক আঁতাত স্থাপন করে গৌড় আক্রমণ। গৌড়ের তদানীন্তন শাসনকর্তা শশাঙ্ক এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। এর পরে শশাঙ্ক এবং তৎপুত্র মানবের মৃত্যুর পরে ৬৪২/৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্করবর্মা পুনরায় গৌড় আক্রমণ করেন এবং প্রায় বিবাদপূর্ণ গৌড় রাজ্যের পূর্বভাগ সহ পৌন্ড্রবর্ধন রাজ্য নিজের অধিকারে আনতে সক্ষম হন। অবশ্য পরবর্তীকালে তিব্বত রাজের আক্রমণে পৌন্ড্রবর্ধন কামরূপের শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জয়নাগ নামে একজন রাজা কামরূপে শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনুমান করা হয় যে

এই অনুমানের আমলে পৌণ্ড্রবর্ধন আবার কামরূপের অধিকারে এসেছি। এসেছিল। এইভাবে পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একাধিকবার পরিবর্তিত হতে থেকে এক সময় তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে কামরূপ, পৌণ্ড্রবর্ধন এবং গৌড়, এই ত্রিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে উত্তরবঙ্গে দ্বিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার পরে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা হ'ল কামরূপ এবং গৌড়ের সংঘর্ষের ইতিহাস।[১০]

ভাস্করবর্মার শাসনকাল সমাপ্ত হওয়ার পরে পর থেকে শুরু করে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাসে ব্যাপক রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অভাব [illegible] পরিলক্ষিত হয়। এর পরে গৌড় এবং বরেন্দ্রে পাল শাসনের সূত্রপাত ঘটে এবং আনুমানিক ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে তা সমাপ্ত হয়। অপরদিকে কামরূপে এই সময়, অর্থাৎ ৬৫০ থেকে শুরু করে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শালস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ রাজত্ব করে। বঙ্গে যখন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব রাজত্ব করছেন কামরূপে তখন শালস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত বংশের রাজা [illegible] বনমালের রাজত্বকাল চলছে। রাজা বনমালবর্মদেব ও বংশধররা ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর পরে কামরূপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে রাজা ব্রহ্মপালের। রাজা ব্রহ্মপাল এবং তাঁর বংশধররা আনুমানিক ১১২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কামরূপে রাজত্ব করেন।[১১] এর পরে কামরূপের শাসনক্ষমতা রাজা বৈদ্যদেবের হস্তগত হয়। তিনি আনুমানিক ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বৈদ্যদেবের শাসনকালের অবসান ঘটে। অপরদিকে বাংলায় তখন সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১২] সেন বংশের সর্বশেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের শাসনকালের সমাপ্তিতে বাংলাদেশে মুসলমানী শাসন শুরু হয়। কামরূপে তখন বৈদ্যদেব প্রতিষ্ঠিত বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা পৃথুর রাজত্বকাল চলছে। ভাস্করবর্মার পর থেকে কামরূপের সঙ্গে গৌড়ের উল্লেখযোগ্য কোনো বিবাদের ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এই সময়ের পর থেকে কামরূপ এবং গৌড়ের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ শুরু হয়। পৃথুর রাজত্বকালে, ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে [illegible]পুরের জায়গীরদার থেকে বাংলার সুলতানে রূপান্তরিত সুলতান ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজী তিব্বত আক্রমণের অছিলায় কামরূপ আক্রমণ করলে পৃথু এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁর আমলে পরবর্তী মুসলমান আক্রমণ সংঘটিত হয় ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গিয়াসুদ্দিন ইউয়াজ শাহ। রাজা পৃথু এই আক্রমণও প্রতিহত করেন।

---

(১০) দাস সুকুমার, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, কলকাতা, [illegible] ১৯৮২, পৃঃ ৬০-৬৭

(১১) তদেব, পৃঃ ৭৭-৯৯

(১২) তদেব, পৃঃ ৯৩-৯৭

এর পরে কামরূপে তৃতীয়বার মুসলিম অভিযান প্রেরিত হয় ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বে। এই যুদ্ধে পৃথু পরাজিত হন এবং তাঁর পুত্র সন্ধ্যা রায় বাৎসরিক করদানের শর্তে সন্ধি করে কামরূপের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। সন্ধ্যা রায়ের শাসনে কামরূপ চতুর্থবার মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয় ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। তবে মালিক উজবেগের নেতৃত্বে প্রেরিত চতুর্থবারের এই মুসলিম অভিযানটিও ব্যর্থ হয়। কিন্তু এতবার মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করা সত্ত্বেও দৈবপালদেবের বংশধরেরা কামরূপে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেননি মূলতঃ রাজপুরুষদের ষড়যন্ত্রের জন্য। এই ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি শেষপর্যন্ত দৈবপালদেব প্রতিষ্ঠিত বংশের সর্বশেষ রাজা সিংহধ্বজকে হত্যা করে তাঁর মন্ত্রী মালিক প্রতাপধ্বজ নাম গ্রহণ করে কামরূপের সিংহাসন অধিকার করেন। এর পরে কামরূপে একাধিক রাজবংশ রাজত্ব করে। এই সব রাজবংশের মধ্যে খেন রাজবংশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বংশের শেষ রাজা নীলাম্বর যখন কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তখন বাংলার সুলতান হলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্। তাঁর সময়ে কামরূপে অষ্টম মুসলিম অভিযান প্রেরিত হয়। দেখা গিয়েছে যে এর পূর্ববর্তী মুসলিম অভিযানগুলির কোনোটি আংশিক, কোনোটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এবারের এই অষ্টম মুসলিম অভিযানের ফলাফল সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের পক্ষে যায়। এই যুদ্ধে রাজপুরুষদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নীলাম্বর পরাজিত হন এবং এর ফলে কামরূপে সাময়িকভাবে হিন্দু শাসনের অবলুপ্তি ঘটে। এর অল্পকাল পরেই কামরূপের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে কামরূপের একজন সামন্তরাজার পুত্র বিশ্বসিংহ সেখানে কোচ রাজবংশের পত্তন করেন।[১৩]

আনুমানিক ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কোচ সর্দার হাজো, মতান্তরে হরিদাসের পুত্র বিশ্বসিংহ নিজেকে 'কামতেশ্বর' বা পশ্চিম কামরূপের রাজা বলে ঘোষণা করেন।[১৪] এই সময় থেকেই বিশ্বসিংহের নেতৃত্বে কোচবিহার রাজ্যের (অবশ্য তখনও কামতাপুর বা কামরূপ রাজ্যের নাম কোচবিহার হয়নি) প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয়। এই সময় থেকে শুরু করে ভারতভুক্তির সময় পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্যের আয়তন একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর কোচবিহার রাজ্যের সীমানির্দেশক একটি মানচিত্রে (খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৩৬, পৃঃ ১৬৮) বর্তমান উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং অবিভক্ত দিনাজপুর জেলাকে এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বলে ধরা হয়েছে। মালদহ জেলাকে এই মানচিত্রে অনিরূপিত রাজ্যসীমার মধ্যে রাখা হয়েছে। এই

---

(১৩) তদেব, পৃঃ ৯৯-১২৭

(১৪) খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৩৬, পৃঃ ৮৭

মানচিত্রটি রাজা নরনারায়ণের শাসনকালীন কোচবিহার রাজ্যের সীমা নির্দেশ করছে। সপ্তদশ শতাব্দীর কোচবিহার রাজ্যের সীমানির্দেশক অন্য একটি মানচিত্রে (খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৩৬, পৃঃ ১৬৮) জলপাইগুড়ি এবং বর্তমান দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমাকে কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হিসেবে দেখানো হলেও দিনাজপুর জেলাকে রাজ্যসীমার বহির্ভূত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন সময়ের মানচিত্র থেকে বিভিন্ন সময়ের কোচবিহার রাজ্যের সীমা ও আয়তন সম্পর্কে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাতে একটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া চলে যে রাজ্যের আয়তন নানা সময়ে নানা কারণে পরিবর্তিত হলেও কোচবিহার রাজ্যের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের আগে কখনও বিপন্ন হয়নি। অষ্টাদশ শতকীর শেষভাগে, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানের তৎকালীন 'কুমুদেবু' (রাজা) দেবযধুর কোচবিহার রাজ্যের অধিকাংশ ভূভাগ অধিকার করেন। এই সময়ে রাজ্যের বিশিষ্ট প্রজাবর্গ, রাজপুরুষগণ এবং ভুটানে আবদ্ধ রাজার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ধরেন্দ্র-নারায়ণের অভিভাবকস্বরূপ নাজির খগেন্দ্রনারায়ণ তৎকালীন গভর্নরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে ক্যাপটেন জোন্স কোচবিহারের হয়ে ভুটিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে ভুটিয়ারা পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে শর্তে কোম্পানী ভুটিয়াদের সঙ্গে সন্ধিতে রাজী হয় তা কোনো দিক থেকেই কোচবিহার রাজ্যের পক্ষে লাভজনক ছিল না। এই সন্ধির শর্তানুসারে কোচবিহার রাজ্যের পার্বত্য এলাকা সংলগ্ন অনেক অঞ্চল ভুটিয়াদের দিয়ে দেওয়া হয়। এর বিনিময়ে কোম্পানী ভুটানের কাছ থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেয়। ফলে এই সন্ধিতে কোচবিহার রাজ্যের কোনো লাভ তো হয়ই না, উপরন্তু এর ফলে কোচবিহার রাজ্যের পররাষ্ট্রনীতিতে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ ঘটে এবং কালক্রমে পূর্বতন স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোচবিহার ব্রিটিশদের একটি করদমিত্র রাজ্যে পরিণত হতে বাধ্য হয়।[১৫] এই ঘটনার ফলে কোচবিহারের মানচিত্রে যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কোচবিহার রাজ্যের একটি মানচিত্র (খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৩৬, পৃঃ ৩৭৩) থেকে। এই মানচিত্রে কোচবিহার রাজ্যের আয়তন পূর্ববর্তী মানচিত্রগুলিতে প্রদর্শিত আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট।

কোচবিহারের আয়তনের এই হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে বর্তমান উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চল সাময়িকভাবে কোচবিহারের অধিকারে এলেও সেই অঞ্চলগুলি কোনো সময়ের জন্যই দীর্ঘ-

---

(১৫) তদেব, পৃঃ ৩৩৮-৩৮৭

কাল ধরে কোচবিহারের অধীনে ছিল না। একমাত্র কোচবিহার জেলাই সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রথমতঃ কামতাপুর বা কামরূপ রাজ্যের, শেষতঃ কোচবিহার রাজ্যের স্থায়ী রূপক হিসেবে বজায় থেকেছে। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা কোচবিহার অধিকার করলেও তৎকালীন কোচবিহাররাজ এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।[১৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কোচবিহার রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই শুধু নয়, একটি স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্গত স্বাধীন অঞ্চল হিসেবেও কোচবিহারের অস্তিত্ব দীর্ঘকাল ধরে বজায় ছিল। পক্ষান্তরে সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল সমূহের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলতঃ রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বলতে যা বোঝায় তা একমাত্র কোচবিহারেই ছিল, অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে ছিল না। এই রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার জন্য কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীদের মুখের ভাষার বিকাশ এবং এবং পুষ্টি যেভাবে ঘটেছে, উত্তরবঙ্গের বাকী এলাকাগুলিতে সেভাবে ঘটেনি। একারণেই কোচবিহারের রাজবংশীদের ভাষা ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষা একই উৎস থেকে জন্ম লাভ করলেও সাম্প্রতিক কালে কিছুটা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

সাংস্কৃতিক দিক থেকেও কোচবিহারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের কিছু কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রধান প্রধান সর্বজনীন উৎসব বা পূজাপার্বণ, যা কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তা অন্যান্য অঞ্চলের রাজবংশীদের মধ্যেও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত উৎসবাদি সম্পূর্ণভাবে কোচবিহারে অনুষ্ঠিত উৎসবাদি থেকে স্বতন্ত্র। উদাহরণ স্বরূপ নবান্ন বা 'নয়াখই' অনুষ্ঠানটির কথা বলা যেতে পারে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় নবান্ন অনুষ্ঠানে অন্যান্য দেব দেবীর পূজা ছাড়াও মনসা দেবীর পূজা অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচিত। কিন্তু কোচবিহারে এই পূজা স্বতন্ত্রভাবে করা হয়ে থাকে, নয়াখই অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্য অংশ হিসেবে নয়। তাছাড়া জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমদিনাজপুর এবং মালদা জেলায় নয়াখই অনুষ্ঠান যতটা গুরুত্বপূর্ণ কোচবিহারে ততটা নয়। জলপাইগুড়িতে 'তিস্তাবুড়ি পূজা' এবং দার্জিলিং ও পশ্চিমদিনাজপুর অঞ্চলে 'মেচিনী পূজা' রাজবংশীদের মধ্যে সর্বজনীন উৎসবের মত গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কোচবিহারের রাজবংশীরা এই জাতীয় উৎসবের নাম পর্যন্ত জানেনা। উল্লিখিত উৎসবদুটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গান এবং খেলা ইত্যাদিও কোচবিহারে প্রচলিত নয়। পক্ষান্তরে 'খাটোয়াল খড়ির খেলা' কোচবিহারে রাজবংশী সমাজভুক্ত কিশোরদের মধ্যে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় খেলা। অন্যান্য জেলাগুলিতে এর প্রচলন নেই। সমানভাবে 'চোর-চুন্নি' নামে এক ধরণের খেলা এবং তৎসংশ্লিষ্ট গান এবং ছড়া জলপাইগুড়িতে প্রচলিত থাকলেও কোচবিহারে এই খেলা

---

(১৬) সরকার, জে, এন, দি লাইফ অব মীরজুমলা, কলকাতা, ১৯৫১, পৃঃ ২২৩-২৩০

এবং তৎসংশ্লিষ্ট গানের প্রচলন নেই।

কোচবিহারের লোকসংগীত এবং লোকনাট্যের চরিত্রও অন্যান্য জেলার থেকে স্বতন্ত্র। ভাওয়াইয়া কোচবিহারের লোকসংগীতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট এবং শক্তিশালী ধারা। অন্যান্য অঞ্চলে ভাওয়াইয়া গানের প্রচলন ততটা নেই। সম্প্রতি কোচবিহারের সাহচর্যে এবং বিভিন্ন বেতারকেন্দ্রের উদ্যোগে অন্যান্য জেলাগুলিও এই ভাওয়াইয়ার প্রতি আকৃষ্ট হতে চলেছে এবং তৎসূত্রে ভাওয়াইয়া অন্যান্য অঞ্চলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই গীতিধারাটি একান্তভাবেই কোচবিহারের নিজস্ব সম্পদ। এই গানের কথাবস্তুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোচবিহারের রাজবংশীদের ভাষায় যে বাচিক বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে অন্যান্য অঞ্চলের ভাষায় তা নেই। ভাওয়াইয়া ছাড়া একেবারে কোচবিহারের নিজস্ব গীতিধারাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'দোতরাভাঙার গান', 'কুশানের গান', 'আমদেওয়ান বা রামদেওয়ানের গান' ইত্যাদি। দোতরাভাঙার গানে মূল গায়েনের হাতে থাকে 'দোতরা' নামে একটি বাদ্যযন্ত্র। এই গানের বিভিন্ন পালার বিষয়বস্তু হ'ল বিভিন্ন মুসলমানী কেচ্ছা বা মুসলমান পীর ফকির ইত্যাদির কাহিনী। কুশান গানে মূল গায়েনের হাতে থাকে এক তারবিশিষ্ট 'ব্যানা' নামে একধরণের বাদ্যযন্ত্র। এজন্য স্থানবিশেষে এই গানকে কখনো কখনো 'ব্যানাকুশান'-ও বলা হয়ে থাকে। এই গানের বিভিন্ন পালার বিষয়বস্তু হ'ল রামায়ণভিত্তিক বিভিন্ন কাহিনী। পরবর্তী-কালে মহাভারতের কাহিনীও এর বিষয়সীমার অন্তর্ভুক্ত হয়। মনে হয় দোতরাভাঙা এবং কুশান গানের আদি প্রবর্তক যথাক্রমে কোচবিহারের অধিবাসী মুসলমান ও হিন্দু সমাজ। কোচবিহারের অধিবাসী মুসলমান সমাজে 'খোর' নামে গীতিব্যবসায়ী একটি শ্রেণী আছে। কোচবিহারে প্রচলিত একটি ছড়ায় দোতরা যে খোরদেরই বাদ্যযন্ত্র এমন কথা বলা হয়েছে।

> "চ্যাংনা বাজায় ব্যানা,
> দোতরা বাজায় খোর
> সারিন্দা বাজায় সাত সদাগর
> বাঁশি বাজায় চোর"।

এই কারণে আমরা এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছি যে দোতরাভাঙা গানের প্রচলনকারী সম্ভবতঃ কোচবিহারের মুসলমান সম্প্রদায়, যা পরবর্তীকালে রাজবংশী হিন্দুদের একটি নিজস্ব গীতিধারায় পরিণত হয়েছে। এই দোতরাভাঙা এবং কুশান গানের প্রচলন উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় নেই। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এর অন্যতম বিশিষ্ট লোকনাট্য হ'ল 'পালাটিয়া গান'। এই গানের বিভিন্ন পালার বিষয়বস্তু হ'ল বিভিন্ন কাল্পনিক কাহিনী এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমসাময়িক

কালে সংঘটিত কৌতুহলোদ্দীপক বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা। ভাবান্তরে পালাটিয়া গানের পরিচয়'রঙ পাচালি', 'ধান পাচালি', 'মানপাচালি' ইত্যাদি। পশ্চিম দিনাজপুরের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোকনাট্য হ'ল 'আলকাপ' এবং 'খনগান'। মালদহের পশ্চিম দিনাজপুর সংলগ্ন অঞ্চলে খনগান এবং অঞ্চল-বিশেষে আলকাপ গান প্রচলিত। তবে সেখানকার সর্বাধিক প্রচলিত এবং জনপ্রিয় লোকনাট্য হ'ল 'গম্ভীরা গান'। উল্লিখিত গীতিধারাগুলির একটিও কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীদের কাছে পরিচিত নয়। এইভাবে সংস্কৃতির দিক থেকেও কোচবিহার এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা দুই বিপরীত প্রান্তবর্তী দুটি অঞ্চলে পরিণত হতে চলেছে।

প্রসংগত রাজবংশী সমাজে প্রচলিত বিবাহ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কথাও উল্লেখ করার মত। রাজবংশী সমাজ সাধারণতঃ নিকটবর্তী স্থানেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অভ্যস্ত। দূরবর্তী স্থানে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে এই সমাজের অনাগ্রহ বিশ শতকের শেষ পাদেও দূর হয়নি। ফলে এই সূত্রে এক অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং আদান প্রদানের যে সুযোগ থাকে তা এই সমাজ ব্যবহার করতে পারেনি।

এইভাবে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে কোচবিহার এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে কোনো ঐক্য গড়ে ওঠেনি। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী সমাজের মুখের ভাষার মধ্যে মোটামুটি এক ধরণের সাদৃশ্যতা থাকলেও সম্পূর্ণ সাদৃশ্যতা বা সামঞ্জস্য কোনো সময়েই গড়ে ওঠেনি।

কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীদের ভাষার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার অধিবাসী রাজবংশীদের ভাষার পার্থক্যের মূলে আরও কিছু কারণ নিহিত থাকতে পারে বলে আমরা অনুমান করি। দার্জিলিং জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ নেপাল ও বিহার সীমান্তের সন্নিকটবর্তী হওয়ার ফলে ঐ অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষায় নেপালী এবং হিন্দীভাষীদের প্রভাব পড়ে থাকা বিচিত্র নয়। অনুরূপভাবে মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কিছু অঞ্চল বিহার সীমান্তের নিকটবর্তী। ফলে সীমান্ত সন্নিহিত ঐসব অঞ্চলের ভাষায় হিন্দী এবং অন্যান্য ভাষার প্রভাব পড়েছে, এমন অনুমান অসংগত নাও হতে পারে। অন্যদিকে কোচবিহার জেলার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম এই চারটি সীমান্তই মোটামুটিভাবে রাজবংশী ভাষাভাষী অঞ্চল দ্বারা পরিবৃত।

কোচবিহারে সাঁওতাল এবং অন্যান্য অরাজবংশীভাষী জনসংখ্যা অন্য চারটি জেলা অপেক্ষা কম। উপরন্তু জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার চা বাগানগুলিতে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করে তাদের একটি

অংশ ঐ অঞ্চলের আদিবাসী এবং অন্য অংশটি বহিরাগত। বহিরাগতদের মধ্যে অধিকাংশেরই সাধারণ যোগাযোগের ভাষা হিন্দী। এই চা শ্রমিক এবং রাজবংশী, এই দুটি জনগোষ্ঠীই সন্নিহিত অঞ্চলের হাট বাজারগুলি থেকে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে এবং তদুপলক্ষে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। সামাজিক জীবনেও এই দুটি জনগোষ্ঠীর লোকেরা ক্রমশঃ পরস্পরের সন্নিকটবর্তী হতে চলেছে। এইভাবে সন্নিহিত বসবাসের ফলে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের অধিবাসী রাজবংশীরা যে পরিমাণে অন্য ভাষাভাষী মানুষের সংস্পর্শে এসেছে কোচবিহার জেলার রাজবংশীরা সেই পরিমাণে আসতে পারেনি। ফলতঃ প্রথমোক্ত অঞ্চলগুলির ভাষায় কিছু পরিমাণে ভিন্ন ভাষার উপাদান প্রবেশ করেছে। কোচবিহারের ভাষায় তা করেনি। জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের ভাষার এই স্বাতন্ত্র্য গ্রীয়ারসনের দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছে। কোচবিহারের রাজবংশীদের ভাষার সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যময় এই অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষাকে তিনি যে একটি 'স্বতন্ত্র সাব ডায়লেক্ট' বলে চিহ্নিত করেছেন একথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লিখিত সমস্ত কারণে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশীদের মুখের ভাষায় কিছু পরিমাণে আঞ্চলিক বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। এই আঞ্চলিক বিভিন্নতার ভিত্তিতে সমগ্র রাজবংশী বাচক-গোষ্ঠীকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা চলে। এর একটি ভাগে পড়ে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, এবং কোচবিহার সদর মহকুমার রাজবংশীরা। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমার দক্ষিণ-পূর্বাংশ সহ ফালাকাটা থানার কিছু অংশের রাজবংশীদের ভাষার সঙ্গে কোচবিহারের প্রাগুল্লেখিত অঞ্চল-সমূহের ভাষার সাদৃশ্য আছে। এ কারণে এই সব অঞ্চলের রাজবংশীদেরও এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এছাড়া কোচবিহার জেলায় মেখলিগঞ্জ মহকুমার [illegible] পূর্বাংশের রাজবংশীরা ভাষা-সাদৃশ্যের কারণে এই ভাগটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উল্লিখিত অঞ্চলগুলি ছাড়া কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার বাকী অংশগুলি সমেত সমগ্র দার্জিলিং জেলা, মালদা এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অধিবাসী রাজবংশীদের আমরা আর একটি ভাগের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই ধরণের বিভাজন করতে গিয়ে প্রতিটি জেলার প্রতিটি থানার অন্তর্গত প্রতিটি অঞ্চলে আমরা সমীক্ষা চালিয়েছি। প্রয়োজন বোধে কোনো কোনো স্থানে একাধিকবার গিয়েছি এবং এইভাবে নিঃসংশয়িত হওয়ার পর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এর মধ্যে হলদিবাড়ি থানা কোচবিহারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোচবিহারের সঙ্গে তার ভাষাগত সাদৃশ্য না থাকার কারণ হ'ল এই যে এই থানাটি কার্যতঃ জলপাইগুড়ি জেলারই মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলমাত্র। কারণ এই থানার উত্তর-পূর্বদিক দিয়ে তিস্তা নদী প্রবাহিত হয়ে এই অঞ্চলটিকে কোচবিহার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তাই রেলপথে বা যানবাহন চলার উপযোগী স্থলপথে হলদিবাড়িতে যেতে হলে জলপাইগুড়ির ভিতর দিয়েই

যেতে হয়। ফলতঃ হলদিবাড়ির সাংস্কৃতিক লেনদেন কোচবিহার অপেক্ষা সন্নিহিত অঞ্চল জলপাইগুড়ির সঙ্গেই বেশী পরিমাণে সংঘটিত হয়। আইন-আদালত, খাজনা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজে অবশ্য হলদিবাড়ির অধিবাসীদের কোচবিহারে যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত কাজে তাদের মূলতঃ কোচবিহার সহরপর্যন্তই যেতে হয়। সহরের বাইরে গ্রামের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এই যাতায়াত ভাষাগত সংযোগের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে না। ফলে কোচবিহারের সঙ্গে নয়, হলদি-বাড়ির ভাষাগত সাদৃশ্য গড়ে উঠেছে জলপাইগুড়ির সঙ্গে।

কোচবিহার জেলার মধ্যেও একাধিক কারণে ভাষাগত কিছু আঞ্চলিক বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। তুফানগঞ্জ এবং দিনহাটা মহকুমার কিছু পূর্বাংশ আসামের গোয়ালপাড়া সীমান্তের সন্নিকটবর্তী হওয়ার ফলে কিছু অসমীয়া শব্দ, যা গোয়ালপাড়ার রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত, উল্লিখিত অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষাতেও ঢুকে পড়েছে। এই ধরণের একটি শব্দ হল 'জুই'। এর অর্থ আগুন। গোয়ালপাড়ার রাজবংশী এবং পূর্ব আসামের অধিবাসীদের মধ্যে আগুনের প্রতিশব্দ হিসেবে এই শব্দটি প্রচলিত। অনুরূপ আর একটি শব্দ হ'ল 'ডচলা'। এর অর্থ কড়াই। এইভাবে অসমীয়া শব্দের ব্যবহার ছাড়াও উল্লিখিত অঞ্চলগুলির ভাষায় কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। যেমন উত্তম পুরুষের বহুবচনে প্রথমা বিভক্তিতে কোচবিহারের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে 'হামরা', 'হামা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয় সেখানে উল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে 'আমরা', 'আমরালা', 'আমরাগুলা' ইত্যাদি সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়।

কোচবিহারকে প্রায় সমানভাবে দুভাগে বিভক্ত করে এই জেলার মধ্য দিয়ে জলঢাকা নদী প্রবাহিত। নিম্ন গতিতে এই নদীর নামই স্থানবিশেষে 'জলঢাকা', 'মানসাই' ইত্যাদি। এই নদীর জলধারা বিশ শতকের শেষভাগেও রাজবংশীর মত একটি অনুন্নত সমাজের লোকদের কাছে দুরতিক্রম্য একটি বাধা হিসেবে পরিগণিত। সম্প্রতি এই নদীর উপরে দুটি জায়গায় সেতু তৈরী হওয়ার ফলে এই নদী এর দুই তীরবর্তী অধিবাসীদের কাছে আর কোনো বাধাই নয়। কিন্তু সেতু তৈরীর আগে পর্যন্ত এই নদীই কোচ-বিহারের পূর্বাংশ এবং পশ্চিমাংশের মধ্যে ব্যবধান তৈরী করে রেখে ছিল। একারণে পূর্বকোচবিহার এবং পশ্চিমকোচবিহারের মধ্যে ভাষাগত কিছু পার্থক্যসূত্র গড়ে উঠেছে। অনুরূপভাবে জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে তিস্তা নদী প্রবাহিত হওয়ার ফলে এই নদীর দুই তীরের রাজবংশীদের মুখের ভাষায় কিছু পরস্পরনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জন্ম নিয়েছে। ভাষাগত এই বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখেই সম্ভবতঃ তিস্তার পূর্বতীরের রাজবংশীরা পশ্চিম তীরের রাজবংশীদের ভাষাকে 'পারাপারিয়া ভাষা' এবং পশ্চিম তীরের রাজবংশীরা পূর্বতীরের রাজবংশীদের ভাষাকে 'আগাপারিয়া ভাষা' বলে থাকে। এই আগাপারিয়া ও পারাপারিয়া ভাষার মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর এ নিয়ে দুই তীরের অধিবাসীদের মধ্যে নানা

সমন্বয়ে হাস্য পরিহাস, 'ছিলকাভাঙা'* ইত্যাদি হয়ে থাকে। একইভাবে দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদা জেলার রাজবংশীদের মধ্যেও ভাষার দিক থেকে প্রচুর আঞ্চলিক বৈচিত্র্য রয়েছে। এই অঞ্চলের আঞ্চলিক বিভিন্নতার ভিত্তিতে ভাগ করতে হলে উত্তরবঙ্গকে বহুভাগে ভাগ বিভক্ত করতে হয়। এই বিভাজনের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনাও করা সম্ভব। গৃহীত প্রকল্পটির পরিসরের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা উল্লিখিত প্রকারের বিভাজন থেকে বিরত থেকেছি, এবং প্রধান প্রধান স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রকল্পভুক্ত অঞ্চলটিকে দুটি মুখ্য ভাষাভিত্তিক অঞ্চলে ভাগ করেছি।

উল্লেখের সুবিধার্থে এখন থেকে অঞ্চলদুটিকে যথাক্রমে 'কোচবিহার' এবং 'অন্যান্য অঞ্চল' বলে উল্লেখ করা হবে। আমাদের সমীক্ষায় এই দুটি অঞ্চলের ভাষার মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্যসূত্র সমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক

(১) শব্দের মধ্য এবং অন্ত্য অবস্থানে /ল/-এর উচ্চারণ থাকলেও কোচবিহারের রাজবংশীতে আদ্যাবস্থানে /ল/-এর উচ্চারণ নেই। শিষ্ট বাংলার মতো সমরূপবিশিষ্ট শব্দে এই জাতীয় ধ্বনিপরিবেশে ক্ষেত্রে /ল/-এর পরিবর্তে /ন/ উচ্চারিত হয়। যেমন-

শিষ্ট বাংলা	রাজবংশী	
ললিত	নলিত	
লাল	নাল	
লজ্জা	নইজ্জা	ইত্যাদি।

কিন্তু কোচবিহার ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে এই জাতীয় ধ্বনিপরিবেশে /ল/-এর উচ্চারণ প্রচলিত। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
নাজ,	লাজ,	'লজ্জা'	
নিগাইস,	লেগায়,	'নিয়ে যাব'	ইত্যাদি।

(২) কোচবিহারের অন্যান্য অবস্থানে /র/-এর উচ্চারণ থাকলেও আদ্যাবস্থানে নেই। যেমন-

মূল শব্দ	রাজবংশী	
রক্ত	অক্তো	
রস	অস,	
রাজা	আজা	ইত্যাদি।

---

* উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রবাদ উদ্ধৃত করে বক্রোক্তি করার একটি রীতি মহিলাদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়। এই রীতি বা কৌশলকে বলা হয় 'ছিলকাভাঙা'।

কিন্তু কোচবিহার ব্যতিরিক্ত অন্যান্য অঞ্চলে আদ্যব্যঞ্জন হিসেবে /র/-এর ব্যবহার আছে। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
অ	রশ	'থাকা'
উই	রুহি	'রুই মাছ'
অঙিনা	রঙিনা	'রঙিন' ইত্যাদি।

(৩) দ্ব্যক্ষরতার প্রবণতার জন্য রাজবংশীতে দুই-এর অধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি বিলুপ্ত হয়ে তা দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে পরিণত হয়। কোচবিহারের তুলনায় অন্যান্য অঞ্চলে অক্ষরসংকোচের এই প্রবণতা অধিক মাত্রায় লক্ষ করা যায়। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
এইপাকে	এইপকে	'এইদিকে'
ঐপাকে	ঐপকে	'ঐদিকে'
হেপাকে	হেপকে, হিপকে	'এইদিকে' ইত্যাদি।

(৪) মধ্যবর্তী স্বরধ্বনির বিলোপের মাধ্যমে দুই-এর অধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে রূপান্তর ছাড়াও শব্দের অন্ত্যস্বরের অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর এবং তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির বিলোপের মাধ্যমেও অন্যান্য অঞ্চলে দুই-এর অধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে পরিণত হয়। কোচবিহারে এই জাতীয় ধ্বনিপরিবর্তন এবং বিলোপের ঘটনা বিরলদৃষ্ট। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
থিপকুরি	থিপকো	'তাড়াতাড়ি'
অ্যাঙকুরি	অ্যাঙকো	'এইভাবে'
ক্যাঙকুরি	ক্যাঙকো	'কেমন করে'
জ্যাঙকুরি	জ্যাঙকো	'যেভাবে' ইত্যাদি।

(৫) শব্দের আদিতে কোচবিহারের মধ্যোচ্চ পশ্চাৎ স্বর /ও/ থাকলে তা অন্যান্য অঞ্চলে মধ্যনিম্ন পশ্চাৎ স্বর /অ/-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
বোকা	বকা	'নির্বোধ'
পোকা	পকা	'পোকা'
ওগ্রা	অগ্রা	'উদ্গীরণ করা'
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
দোকট়া	দকট়া	'দাঁত দিয়ে কাটা'
ওছা	অছা	'বিছানো'
ওসার়	অসার়	'প্রস্থ, পরিসর'
দোতা	দতা	'মোটা দড়ি'
থোপা	থপা	'থোপা'
জোতা	জতা	'জুতা'
ওঠা	অঠা	'ওঠা, ওঠানো'
দোলা	দহলা	'নীচু জমি'
জোন্	জন্	'জন'
বোটা	বটা	'বোটা' ইত্যাদি।

(৬) কোচবিহারে ব্যবহৃত কিছু শব্দের আদ্যস্থ ধ্বনি /আ/ অন্যান্য অঞ্চলে /অ/-তে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
আগুন্	অগুন্	'আগুন'
আঘোন্	অঘোন্	'অগ্রহায়ণ মাস'
আচম্বিত্	অচম্বিত্	'হঠাৎ'
আচানোক্	অচানোক্	'আশ্চর্যজনক'
কাটোল্	কটোয়াল্	'কাঠাল' ইত্যাদি।

(৭) কিছু কিছু শব্দের আদ্যস্বর কোচবিহারে যেখানে উচ্চ ও পশ্চাৎ অন্যান্য অঞ্চলে তা মধ্যোচ্চ পশ্চাৎ স্বরে পরিণত হয়। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
হুকা	হোকা	'হুঁকা'
জুতা	জোতা	'জুতা'
মুরা	মোরা	'মোড়া' ইত্যাদি।

(৮) কোচবিহারে শব্দগত স্বরসঙ্গতির সংঘটন বিপুল পরিমাণে দেখা যায়। অন্যান্য অঞ্চলে এই জাতীয় ধ্বনিপরিবেশে এই অঞ্চলের স্বরসঙ্গতির উদাহরণ দুর্লভ। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
দেখুছু	দেখিছু	'দেখেছি'

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
দেখুলুঙ্	দেখিনু	'দেখলাম'
দেখুছুলুঙ্	দেখিছিনু	'দেখেছিলাম'
দেখুলু	দেখিলো	'দেখলে, দেখলি'
দেখুবু	দেখিবো	'দেখবে, দেখবি'
বোসুলুঙ্	বসিনু	'বসলাম'
লেখুলুঙ্	লেখিনু	'লিখলাম'
খুজুলুঙ্	খুজিনু	'খোঁজ করলাম'
পুছুলুঙ্	পুছিনু	'জিজ্ঞাসা করলাম'
পুছুলু	পুছিলো	'জিজ্ঞাসা করলে, করলি' ইত্যাদি।

(৯) কোচবিহারে ব্যবহৃত শব্দমধ্যস্থ কতিপয় অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি জলপাইগুড়ি এবং অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চারণে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন হিসেবে উচ্চারিত হয়। কোচবিহারে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের এই জাতীয় মহাপ্রাণতা ঘটে না। যেমন—

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
কাটি	খাটি	'কাঠি'
আগুন্	অঘুন্	'আগুন'
আগোন্	অঘোন্	'অগ্রহায়ণ মাস'
এইটে	এইঠে	'এখানে'
ওইটে	ওইঠে	'ওখানে'
আটিয়া	আঠিয়া	'আঁটি ওয়ালা'
নাটেরা	নাঠেরা	'দুর্বল'
লাটি	লাঠি	'লাঠি'
আটি	আঠি	'বোবা'
গাটি	গাঠি	'গাঁটি'
বাদার্	বাধার্	'অপদার্থ'
কাটোল্	কঠোয়াল্	'কাঁঠাল'
বতুয়া	বথুয়া	'এক প্রকারের শাক'
নিদুয়া	নিধুয়া	'ধনহীন' ইত্যাদি।

(১০) মহাপ্রাণতার দিকে ঝোঁক থাকার ফলে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে রূপান্তরের পরিবর্তে অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চারণে কখনো কখনো সেই ব্যঞ্জনের বা স্বরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্থানে একটি /হ/ ধ্বনির আগম ঘটে। এই জাতীয় রূপান্তর বা আগমের ঘটনা কোচবিহারের উচ্চারণে লক্ষ্য করা যায় না। যেমন–

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
উঁমা	অমহ্রা	'তারা, তিনি'
তোমা	তোমহ্রা	'তোমরা, আপনি, আপনারা'
উঁমার্	অমহ্রার্	'তাদের, তাঁর, তাঁদের'
তোমার	তোমহ্রার্	'তোমাদের, আপনার, আপনাদের'
দোলা	দহলা	'নীচু জমি'
দোতা	দহতা	'মোটা দড়ি'
বইন্	বহিন্	'বোন'
খই	খহি	'রেখা'
বায়রা	বাহেরা	'বাহির'
গাইন্	গাহিন্	'উদুখল দণ্ড'
গোম্	গোহোম্	'গম'
পইলা	পহিলা	'প্রথম'
পই	পহি	'পুঁটি'
বয়রা	বহেরা, বহিরা	'কালা (পুং)'
বইরি	বহিরি	'কালা (স্ত্রী)'
পোয়াতি	পোহাতি	'প্রসূতি, প্রভাতকালীন'
গোয়ালি	গোহালি	'গোয়াল'
দই	দহি	'দই'
ইঁমা	হিমা	'এরা, এঁরা'
উঁমা	হুমা	'তারা, তিনি, তাঁরা'
ঝোয়ারি	ঝোহারি	'বাঁশের তৈরী দরজা'
পোয়াল্	পোহাল্	'বিচুলি' ইত্যাদি।

(১১) কোচবিহারে ব্যবহৃত কিছু শব্দের মধ্যবর্তী নাসিক্য ব্যঞ্জন মহাপ্রাণতার দিকে ঝোঁক থাকার ফলে অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চারণে অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত হয়। যেমন–

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
আঘক্রা	আচোকা	'হঠাৎ'
পঞোর্	পহোর্	'পাঁজর'
টুঙি	টুহি	'০ বদ্রের শীর্ষস্থান'
বামোন্	বাহোন্	'ব্রাহ্মণ'
শিঙানি	শিহানি	'কফ'
ফিঙ্রা	ফিহিরা	'ফুলে ওঠা' ইত্যাদি।

রূপতাত্ত্বিক
----

(১) কারক ও বিভক্তির ক্ষেত্রে ঃ–

কারক ও বিভক্তির ক্ষেত্রে কোচবিহারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। কেবল কোচবিহারে যেখানে তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন 'দিয়া' অন্যান্য অঞ্চলে সেখানে তা 'দি'। বলাই বাহুল্য সংক্ষিপ্তকরণ প্রবণতার জন্যই এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্নও কোচবিহারের তুলনায় অন্যান্য অঞ্চলে কিছুটা স্বতন্ত্র। কোচবিহারে পঞ্চমী বিভক্তি নিষ্পন্ন হয় '[illegible]' 'ঠে–থাকি'যোগে। অন্যান্য অঞ্চলে তা নিষ্পন্ন হয় 'ঠে–ত্থকা'যোগে। সপ্তমী বিভক্তিতেও কোচবিহারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। এক্ষেত্রে কোচবিহারে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন 'ঠে'এবং অন্যান্য অঞ্চলে 'ঠ'। দুটি বিভক্তির ক্ষেত্রে এই ধরণের পার্থক্যের মূলে রয়েছে অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চারণে-র মহাপ্রাণতা। এছাড়া কারক বিভক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য দুটি অঞ্চলের মধ্যে নেই। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
তৃতীয়া	মোক্ দিয়া	মোক্দি	'আমাকে দিয়ে'
পঞ্চমী	মোরঠে থাকি	মোরঠে ত্থকা	'আমার কাছ থেকে'
সপ্তমী	মোরঠে	মোরঠ	'আমার কাছে' ইত্যাদি।

সর্বনাম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও দুটি অঞ্চলের মধ্যে বিভক্তির এই ধরণের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

পুরাঘটিত বর্তমান

পুরাঘটিত বর্তমান কালে ক্রিয়ার রূপ গঠনে কোচবিহারে মূল ধাতু স্বরান্ত হলে তার উত্তরে উত্তম পুরুষের একবচনে 'ছুঙ্', বহুবচনে 'ছি', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'ছিস্', বহুবচনে 'ইছেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'ইছে' বিভক্তি যুক্ত হয়। অন্যান্য অঞ্চলে এই বিভক্তিগুলি যথাক্রমে 'ছু', 'ছি', 'ছিত্', 'ইছেন্', এবং 'ইছে'। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে যুক্ত বিভক্তিগুলি এক্ষেত্রে কোচবিহারে উত্তম পুরুষের একবচনে 'উছুঙ্', বহুবচনে 'ইছি', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'ইছিস্', বহুবচনে 'ইছেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'ইছে'। অন্যান্য অঞ্চলে এই বিভক্তিগুলি যথাক্রমে 'ইছু', 'ইছি', 'ইছিত্', 'ইছেন্', এবং 'ইছে'। উদাহরণ—

স্বরান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	খাছুঙ্	খাছু	'খেয়েছি'	
মধ্যম	খাছিস্	খাছিত্	'খেয়েছিস'	
প্রথম	খাইছে	খাইছে	'খেয়েছে'	ইত্যাদি

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	দেখুছুঙ্	দেখিছু	'দেখেছি'	
মধ্যম	দেখিছিস্	দেখিছিত্	'দেখেছিস'	
প্রথম	দেখিছে	দেখিছে	'দেখেছে'	ইত্যাদি

সাধারণ অতীত

সাধারণ অতীত কালে কোচবিহারে স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে উত্তম পুরুষের একবচনে 'লুঙ্', বহুবচনে 'ইলোঙ্', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'লু', বহুবচনে 'ইলেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'ইল্' বিভক্তি যুক্ত হয়। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে প্রযুক্ত এই বিভক্তিগুলি হ'ল যথাক্রমে 'উলুঙ্', 'ইলোঙ্', 'উলু', 'ইলেন্' এবং 'ইল্'। অন্যান্য অঞ্চলে এক্ষেত্রে স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে প্রযুক্ত বিভক্তিগুলি হ'ল উত্তম পুরুষের একবচনে 'মু', বহুবচনে 'ইনো, মধ্যম পুরুষের একবচনে 'লো', বহুবচনে 'ইলেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'ইল্'। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর ক্ষেত্রে এই বিভক্তিগুলি যথাক্রমে 'নু', 'ইনো', 'ইলো', 'ইলেন্' এবং 'ইল্'। উদাহরণ—

স্বরান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	খানুঙ্	খানু	'খেলাম'	
মধ্যম	খালু	খালো	'খেলে, খেলি'	
প্রথম	খাইল্	খাইল্	'খেল'	ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	করুনুঙ্	করনু	'করলাম'	
মধ্যম	করুলু	করিলো	'করলে, করলি'	
প্রথম	করিল্	করিল্	'করল'	ইত্যাদি।

পুরাঘটিত অতীত

পুরাঘটিত অতীতে ক্রিয়ার রূপ গঠনে কোচবিহারের স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে উত্তম পুরুষের একবচনে 'ছুনুঙ্', বহুবচনে 'ছিলোঙ্', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'ছুলু', বহুবচনে 'ছিলেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'ইছেলো' বিভক্তি যুক্ত হয়। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে এই বিভক্তিগুলি যথাক্রমে 'উছুনুঙ্', 'ইছিলোঙ্', 'উছুলু', 'ইছিলেন্' এবং 'ইছেলো'। অন্যান্য অঞ্চলে পুরাঘটিত অতীতের ক্রিয়ার রূপে প্রযোজ্য বিভক্তিগুলি হ'ল উত্তম পুরুষের একবচনে 'ছিনু', বহুবচনে 'ছিনো', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'ছিলো', বহুবচনে 'ছিলেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'ইছেলো'। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে প্রযোজ্য বিভক্তিগুলি এক্ষেত্রে যথাক্রমে 'ইছিনু', 'ইছিনো', 'ইছিলো', 'ইছিলেন্' এবং 'ইছেলো'। উদাহরণ-

স্বরান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	খাছুনুঙ্	খাছিনু	'খেয়েছিলাম'	
মধ্যম	খাছুলু	খাছিলো	'খেয়েছিলে'	
প্রথম	খাইছেলো	খাইছেলো	'খেয়েছিল'	ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
উত্তম	করুছুনুঙ্	করিছিনু	'করেছিলাম'

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
মধ্যম	করুছুনু	করিছিলো	'করেছিলে'	
প্রথম	করিছেলো	করিছেলো	'করেছিল'	ইত্যাদি।

সাধারণ ভবিষ্যত

কোচবিহারে সাধারণ ভবিষ্যত কালে ক্রিয়ার রূপ গঠনে স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে যুক্ত বিভক্তিগুলি হল উত্তম পুরুষের একবচনে 'ইম্', বহুবচনে 'ইমো', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'বু', বহুবচনে 'বেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'বে'। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে এই বিভক্তিগুলি যথাক্রমে 'ইম্', 'ইমো', 'উবু', 'ইবেন্' এবং 'ইবে'। অন্যান্য অঞ্চলে স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে এক্ষেত্রে উত্তম পুরুষের একবচনে 'ম', বহুবচনে 'মো', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'বো', বহুবচনে 'বেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে এবং বহুবচনে 'বে' বিভক্তি যুক্ত হয়। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে বিভক্তি সমূহ এক্ষেত্রে যথাক্রমে 'ইম্', 'ইমো', 'ইবো', 'ইবেন্' এবং 'ইবে'। উদাহরণ-

স্বরান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	খাইম্	খাম্	'খাব'	
মধ্যম	খাবু	খাবো	'খাবে'	
প্রথম	খাবে	খাবে	'খাবে'	ইত্যাদি

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	করিম্	করিম্	'করব'	
মধ্যম	করুবু	করিবো	'করবে'	
প্রথম	করিবে	করিবে	'করবে'	ইত্যাদি

নাবর্থ বা পূর্বকালিক অসমাপিকা ক্রিয়া

কোচবিহারে নাবর্থ বা পূর্বকালিক অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয় ক্রিয়ার নির্দেশক ভাবের সঙ্গে 'ই', 'ইয়া', 'এ', 'এয়া' ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে। অন্যান্য অঞ্চলে এই প্রত্যয়গুলি ঈষৎ ভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
করি/করিয়া	করি/করে/করিয়া	'করে'	
ধরে/ধরেয়া	ধরে/ধরেয়া/ধরায়	'ধরিয়ে'	ইত্যাদি

তুমর্থ বা উদ্দেশ্যার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া

কোচবিহারের মূল ধাতু স্বরান্ত হলে তার উত্তরে 'বার্' এবং ব্যঞ্জনান্ত হলে তার উত্তরে 'ইবার্' প্রত্যয় যোগ করে তুমর্থ বা উদ্দেশ্যার্থক অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন সম্পন্ন হয়। অন্যান্য অঞ্চলে এই প্রত্যয়দুটি যথাক্রমে 'বা' এবং 'ইবা'। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
কবার্	কবা, কহিবা	'বলতে'	
খাবার্	খাবা	'খেতে'	
জাবার্	জাবা, জাভা	'যেতে'	
করিবার্	করিবা	'করতে'	ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও উল্লিখিত প্রত্যয়গুলি তুমর্থ অসমাপিকার ভাব প্রকাশ করলেও কখনো কখনো কিছু অনুসর্গ এগুলির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এই অনুসর্গগুলি হ'ল 'বাদে', 'তানে', 'ধইন্দুন', 'নাগি' ইত্যাদি। এর মধ্যে 'বাদে', 'ধইন্দুন' এবং 'নাগি' বিশেষভাবে কোচবিহারেই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 'তানে' অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবহারে 'বাদে', 'ধইন্দুন' এবং 'নাগি' অপেক্ষা গুরুত্ব পায়। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
খাবার্বাদে	খাবা তানে	'খেতে'	
কবার্বাদে	কভা তানে	'বলতে'	
করিবার্ধইন্দুন	করিবা তানে	'করতে'	
জাবার্নাগি	জাভা তানে	'যেতে'	ইত্যাদি।

(৩) ধাতুর রূপেঃ-

অন্ত্যব্যঞ্জন /হ/ লুপ্ত হওয়ার ফলে যে সমস্ত ব্যঞ্জনান্ত ধাতু বাংলায় স্বরান্ত ধাতুতে রূপান্তরিত হয়েছে সেগুলি কোচবিহারে স্বরান্ত ধাতু হিসেবেই প্রচলিত। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে এই ধাতুগুলির অন্ত্যব্যঞ্জন /হ/ বজায় থাকে। ফলতঃ এই ধাতুগুলি উল্লিখিত অঞ্চল সমূহে ব্যঞ্জনান্ত। উদাহরণ-

মূল রূপ	কোচবিহারে প্রচলিত রূপ	অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত রূপ	
√বহ্	√ব	√বহ্	'বহন করা'
√রহ্	√র	√রহ্	'থাকা'
√কহ্	√ক	√কহ্	'বলা'
√সহ্	√স	√সহ্	'সহ্য করা' ইত্যাদি।

(৬) বহুবচন সূচক প্রত্যয়ের রূপে ঃ-

কোচবিহারে বহুবচন সূচক প্রত্যয় হিসেবে 'লা', 'গিলা' এবং 'ঘর্'-এর ব্যবহারই সর্বাধিক। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে এই প্রত্যয়গুলি যথাক্রমে 'লা', 'গুলা' এবং 'ঘ'। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
মান্ষিলা	মান্ষিলা	'মানুষগুলি'
মান্ষি গিলা	মান্ষি গুলা	'মানুষগুলি'
ঠাকুরের্ ঘর্	ঠাকুরের্ ঘ	'ঠাকুরেরা'
চ্যাংড়ার্ ঘর্	চ্যাংড়ার্ ঘ	'ছেলেরা' ইত্যাদি।

(৭) সংযোগমূলক ক্রিয়ার রূপে ঃ-

সংযোগমূলক ক্রিয়ার রূপ গঠনের ক্ষেত্রেও কোচবিহারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
করিবার্ নাগিবে	করিবা হবে	'করতে হবে'	
যাবার্ নাগিবে	যাবা হবে	'যেতে হবে'	
যাওয়া নায়	যাবা নাগে	'যেতে হয়'	
করিবার্ নাগিল্	করিবা হইল্	'যেতে হ'ল'	
বুঝিবার্ নাগে	বুঝিবা নাগে	'বুঝতে হয়	ইত্যাদি।

(৮) ধাতুতে ঃ-

অন্যান্য অঞ্চলে কিছু সংখ্যক ক্রিয়া ধাতুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি কোচবিহারে প্রচলিত নয়। এই ধাতুগুলির পরিবর্তে কোচবিহারে অন্য ক্রিয়া ধাতু ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
√থাপা	√দিরা	'দেখানো'
√ডওয়া	√কুট্	'কোটা'
√ অসরা	√মাখা	'মাখানো'
√পুক্	√দেখড়	'দেখা হওয়া'
√ব	√থাক্	'থাকা'
√উগুটা	√ঢাসা	'সন্ধান করা' ইত্যাদি।

শব্দভাণ্ডার

শব্দভাণ্ডারের দিক থেকে কোচবিহারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের পার্থক্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। একই শব্দ, যা কোচবিহারে ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চারণে ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে সামান্য পরিমাণে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। একই বিষয় বা বস্তুকে বোঝানোর জন্য দুটি অঞ্চলে পৃথক পৃথক শব্দের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রায় নেই বললেই চলে। তৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী শব্দের অনুপাতও দুটি অঞ্চলে প্রায় সমান।

সম্প্রদায়ভিত্তিক রূপবৈচিত্র্য

রাজবংশী ছাড়াও উত্তরবঙ্গের পলিয়া, দেশী, খ্যান, মুসলমান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেরাও যে আলোচ্য উপভাষাটি ব্যবহার করে এ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাজবংশী ব্যতিরিক্ত উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই ভাষার কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য আমাদের সমীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। এক মাত্র মুসলমান সমাজভুক্ত এই ভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের পারিবারিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যখন এই ভাষা ব্যবহার করে তখন তার কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাদের ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং পারিবারিক সম্পর্কের সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী এই ভাষাভাষী অপরাপর সম্প্রদায়গুলির এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত সমস্ত শব্দাবলী থেকে পৃথক। এছাড়া আরবী এবং ফারসী শব্দের অনুপাতও মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যবহারে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি অপেক্ষা কিছু বেশী। সুতরাং বলা যেতে পারে যে উত্তরবঙ্গের মুসলমান সমাজে আলোচ্য উপভাষাটির যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় তা মূলতঃ শব্দগত(Lexical)। এই ধরনের স্বাতন্ত্র্য সমগ্র বঙ্গদেশের বাংলাভাষী মুসলমান সমাজেও লক্ষ্য করা যায়।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা কোচবিহারে রাজবংশী জাতির লোকসংখ্যা বেশী। এবং বহুজাতিক ও বহু ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা কোচবিহার অপেক্ষা অন্যান্য অঞ্চলে বেশী।[১৭] তাছাড়া অন্যান্য অঞ্চলগুলি কমবেশী পরিমাণে ভিন্ন ভাষাভাষী এবং অরাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চল দ্বারা পরিবৃত। পক্ষান্তরে কোচবিহার চারদিক থেকেই আলোচ্য উপভাষা ব্যবহারকারী এবং রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত। সমগ্র উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের পর্যালোচনাতেও দেখা গিয়েছে

---

(১৭)সেনসাস রিপোর্ট অব ইণ্ডিয়া, ১৯৬১

যে কোচবিহার ছাড়া উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কোচবিহার এবং তৎসন্নিহিত কতিপয় অঞ্চল সাময়িকভাবে মুসলিম শাসনের আওতায় এসেও দীর্ঘকালীন বিদেশী শাসনের প্রতিষ্ঠা এখানে [illegible] কখনোই সম্ভব হয়নি। এক কথায় ছোট খাটো রাষ্ট্রনৈতিক গোলযোগ ছাড়া কোনো বড় রকমের রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় এই অঞ্চলে কখনো সংঘটিত হয়নি। ফলতঃ মোটামুটি ভাবে এক ধরণের রাষ্ট্রনৈতিক স্থিতাবস্থা এই অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকেই বজায় ছিল। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কোনো বড় রকমের রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাত সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের একাধিকবার এই ধরণের রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের আওতায় আসতে হয়েছে।

উপর্যুক্ত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অতঃপর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গত কারণ আছে যে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে আলোচ্য উপভাষাটি বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাতকে ধারণ করে তার মূল রূপ থেকে যে পরিমাণে বিচ্যুত বা বিবর্তিত হয়েছে, কোচবিহারের অপেক্ষাকৃত সুস্থ রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশে সেই পরিমাণে বিচ্যুত বা বিবর্তিত হয়নি। অর্থাৎ কোচবিহারের অধিবাসীদের মুখেই এই উপভাষার আদি এবং অকৃত্রিম রূপটি বজায় আছে।

এই যুক্তির ভিত্তিতে, কোচবিহার এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল সমূহে আলোচ্য উপভাষাটির যে রূপ প্রচলিত, বর্তমান আলোচনার জন্য আদর্শ হিসেবে সেই রূপটিকেই গ্রহণ করা হ'ল। এই সিদ্ধান্তের পরিপূরক রূপে অন্যান্য অঞ্চলের ভাষারূপের সঙ্গে কোচবিহারের ভাষারূপের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনাটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষ অংশে শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলার সঙ্গে কোচবিহারে প্রচলিত আলোচ্য উপভাষাটির একটি তুলনামূলক আলোচনাও যোগ করা হ'ল।

শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
মন্ত্র	মন্তুতার্
যন্ত্র	জন্তুতার্
তন্ত্র	তন্তুতার্
বস্ত্র	বস্তুতার্ ইত্যাদি।

(৫) শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন শিষ্ট বাংলায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ হয় না। এক্ষেত্রে আদিস্বরাগমের সাহায্যে শব্দের আদিস্থিত যুক্তব্যঞ্জনকে বিশ্লিষ্ট করে দেওয়া হয়। উদাহরণ-

শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
স্পর্ধা	আস্পদ্দা
স্নান	এস্নান্
স্থান	এস্থান্ ইত্যাদি।

(৬) ধ্বনির বিবর্তনে শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলা অপিনিহিতির স্তর অতিক্রম করে অভিশ্রুতি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ক্ষেত্রবিশেষে অপিনিহিতি ঘটলেও তা এই উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ধ্বনির বিবর্তনে উত্তরবঙ্গের উপভাষা অংশতঃ অপিনিহিতির স্তর পর্যন্তই অগ্রসর হয়েছে। অভিশ্রুতি এই উপভাষায় ঘটেনি।

উত্তরবঙ্গের উপভাষা	শিষ্ট বাংলা
কালি/কাইল্	কাল
আজি/আইজ্	আজ
রাতি/রাইত্	রাত
করিয়া/করি	ক'রে
জনুয়া	জোনো ইত্যাদি।

রূপগত :-

(১) কর্ম, সম্প্রদান এবং অধিকরণ এই তিনটি কারকের বিভক্তি উত্তরবঙ্গের উপভাষা এবং [illegible] শিষ্ট বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন। উদাহরণ -

	শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
কর্ম	কে(বাবাকে)	ক(বাবাক)

	শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
সম্প্রদান	কে (সাধুকে)	ক (সাধুক)
অধিকরণ	এ, তে (ঘরে, বাড়িতে)	ত (ঘরোত্, বাড়িত)

উল্লেখ্য যে পদের দ্বিত্ব ঘটলে উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও অধিকরণের বিভক্তি হিসেবে 'এ' ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- গাছে-গাছে 'গাছে গাছে', ঘরে-ঘরে 'ঘরে ঘরে' ইত্যাদি।

(২) শিষ্ট বাংলায় বচনভেদে ক্রিয়ার রূপান্তর ঘটে না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় একমাত্র প্রথম পুরুষ ব্যতীত অন্য সব পুরুষের ক্ষেত্রেই বচনভেদে ক্রিয়ার রূপ ভিন্নতাপ্রাপ্ত হয়। উদাহরণ-

শিষ্ট বাংলা		উত্তরবঙ্গের উপভাষা	
একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
আমি যাই	আমরা যাই	মুই জাঙ্	হামরা জাই
তুই যাস	তোরা যাস	তুই জাইস্	তোমরা জান্ ইত্যাদি।

(৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রিয়া বিভক্তি সমূহ শিষ্ট বাংলা এবং উত্তরবঙ্গের উপভাষা উভয়তঃই অভিন্ন হলেও বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে এ বিষয়ে উভয় ক্ষেত্রেই কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ-

	শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
উত্তম পুরুষ, বর্তমান কাল	করি	করোঙ্
উত্তম পুরুষ, অতীত কাল	করলাম	করনুঙ্
উত্তম পুরুষ, ভবিষ্যত কাল	করব	করিম্ ইত্যাদি।

বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'রূপতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ের ক্রিয়া পর্যায় দ্রষ্টব্য।

পদবিন্যাস গত ঃ-

(১) নঞর্থক অব্যয় 'না' শিষ্ট বাংলায় সাধারণতঃ ক্রিয়ার পরেই ব্যবহৃত হয়। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যে নঞর্থক অব্যয় 'না' সাধারণভাবে ক্রিয়ার আগে বসে। উদাহরণ -

শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
আমি যাব না	মুই না জাইম্
তুমি ভাত খেও না	তুই ভাত্ না খাইস্
সে বাড়ি যাবে না	উঁয়ায় বাড়ি না জাবে ইত্যাদি

(২) পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে শিষ্ট বাংলা অপেক্ষা উত্তরবঙ্গের উপভাষায় পদবিন্যাসরীতি শিথিল। অর্থাৎ পদবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই উপভাষায় মোটামুটিভাবে একপ্রকারের শৃঙ্খলা থাকলেও এই শৃঙ্খলা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্ষা করা হয় না। যেমন-'মুই ভাত্ খাঙ্'এই বাক্যটিকে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় 'খা খাঙ্, মুই ভাত্', 'ভাত্ খা খাঙ্ মুই', 'ভাত্ মুই খা খাঙ্', 'খা খাঙ্ মুই ভাত্', 'মুই খা খাঙ্ ভাত্' - ইত্যাদিরূপ বাক্যে উপস্থাপিত করা সম্ভব। এই ধরনের উপস্থাপনায় এক্ষেত্রে ব্যাকরণগত প্রমাদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই বাক্যটির অনুবাদ শিষ্ট বাংলায় 'ভাত খাইনা আমি' এবং 'আমি ভাত খাইনা' এই দুটি বাক্যের মাধ্যমেই সম্ভব।

শব্দভাণ্ডার ঃ-

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তৎসম, অর্ধতৎসম এবং বিদেশী শব্দের অনুপাত শিষ্ট বাংলা অপেক্ষা কম। পক্ষান্তরে তদ্ভব এবং দেশী শব্দের অনুপাত এই উপভাষায় শিষ্ট বাংলা অপেক্ষা বেশী। এছাড়া এই বিষয়ে শিষ্ট বাংলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষার উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই।

তৃতীয় অধ্যায়

ধ্বনিতত্ত্ব

স্বরধ্বনি

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় মোট সাতটি স্বরধ্বনিগোষ্ঠ আছে। এগুলি হ'ল /অ/, /আ/, /ই/, /উ/, /এ/, /ও/ এবং /অ্যা/। উচ্চারণকালে জিভ, ঠোঁট এবং চোয়ালের অবস্থান, উচ্চতা এবং দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী শ্বাসধ্বনির নির্গমন পথের আকৃতি অনুসারে এদের প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাজন নিম্নানুরূপ ভাবে করা যেতে পারে।

ধ্বনিগোষ্ঠ (phoneme)	সহধ্বনি (allophone)	বিবরণ
/অ/	[অ]	পশ্চাৎ, মধ্যনিম্ন, অর্ধসংবৃত, বর্তুল
/আ/	[আ]	কেন্দ্রীয়, নিম্ন, বিবৃত, প্রসারিত
/ই/	[ই]	সম্মুখ, উচ্চ, সংবৃত, প্রসারিত
/উ/	[উ]	পশ্চাৎ, উচ্চ, সংবৃত, বর্তুল
/এ/	[এ]	সম্মুখ, মধ্যোচ্চ, অর্ধসংবৃত, প্রসারিত
/ও/	[ও]	পশ্চাৎ, মধ্যোচ্চ, অর্ধসংবৃত, বর্তুল
/অ্যা/	[অ্যা]	সম্মুখ, মধ্যনিম্ন, অর্ধবিবৃত, প্রসারিত

সম্মুখবর্তী তিনটি স্বর /ই/, /এ/ এবং /অ্যা/-এর উচ্চারণকালে জিভের সামনের অংশকে তালুর শক্ত অংশের দিকে উঁচু করে তুলে ধরতে হয়। এদিক থেকে বিচার করলে উল্লিখিত তিনটি স্বরকে তালব্য স্বরধ্বনি বলে অভিহিত করা যায়। অপর পক্ষে /অ/, /উ/ এবং /ও/ পশ্চাৎবর্তী এই তিনটি স্বরের উচ্চারণে জিহ্বার পেছনের অংশকে তালুর নরম অংশের দিকে তুলে ধরতে হয়। সুতরাং পূর্বোক্ত বিচার পদ্ধতি অনুসারে এদের কণ্ঠ্য কণ্ঠ্য স্বরধ্বনি বলে চিহ্নিত করা চলে।

তালিকাভুক্ত এই সাতটি স্বরধ্বনিগোষ্ঠের পারস্পরিক বৈপরীত্য বা পৃথকত্ব প্রদর্শনের জন্য নিম্নানুরূপ ভাবে পাঠ প্রতিকল্পন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

অ। ইন্=অইন 'বাহির'

আ। ইন্= আইন, 'আন'

ই। আয়=ইয়ায় 'এই ব্যক্তি'

উ। আয়=উয়ায় 'সে, সেই ব্যক্তি'

এ। ত্তি=এত্তি 'এখানে'

ও। তৃতি=ওতৃতি 'ওখানে'

ও। দি=ওদি 'ওদিকে'

অ্যা। দি=অ্যাদি 'এদিকে'

একক স্বরধ্বনির বিস্তারণ ঃ

	আদিতে		মধ্যে		অন্ত্যে	
/অ/	অক্তো	'রক্ত'	-		স	'শত, সহ্য কর'
/আ/	আগাল্	'অগ্রভাগ'	পাবার্	'প্রান্তভাগ'	নাউয়া	'নাপিত'
/ই/	ইয়ায়	'এই ব্যক্তি'	জালিয়া	'জেলে'	পাতারি	'পাতা'
/উ/	উয়ায়	'সে'	বনুয়া	'বন্য'	বনু	'ভগ্নীপতি'
/এ/	এতৃতি	'এখানে'	বলেয়া	'বলয়'	কোটে	'কোথায়'
/ও/	ওশার্	'বৃক্ষ'	বলোদ্	'বলদ'	আবো	'মাতামহী'
/অ্যা/	অ্যালা	'এখন'	ব্যালা	'বেলা'	হ্যা	'হ্যাঁ'

এই উপভাষায় অন্ত্যস্বরধ্বনি হিসেবে /অ/ এবং/অ্যা/-এর ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। যে সমস্ত ক্রিয়াধাতুর অন্ত্যব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে সেগুলি এই উপভাষায় স্বরান্ত ধাতুতে পরিণত হয়েছে সেই সমস্ত ক্রিয়াধাতুর ক্ষেত্রে এবং সংখ্যাসূচক শব্দ 'শত' ইত্যাদির ক্ষেত্রেই /অ/ এবং সামান্য কিছু আবেগ-সূচক অব্যয় শব্দে /অ্যা/ অন্ত্যস্বরধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যৌগিক স্বর ঃ

সাধারণভাবে দুটি স্বরধ্বনিকে একসঙ্গে উচ্চারণ করা হলে তাকে দ্বিস্বর, তিনটি স্বরধ্বনিকে একসঙ্গে উচ্চারণ করা হলে তাকে ত্রিস্বর এবং চারটি স্বরধ্বনিকে একসঙ্গে উচ্চারণ করা হলে তাকে চতুঃস্বরধ্বনি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে একাধিক স্বরধ্বনিকে পাশাপাশি উচ্চারণ করলেই তা যৌগিক স্বর হয়ে ওঠে না। একাধিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ একাক্ষর হলে তবেই তাকে যৌগিক স্বর বলা চলে। কিন্তু একাধিক স্বরধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারণ করলেও যদি তাকে একাধিক অক্ষরে ভাগ করা যায় তাহলে তাকে যৌগিক স্বর বলা যায় না। অর্থাৎ এক নিঃশ্বাসের এক বারের চেষ্টায় যদি একাধিক স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তাহলে তাকেই বলা যায় যৌগিক স্বর। কিন্তু এক নিঃশ্বাসের একাধিক স্বতন্ত্র চেষ্টায় একাধিক স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হলে তা আর যৌগিক স্বর থাকে না। যেমন যা-ই (যা কিছু অর্থে) এই শব্দটিতে /আ/ এবং/ই/ এই স্বরধ্বনি দুটি পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও যেহেতু এদের

/ওআ ই আ/ ধোয়াইয়া 'ধোয়ার লোক'

পঞ্চস্বর ধ্বনি ঃ

চতুঃস্বর ছাড়াও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রত্যয়াদি কিছু শব্দে পঞ্চস্বর সমন্বয়ের দৃষ্টান্তও লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ–

অন্তস্থ/ব/ শ্রুতি যুক্ত /আ ও আ ই আ/ খাওয়াইয়া 'খাওয়ার লোক'

অন্তস্থ/ব/ শ্রুতি যুক্ত /অ ও আ ই আ/ কওয়াইয়া 'বক্তা'

অন্তস্থ/ব/ শ্রুতি যুক্ত /অ্যা ও আ ই আ/ দ্যাওয়াইয়া 'দাতা' ইত্যাদি।

দ্বিস্বর ধ্বনির বিস্তারণ ঃ

		আদিতে		মধ্যে		অন্তে	
/য়/ শ্রুতি যুক্ত	/অ আ/	অয়া	'ভেক'	–		নয়া	'নতুন'
	/অ ই/	অই	'থাকি'	বইনি	'বোন'	নই	'থাকি'
	/অ উ/	অউক্	'থাক'	কউক্	'বলুক'	বউ	'বধূ'
/য়/ শ্রুতি যুক্ত	/অ এ/	অয়	'থাকে'	বয়রা	'কালা'	বয়	'বহন করে'
	/অ ও/	অও	'থাক'	কওদা	'ঝিঁঝিঁ'	বও	'বহন কর'
	/আ ই/	আই	'মা'	বাইদা	'বেদে'	বাই	'দিদি'
	/আ উ/	আউলা	'এলোমেলো'	পাউদিয়ার	'নায়ক'	খাউ	'পরিশ্রম'
	/আ ও/	আও	'কথা'	বাওয়া	'বেঁটে'	গাও	'শরীর'
/য়/শ্রুতি যুক্ত	/আ এ/	আয়না	'আয়না'	কায়দা	'কৌশল'	দায়	'দায়িত্ব'
	/ই আ/	ইয়ায়	'এই ব্যক্তি'	বিয়াও	'বিবাহ'	খাটিয়া	'খাটিয়া'
	/ই ও/	–		তিওর্	'তীর'	–	
	/উ আ/	উয়ায়	'সে'	মধুয়ার	'প্রদীপ'	ধুয়া	'ধুমা'
	/উ ও/	–		দুওর	'দরজা'	–	
	/এ আ/	–		–		বেয়া	'খারাপ'
	/এ ই/	এই	'এই'	[illegible]		দেই	'দিই'
	/এ উ/	–		বেউলা	'বেহুলা'	ঢেউ	'ঢেউ'
	/এ ও/	এও	'এ-ও'	–		দেও	'দেয়'

/ওআ/ ওয়া	'গাছের তারা'	লোয়াম্	'ঘাম'	রোয়া	'এক প্রকার ধান'
/ওই/ ওই	'ঐ'	রোই	'কচুর পাটি'	-	
/অ্যা ও/ অ্যাও	'ইত্যাদি'	দ্যাওমা	'পুরোহিত'	দ্যাও	'দেবতা'

স্বরধ্বনির নাসিক্যীভবন :

যে সমস্ত অবস্থানে স্বরধ্বনিগুলিকে পাওয়া যায় তার প্রায় সমস্ত গুলিতেই নাসিক্যীভবন ঘটে থাকে। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

	আদিতে		মধ্যে		অন্ত্যে	
/অঁ/	অঁত্তি	'ওখানে'	-		-	
/আঁ/	আঁচরা	'আঁচল'	হাঁস্	'হাঁস'	গোটা	'তরপেট'
/ইঁ/	ইঁটা	'খাটির ঢেলা'	খুটিয়ার্	'খুটি'	হাতুড়ি	'হাতি'
/উঁ/	উঁচা	'উঁচু'	-		ঢেচুঁ	'কিছু'
/এঁ/	এঁত্তি	'এখানে'	ম্যাটেঁয়া	'নির্লজ্জ'	-	
/ওঁ/	ওঁদার্	'গুণ'	বাদোঁর্	'বানর'	বাবোঁ	'মাতামহী'
/অ্যাঁ/	অ্যাঁলাও	'এখন'	প্যাঁচা	'প্যাঁচা'	হ্যাঁ	'হ্যাঁ'

ব্যঞ্জন ধ্বনি

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যযুক্ত মোট সাতাশটি ব্যঞ্জনধ্বনি পেয়ে থাকে। এগুলি হ'ল /ক/, /খ/, /গ/, /ঘ/, /ঙ/, /চ/, /ছ/, /জ/, /ঝ/, /ট/, /ঠ/, /ড/, /ঢ/, /ত/, /থ/, /দ/, /ধ/, /ন/, /প/, /ফ/, /ব/, /ভ/, /ম/, /র/, /ল/, /স/ এবং /হ/। এদের প্রকৃতিগত শ্রেণী-বিভাজন নিম্নরূপ।

ধ্বনিগোত্র	সহধ্বনি	বিবরণ
/ক/	[ক]	স্পর্শ, অল্পপ্রাণ, অঘোষ, কোমল তালব্য, [illegible] কণ্ঠ্য, নিযুক্ত
/খ/	[খ]	স্পর্শ, মহাপ্রাণ, অঘোষ, কোমল তালব্য, কণ্ঠ্য, নিযুক্ত
/গ/	[গ]	স্পর্শ, অল্পপ্রাণ, ঘোষ, কোমল তালব্য, কণ্ঠ্য, নিযুক্ত

ফ্‌,ন্‌, ভ্‌,ন্‌। উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে এদের কাটিনাকার ঔষ্ঠ্য উষ্মধ্বনি বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই ধ্বনি দুটির আর এক প্রকার উচ্চারণে নীচের ঠোঁট উপরের দাঁতের মাড়ির পিছনে ঢুকে নিঃশ্বাস-বায়ুর নির্গমন পথকে কাটনের আকৃতিবিশিষ্ট করে তোলে। ফ্‌,য়াকোন্‌, = ভ্‌,য়ান্‌রা ইত্যাদি শব্দে /ফ্‌,/ ও /ভ্‌,/ এইভাবে উচ্চারিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এদের কাটিনাকার দন্তৌষ্ঠ্য উষ্মধ্বনি বলে অভিহিত করা যায়।

পূর্বের তালিকায় প্রদত্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি সমূহের পারস্পরিক বৈপরীত্য বা স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শনের জন্য এক্ষেত্রেও পাঠ প্রতিকল্পন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হ'ল।

ক। আন্‌ =কান্‌ 'সময়'

খ। আন্‌=খান্‌ 'গর্ত'

খ। নাই=খনাই 'খাদ্য রাখার বাঁশের তৈরী পাত্র'

গ। নাই=গনাই 'গনাই'

গ। আরা=গারা 'গর্ত'

ঘ। আরা=ঘারা 'কলসী'

চ। আওয়া=চাওয়া 'চাওয়া'

ছ। আওয়া=ছাওয়া 'সন্তান'

ছু। উয়া=ছুয়া 'অশুচি, অশৌচ'

জ। উয়া=জুয়া 'গরুর গাড়ির অংশবিশেষ'

জ। উটি=জুটি 'জোড়া'

ঝ। উটি=ঝুটি 'ঝুটি'

ট। অ্যাণ্ডা=ট্যাণ্ডা 'টক'

ঠ। অ্যাণ্ডা=ঠ্যাণ্ডা 'লাঠি বা দণ্ড'

ঠ। আইল্‌=ঠাইল্‌ 'গাছের ডাল'

ড। আইল্‌=ডাইল্‌ 'ডাল'

ড। অ্যারা=ড্যারা 'অস্থায়ী আবাস'

ঢ। অ্যারা=ঢ্যারা 'রশি তৈরীর যন্ত্র'

ত। আও=তাও 'রাগ বা তাপ'

থ। আও=থাও 'ঠাঁই'

ব।আও=বাও 'দৈ'

দ।আও=দাও 'দা'

দ।আরুয়া=দারুয়া 'জ্বলন্ত কাঠকয়লা'

ধ।আরুয়া=ধারুয়া 'ঋণগ্রস্ত'

প।আরা=পারা 'বাঘ ধরার যন্ত্রের অংশবিশেষ'

ফ।আরা=ফারা 'ফেড়া বা বিপদ'

চ।আন্=চান্ 'চাঁদ'

ব।আন্=বান্ 'বন্যা'

ব।আত্=বাত্ 'বাত রোগ'

ভ।আত্=ভাত্ 'ভাত'

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় স্বল্পভেদক শব্দযুগলের সংখ্যা কম বলে একমাত্র আদ্যাবস্থানেই ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শিত হ'ল।

একক ব্যঞ্জন ধ্বনির বিস্তারণ ঃ

	আদিতে		মধ্যে		অন্ত্যে	
/ক/	কপাল্	'কপালের [illegible]'	জাকলা	'এক প্রকার মই'	নাক্	'নাক'
/খ/	খবোর্	'খবর'	আখা	'উনুন'	অসুখ্	'অসুখ'(F.V.অসুক)[1]
/গ/	গবোর্	'গোবর'	বগোল্	'নিকট'	হাগ্	'মল ত্যাগ করা'
/ঘ/	ঘর্	'ঘর'	অঘোন্	'অগ্রহায়ণ'	বাঘ্	'বাঘ'(F.V. বাগ্)
/ঙ/	-		নাঙোল্	'লাঙল'	নাঙ্	'উপপতি'
/চ/	চড়ু	'উড়ু'	কাচাল্	'বিপত্তি'	ম্যালেছ্	'ম্লেচ্ছ'
/ছ/	ছাওয়া	'সন্তান'	পাছিলা	'পিছন'	বাছ্	'নিকৃষ্ট'(F.V. বাচ্)
/জ/	জোওয়াল্	'জোয়াল'	বাজ্না	'বাজনা'	কাজ্	'কাজ'(F.V কাচ্)
/ঝ/	ঝোলা	'ঝোলা'	বোঝারু	'ভারবাহী'(F.V.বোজারু)	বুঝ্	'জ্ঞান'(F.V. বুজ্)

---

(১)মহাপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ ঘোষ ধ্বনিগুলির মধ্যে এবং অন্ত্যে অনেক সময় তার অব্যবহিত পূর্বের অল্পপ্রাণ এবং অল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনির মত হয়। এই ধ্বনিগুলির এই জাতীয় বিকল্প উচ্চারণকে প্রবণীয় বৈষম্য (free variation ,সংক্ষেপে F.V) বলে ধরা যেতে পারে।

একমাত্র ধ্বন্যাত্মক শব্দেই এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে এই ধ্বনিটি /র/,/ল/,/ত/, /থ/ এবং/প/-কে দ্বিতীয় ব্যঞ্জন হিসেবে রেখে যুক্তব্যঞ্জন হিসেবেই উচ্চারিত হয়। যেমন- আস্‌তা 'রাস্তা', এস্‌নান্ 'স্নান', আস্‌পদ্ধা 'স্পর্ধা' ইত্যাদি।

অর্ধস্বর ধ্বনি

শব্দের মধ্যে দুটি একই স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকলে, অথবা দুটি শব্দের মধ্যে পরস্পর সন্নিহিত দুটি শব্দের মধ্যে একটি শব্দের অন্ত্যে এবং পরবর্তী শব্দটির আদিতে পাশাপাশি একই স্বরধ্বনি থাকলে একসঙ্গে উচ্চারণ করতে গিয়ে দুটি স্বরধ্বনির মাঝখানে অস্পষ্ট ভাবে কিছু ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এই জাতীয় অস্পষ্ট বা পিচ্ছিল শ্রুতিধ্বনি বা অর্ধস্বরধ্বনির সংখ্যা উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তিন। এই ধ্বনিগুলি হ'ল /য়/, অন্তস্থ/ব/ এবং/ই/।

/য়/শ্রুতির উদাহরণ

কয়া 'বলে', খায়া 'খেয়ে', জায়া 'গিয়ে', বয়া 'খারাপ', নয়া 'নতুন', পায়া 'পেয়ে' ইত্যাদি শব্দে /অ আ/, আ আ/, /আ আ/, /অ আ/, /অ আ/, /আ আ/-এর মাঝখানে মুখবিবর এবং জিহ্বার অবস্থিতিজনিত কারণে একপ্রকার পিচ্ছিল /য়/ধ্বনি অত্যন্ত কম সময়ের জন্য উচ্চারিত হয়। এই পিচ্ছিল ধ্বনিটুকুই পরবর্তী ধ্বনিটির সংযোগে এই জাতীয় শব্দগুলিতে /য়/শ্রুতি ঘটায়। এই ধরণের উচ্চারণে আপাতঃদৃষ্টিতে একাক্ষর শব্দ দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে পরিণত হলেও একে মূলতঃ জিহ্বার গতিশীলতা বলে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত। /য়/শ্রুতিযুক্ত উল্লিখিত শব্দগুলিকে নিম্নানুরূপ ভাবে লেখা যেতে পারে। কয়ুআ, খায়ুআ, জায়ুআ, বয়ুআ, নয়ুআ, পায়ুআ।

অন্তস্থ/ব/শ্রুতির উদাহরণ

অন্তস্থ /ব/শ্রুতিযুক্ত শব্দ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচুর পাওয়া যায়। যেমন- দোয়া 'দোয়া', হাওয়া 'বাতাস', তাওয়া 'তাওয়া', জাওয়া 'যাওয়া', খাওয়া 'খাওয়া', ইত্যাদি। খুব সতর্কভাবে এই শব্দগুলি উচ্চারণ করলে /ও/ এবং/আ/-এর মাঝখানে ঠোঁট গোল হয়ে পরক্ষণেই প্রসৃত হয়। ঠোঁটের এই রূপান্তর এবং গতিশীলতার ফলে যে অল্পস্থায়ী অস্পষ্ট ধ্বনি উচ্চারিত হয় তা-ই এই শব্দগুলির মধ্যে অন্তস্থ /ব/শ্রুতি ঘটায়। অন্তস্থ/ব/শ্রুতির জন্য বাংলা বর্ণমালায় কোনো নির্দিষ্ট অক্ষর না থাকায় বাংলা হরফে লিখে এই শব্দগুলির অভ্যন্তরস্থ অন্তস্থ/ব/ শ্রুতির বিষয়টিকে বোঝানো যাবে না।

/ই/ শ্রুতির উদাহরণ

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় খুব সীমিত সংখ্যক ক্ষেত্রেই /ই/ শ্রুতি ঘটে থাকে। /ই/শ্রুতিযুক্ত কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে এই বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করা গেল। নিয়া 'নিয়ে', দিয়া 'দিয়ে', বিয়াও 'বিবাহ' ইত্যাদি শব্দগুলিতে আদ্যস্বর /ই/ এবং অন্ত্যস্বর /আ/-এর ব্যবধানে /ই/ জাতীয় একটি শ্রুতি স্বল্পস্থায়ী অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে। বাংলা হরফে এক্ষেত্রেও স্বল্পস্থায়ী এই ধ্বনিটিকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হ'ল না। উল্লেখ্য যে এই তিনটি অর্ধস্বরধ্বনিই আলোচ্য উপভাষাটিতে অবাধ্য। অন্ত্যাবস্থানেও এদের লক্ষ্য করা যায় না।

যুক্ত ব্যঞ্জন

শব্দের আদিতে দ্বিত্বপ্রাপ্ত বা সামাসিক ব্যঞ্জন সংযোগের উদাহরণ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় নেই। আদ্য অবস্থানে অসামাসিক ব্যঞ্জন সংযোগের দৃষ্টান্তও এই উপভাষায় পাওয়া যায় না। তবে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে শব্দের আদিতে একটি বাড়তি স্বরধ্বনিকে স্থাপন করে আদ্যাবস্থানে অসামাসিক ব্যঞ্জন সংযুক্ত শব্দগুলিকে এক্ষেত্রে উচ্চারণ করা হয়। কখনো কখনো এই জাতীয় আদিস্বরাগমের ফলে যুক্ত-ব্যঞ্জনগুলি উচ্চারণের দিক থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ব্যঞ্জন /র/যুক্ত আদ্যাবস্থানে যুক্তব্যঞ্জন সংযুক্ত শব্দগুলিতে বাড়তি স্বরধ্বনিটি শব্দের আদিস্থিত ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত না হয়ে সেই ব্যঞ্জন এবং /র/-এর মধ্যে উচ্চারিত হয় এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনদুটি এতে বিশ্লিষ্ট একক ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ-

/প্‌র্‌/	প্রায়	পরায়
/ত্‌র্‌/	ত্রাণ	তেরান্‌ (বিকল্প উচ্চারণ - তান্‌)
/ব্‌র্‌/	বৃষ	বিরিশ্‌
/দ্‌র্‌/	দৃষ্টি	দিরিশ্‌টি (বিকল্প উচ্চারণ-দিশ্‌টি)
/গ্‌র্‌/	গ্রাম	গেরাম্‌
/ঘ্‌র্‌/	ঘ্রাণ	ঘেরান্‌
/স্‌র্‌/	সৃষ্টি	ছিরিশ্‌টি, শ্রী ছিরি
/হ্‌র্‌/	হ্রাস	হারাশ্‌

ইংরেজী কৃতঋণ শব্দেও এইভাবে যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণ-

/ক্‌র্‌/	ক্রক	কোরোক্‌, ক্রি কিরি
/ট্‌র্‌/	ট্রাম	টারাম্‌, ট্রেন টেরেন্‌, ট্রাক টারাক্‌

/ড্‌র্/ ড্রাম ডারাম, ড্রেন ডেরেন্ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ব্যঞ্জন /ল/ যুক্ত যুক্তব্যঞ্জনগুলিও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এইভাবে উচ্চারিত হয়। উদাহরণ-

/প্‌ল্/ প্লীহা পিলাই

/গ্‌ল্/ গ্লানি গেলানি

/শ্‌ল্/ শ্লোক শোলোক্ ইত্যাদি।

এই জাতীয় ইংরেজী কৃতঋণ শব্দেও যুক্তব্যঞ্জন এই পদ্ধতিতেই বিশ্লিষ্ট হয়। উদাহরণ-

/প্‌ল্/ প্ল্যান পেলান্, প্লাস্টিক পেলাস্টিক্, প্লেট পেলেট্

/ক্‌ল্/ ক্লাব কেলাব্, ক্লাস কেলাস্

/গ্‌ল্/ গ্লাস গিলাস্

/ব্‌ল্/ ব্লাউজ বেলাউজ্ ইত্যাদি।

আদ্যস্থানে /স/ প্রথম ব্যঞ্জন হিসেবে থেকে যুক্তব্যঞ্জন সৃষ্টি করলে শব্দের আদিতে স্বরাগম ঘটে। এক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হয় না। উদাহরণ-

/স্‌প্/ স্পর্ধা আস্পদ্ধা

/স্‌ত্/ স্তব এস্তব্ (বিকল্প উচ্চারণ -তব্)

/স্‌ফ্/ স্ফটিক এস্ফটিক্ (বিকল্প উচ্চারণ -ফটিক্)

/স্‌থ্/ স্থগিত এস্থগিত্ (বিকল্প উচ্চারণ-থগিত্)

ত্রিব্যঞ্জন /স্‌ত্‌র্/ স্ত্রী ইস্তিরি (বিকল্প উচ্চারণ-তিরি) ইত্যাদি।

ইংরেজী কৃতঋণ শব্দেও এইভাবে যুক্তব্যঞ্জনের বিশ্লেষ না ঘটিয়ে স্বরাগম ঘটে। উদাহরণ-

/স্‌ট্/ স্টেশন এস্টেশন্, স্টোভ এস্টোভ্

/স্‌ক্/ স্কুল ইস্কুল্ ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় যথাযথস্থানে দুই প্রকারের যুক্তব্যঞ্জনের সমাবেশ লক্ষ্য করা গিয়েছে। (১) সমাজিক ব্যঞ্জন সংযোগে সৃষ্ট যুক্তব্যঞ্জন (২) অসমাজিক ব্যঞ্জন সংযোগে সৃষ্ট যুক্তব্যঞ্জন। এর মধ্যে প্রথম প্রকারের যুক্তব্যঞ্জন, সমাজিক ব্যঞ্জন সংযোগে সৃষ্ট যুক্তব্যঞ্জনকে আলোচনা ক্ষেত্রে এটিকে এর বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য রেখে ধ্বনিদ্বিত্ব বা (Gemination) বলেও চিহ্নিত করা যায়। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় মূলতঃ অল্পপ্রাণ অঘোষ এবং অল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনিগুলিই সমাজিক ব্যঞ্জনযোগে এই জাতীয় ধ্বনিদ্বিত্ব ঘটায়। মহাপ্রাণ ধ্বনির দ্বিত্ব ঘটলে পরবর্তী ধ্বনিটির মহাপ্রাণতা বজায় থাকে। কিন্তু পূর্ববর্তী বা প্রথম ধ্বনিটি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন-

/খ্‌খ্/ /ক্‌খ্/ আইখ্‌খোন্‌ আইক্‌খোন্‌ 'ব্রাহ্মণ'
/ঘ্‌ঘ্/ /গ্‌ঘ্/ ঘোঘ্‌ঘোতা ঘোগ্‌ঘোতা 'প্রশস্ত'
/ছ্‌ছ্/ /চ্‌ছ্/ নছ্‌ছার্‌ নচ্‌ছার্‌ 'দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ'
/ত্‌ত্/ /থ্‌ত্/ আত্‌তাঙ্‌ আথ্‌তাঙ্‌ 'অস্ত্র' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকারের যুক্তব্যঞ্জন, অসামাজিক ব্যঞ্জন সংযোগে সৃষ্ট যুক্তব্যঞ্জন সমাবেশের ক্ষেত্রে আলোচ্য উপভাষায় অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, ঘোষ, অঘোষ ইত্যাদির বিধি নিষেধ বা পার্থক্য ততটা লক্ষ করা যায় না। পর পৃষ্ঠায় সামাজিক এবং অসামাজিক, উভয় প্রকারের ব্যঞ্জন সংযোগে সৃষ্ট যুক্ত-ব্যঞ্জন সমাবেশের বিবৃতি রেখাচিত্রে উপস্থাপিত হ'ল।

রেখাচিত্র : যুক্তব্যঞ্জন

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ট	ঠ	ড	ঢ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ	ব	ভ	ম	র	ল	শ	স	হ
ক	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
খ	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-
গ	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	-
ঘ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ঙ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-
চ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
ছ	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-
জ	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-
ঝ	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	-	-
ট	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
ঠ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-
ড	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ঢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ত	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
থ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
দ	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-
ধ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ন	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-
প	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-
ফ	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-
ব	-	+	+	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-
ভ	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ম	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
র	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
ল	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-
শ	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
স	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
হ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

/চ্‌ম্‌/ পাচ্‌মরিয়া 'যে জিনিসের দাম দ্রুত পরিবর্তনশীল'

/চ্‌ধ্‌/ পাচ্‌ধান 'পাঁচ প্রকারের ধান্যের সমন্বয়'

/চ্‌ন্‌/ বাচ্‌না 'বাচ'

/চ্‌প্‌/ পাচ্‌পান 'পাঁচ পান'

/চ্‌ফ্‌/ পাচ্‌ফোরোন্‌ 'পাঁচফোড়ন'

/চ্‌ব্‌/ পাচ্‌বার 'পাঁচবার'

/চ্‌ভ্‌/ পাচ্‌ভাইয়া 'পান্ডব, পাঁচ ভাইয়ের পরিবার'

/চ্‌ম্‌/ মচ্‌মচা 'মচমচে'

/চ্‌র্‌/ পাচ্‌রা 'উত্তরীয়'

/চ্‌ল্‌/ বাচ্‌লা 'খঞ্জন'

/চ্‌শ্‌/ পাচ্‌শায়্‌ 'পাঁচশের'

/ছ্‌ক্‌/ পছ্‌কুরি 'দ্রুত'

/ছ্‌ট্‌/ পাছ্‌টান্‌ 'পিছুটান'

/ছ্‌দ্‌/ পাছ্‌দুয়ার 'পেছনের দরজা'

/ছ্‌থ্‌/ পাছ্‌থাকি 'পেছন থেকে'

/ছ্‌ন্‌/ পছ্‌না(আলু) 'মাটির ভিতরে উৎপন্ন বড় আকারের একপ্রকার কন্দ'

/ছ্‌প্‌/ পছ্‌পরে 'দ্রুত'

/ছ্‌ব্‌/ পাছ্‌বারি 'বাড়ির পিছনের দিক, গৃহিনী'

/ছ্‌ভ্‌/ পাছ্‌ভারি 'পেছনভারী'

/ছ্‌য্‌/ মাছ্‌য়োঙ্‌ 'মাছ রাংগা'

/ছ্‌র্‌/ পছ্‌রা 'পাড়া'

/ছ্‌ল্‌/ পিছ্‌লা 'পিচ্ছিল'

/জ্‌ক্‌/ কাজ্‌কাম্‌ 'কাজকর্ম'

/জ্‌থ্‌/ বাজ্‌থাই 'বিশ্রী'

/জ্‌গ্‌/ অজ্‌গবিতে 'হঠাৎ'

/জ্‌ন্‌/ কাজ্‌না 'কেজো'

/জ্‌ঝ্‌/ কাজ্‌ঝারা 'কাজ ঝাড়া'

/জ্‌ট্‌/ কাজ্‌টা 'কাজটি'

/র্‌প্‌/ চাইর্‌পায়া 'চার পা বিশিষ্ট'
/র্‌ক্‌/ খর্‌কুরি 'খরকর'
/র্‌ব্‌/ গর্‌বা 'গর্ব'
/র্‌ত্‌/ গর্‌তা 'গর্ত'
/র্‌ম্‌/ ধর্‌মা 'ধর্ম'
/র্‌ল্‌/ খর্‌লা 'উত্তরবঙ্গের একটি নদীর নাম'
/র্‌ণ্‌/ তর্‌ণা 'তরুণ'
/ল্‌ক্‌/ হাল্‌কা 'হালকা'
/ল্‌খ্‌/ হাল্‌খাতা 'হালখাতা'
/ল্‌গ্‌/ গল্‌গলা 'দারবান'
/ল্‌ঘ্‌/ ঘল্‌ঘলিয়া 'নষ্ট, পচা'
/ল্‌চ্‌/ হাইল্‌চা 'দাড়ি'
/ল্‌ছ্‌/ কইল্‌ছে 'বলেছে'
/ল্‌জ্‌/ জল্‌জলিয়া 'জলীয়'
/ল্‌ঝ্‌/ বুল্‌ঝুঙ্‌' 'বুলবাম'
/ল্‌ট্‌/ টল্‌টলা 'পরিষ্কার'
/ল্‌ঠ্‌/ ঠল্‌ঠলা 'খুষিত'
/ল্‌ড্‌/ ডল্‌ডলা 'সতেজ'
/ল্‌ঢ্‌/ ঢোল্‌ঢোলা 'ঢিলেঢালা'
/ল্‌ত্‌/ আল্‌তা 'আলতা'
/ল্‌থ্‌/ থ্যাল্‌থ্যালা 'থলথলে, নরম'
/ল্‌দ্‌/ দল্‌দলা 'স্বাস্থ্যবান'
/ল্‌ধ্‌/ ধুল্‌ধুলা 'ধুলোর মত মিহি'
/ল্‌ন্‌/ ফ্যাল্‌না 'ফেলে দেওয়ার যোগ্য'
/ল্‌প্‌/ অল্‌পো 'অল্প'
/ল্‌ফ্‌/ হল্‌ফুলি 'উৎকণ্ঠা'
/ল্‌ব্‌/ দল্‌বল্‌ 'দলবল'
/ল্‌ভ্‌/ ডল্‌ভলা 'স্বাস্থ্যবান এবং উজ্জ্বল'
/ল্‌ম্‌/ ভ্যাল্‌মু 'উঁই পোকা'

/স্‌দ্‌/	নস্‌দিক্‌	'নিকট'
/স্‌ব্‌/	এস্‌বাব্‌	'স্থান'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আলোচনার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সাধারণিক এবং অসাধারণিক, উভয় প্রকার ব্যঞ্জন সংযোগে সৃষ্ট যুক্তব্যঞ্জনের যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে প্রচলিত মতানুসারে যুক্তব্যঞ্জনের উদাহরণ বলে চিহ্নিত করা গেলেও সেগুলি আসলে দুটি পরস্পরসন্নিহিত ব্যঞ্জনধ্বনির নৈকট্যযুক্ত উচ্চারণের উদাহরণ মাত্র। কারণ এই শব্দগুলিকে যুক্তব্যঞ্জনের জায়গায় ভেঙে একাধিক অক্ষরে বিভক্ত করা যায়। এইভাবে অক্ষরে বিভক্ত করে উচ্চারণ করলেও এই জাতীয় শব্দগুলির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য বা অর্থের কোনো তারতম্য ঘটে না। উদাহরণ হিসেবে 'আবেস্‌রা', এই শব্দটিকে নেওয়া যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এই শব্দটিতে /স/ এবং /র/-তে মিলে যুক্তব্যঞ্জন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শব্দটিকে যদি যুক্তব্যঞ্জনের জায়গায় ভেঙে দুটি অক্ষরে পরিণত করা যায় তাহলে এর উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য এবং অর্থ, এদুয়ের কোনোটিই পরিবর্তিত হয় না। অক্ষরে বিভক্ত করে লিখলে শব্দটি এইরকম হতে পারে 'আ।বেস্‌।রা'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় আপাতগ্রাহ্য বিচারে যুক্তব্যঞ্জন থাকলেও পূর্বোক্ত দৃষ্টিকোণের বিচারে কোনো যুক্তব্যঞ্জন নেই। কারণ এই উপভাষায় সমস্ত যুক্তব্যঞ্জনই অক্ষরে বিভাজনযোগ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে শুধু উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেই নয়, শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলাতেও একমাত্র শব্দের আদ্যাবস্থানে যুক্তব্যঞ্জনের কথা বাদ দিলে মধ্যাবস্থানে খুব কম ক্ষেত্রেই যুক্তব্যঞ্জন রয়েছে।

অন্ত্যাবস্থানে যুক্তব্যঞ্জনের উদাহরণ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় নেই। কিছু কিছু তৎসম শব্দের অন্তে যে ব্যঞ্জনসন্নিধি রয়েছে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে সেই ব্যঞ্জনসন্নিধি বজায় নেই। যেমন 'গোস্ত্‌'- এই শব্দটির অন্তে /স/ এবং /ত/-তে মিলে যুক্তব্যঞ্জন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই শব্দটির উচ্চারণ হ'ল 'গোস্তো'। ফলতঃ আপাতদৃষ্টিতে /স/ এবং /ত/-এর সংযোগে সৃষ্ট যুক্তব্যঞ্জনটি এই উচ্চারণে বজায় থাকলেও শব্দের শেষে একটি স্বরধ্বনি যুক্ত হওয়ার ফলে তা আর অন্ত্যাবস্থানে যুক্তব্যঞ্জনের উদাহরণ থাকছে না, পরিণত হচ্ছে মধ্যাবস্থানে যুক্তব্যঞ্জনের উদাহরণে।

অক্ষর এবং তার মধ্যে ধ্বনির বিন্যাস

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় একটি প্রশ্বাসবদ্ধ ধ্বনিগুচ্ছ (breath group) বা অক্ষর (syllable)-এ একটি স্বরধ্বনির উপস্থিতি অপরিহার্য। সুতরাং বলা যেতে পারে যে এই উপভাষায় অক্ষরে স্বরধ্বনি হ'ল প্রধান ধ্বনি বা peak sonority বা sonant , এবং অপ্রধান ধ্বনি হ'ল ব্যঞ্জনধ্বনি। যেখানে সুবিধের জন্য স্বরধ্বনিকে vowel (V) , এবং ব্যঞ্জনধ্বনিকে consonant বা (C) বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের অক্ষরে ধ্বনির বিন্যাস :

রুদ্ধ বা সংবৃত অক্ষরে : উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সংবৃত অক্ষরে প্রথমে একটি স্বর এবং তারপরে একটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে। অর্থাৎ সংবৃত অক্ষরের গঠন হ'ল VC । যেমন-আম্ 'আম' । আবার প্রথমে একটি ব্যঞ্জন, মধ্যে একটি স্বর এবং শেষে একটি ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়েও এক্ষেত্রে সংবৃত অক্ষর গঠিত হতে পারে। এর গঠন হ'ল CVC । যেমন - বান্ 'বন্যা'। শিষ্ট বাংলায় শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকে বলে সেক্ষেত্রে সংবৃত অক্ষরের প্রথমে দুটি ব্যঞ্জন(যুক্ত), মধ্যে একটি স্বর এবং শেষে একটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকতে পারে। অর্থাৎ শিষ্ট বাংলায় সংবৃত অক্ষরের গঠন CCVC- এই রকমেরও হতে পারে। যেমন - প্রাণ । আবার তিনটি ব্যঞ্জন মিলেও শিষ্ট বাংলায় যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হয়। এবং শব্দের গোড়াতেও তা উচ্চারিত হয়। ফলে সেক্ষেত্রে সংবৃত অক্ষরের গঠন CCCVC- এই ধরনেরও হয়। যেমন - স্ত্রী।কিন্তু আলোচ্য উপভাষায় শব্দের আদিতে দুটি বা তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনির সংযোগে সৃষ্ট যুক্তব্যঞ্জনের সমাবেশ ঘটেনা বলে উল্লিখিত প্রকারের অক্ষরের গঠন এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না।

মুক্ত বা বিবৃত অক্ষরে - উত্তরবঙ্গের উপভাষায় মুক্ত বা বিবৃত অক্ষরে ধ্বনির বিন্যাস নিম্নরূপ ।

(১) প্রথমে একটি ব্যঞ্জন এবং শেষে একটি স্বরধ্বনি । অর্থাৎ CV ।
যেমন - জা 'যাও', চা 'চা' ইত্যাদি ।

(২) একটি মাত্র স্বরধ্বনি । অর্থাৎ V । যেমন - অ,আ, ইত্যাদি ।

শিষ্ট বাংলায় শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকার ফলে সেক্ষেত্রে মুক্ত অক্ষরে ধ্বনির বিন্যাস নিম্নানুরূপ ধরনের হতে পারে।

(১) C V - চা,পা ইত্যাদি।

(২) V - আ,ও ইত্যাদি।

(৩) CCV - প্রা,ত্র,গ্রা ইত্যাদি।

(৪) CCCV - স্ত্রী ইত্যাদি।

বিভাজনাতিরিক্ত বা গৌণ ধ্বনিগোত্র

(১) মাত্রা : বাঙলাদেশে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় স্বরধ্বনি হ্রস্ব এবং দীর্ঘ, দু প্রকারের হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকটি স্বর অতিদীর্ঘও হয়। সাধারণভাবে দূরবর্তী কাউকে ডাকার সময় শব্দান্তে অবস্থিত সমস্ত স্বরধ্বনিই অতিদীর্ঘ হতে পারে। উদাহরণ–
/মা/ ---------'মা:', /বাজু/ -------------'বাতাবহ', /ভাবো/ ----------'ভাতাবহী'
ইত্যাদি। তাছাড়া টেনে টেনে বললেও অনেক সময় একমাত্রার হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বরে পরিণত হয়।
যেমন– মা----------না 'অনেক', অনে------------ক 'অনেক' ইত্যাদি।

এই উপভাষায় একাক্ষর শব্দের আদিস্থিত স্বরের অব্যবহিত পরে যদি কোনো ঘোষধ্বনি থাকে তাহলে সেই স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। যেমন – আব্ 'অর্বুদ', আগ্ 'রাগ' ইত্যাদি। কিন্তু একাক্ষর শব্দে স্বরধ্বনির পরে অঘোষধ্বনি থাকলে সেই স্বরের উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। যেমন আট্– আট্ 'আট', আচ্ 'আঁচ', আখ্ 'আখ', আন্ 'আন' ইত্যাদি। শব্দ দুই অক্ষরবিশিষ্ট হলে প্রথম অক্ষরের স্বরধ্বনি অপেক্ষা দ্বিতীয় অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। যেমন – আজি 'আজ', কালি 'কাল', ইত্যাদি। আবার দুই এর অধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ হলে তার সর্বশেষ অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণ তার পূর্ববর্তী অক্ষরগুলির স্বরধ্বনির তুলনায় দীর্ঘ হয়। যেমন – আজিকার 'আজকের', কালিকার 'কালকের' মাতামাতি 'মাতামাতি' ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে একাক্ষর শব্দে ঘোষধ্বনির পূর্বে অবস্থিত স্বর সাধারণভাবে দুই মাত্রার। কিন্তু দুই অক্ষরসম্পন্ন শব্দের সর্বশেষ অক্ষরের স্বর ঘোষধ্বনির পূর্বে থাকলেও দুই মাত্রার হয় না। এর উচ্চারণ হয় একমাত্রার মতই, অথবা একমাত্রার চেয়ে সামান্য দীর্ঘ। যেমন– আব্ এই শব্দটির /আ/ দুই মাত্রার। কিন্তু আবাদ্ এই শব্দটির দ্বিতীয় বা শেষ অক্ষর বাদ্–এর স্বরধ্বনি /আ/ দুই মাত্রার নয়।

ঝোঁক এবং আবেগের তারতম্যের উপরেও অনেক সময় স্বরের হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব নির্ভর করে। যেমন– উয়ায় শব্দটির অর্থ সাধারণ অবস্থায় 'সে'। এক্ষেত্রে শব্দের আদিস্থিত স্বর /উ/ –এর উচ্চারণ হ্রস্ব। স্বরটি এই অবস্থায় এক মাত্রার। কিন্তু সে–ই এই অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করলে আদিস্থিত স্বর /উ/–এর উপরে বিশেষ ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করার ফলে এই হ্রস্ব /উ/ দীর্ঘ /উ/–তে পরিণত হবে এবং তার উচ্চারণ হবে দুই মাত্রার।

সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় শব্দের অর্থ স্বরের হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বের উপরে নির্ভরশীল নয়। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বরের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা শব্দের অর্থভেদ ঘটায়। যেমন–সাধারণ উচ্চারণে

কি শব্দটি প্রশ্নসূচক অব্যয়। কিন্তু এরই দীর্ঘ উচ্চারণসম্পন্ন কী শব্দটি প্রশ্নসূচক সর্বনাম। জা শব্দটি এই উপভাষায় অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশ করে। এর অর্থ হ'ল কাউকে যেতে বা বলা। কিন্তু এই শব্দটির দুই মাত্রাসম্পন্ন উচ্চারণে অনুজ্ঞার ভাবটি বজায় থাকলেও উদ্দিষ্ট ক্রিয়াটি বদলে যায়। এক্ষেত্রে জা বললে যা করা হচ্ছিল তা থামাতে বলা হয়। আবার এই জা শব্দটিরই অতিদীর্ঘ উচ্চারণ জা------আ, যাওয়ার জন্য আদেশ বা অনুজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে বক্তার ক্রোধ বা অসহিষ্ণুতাকেও কিছুটা আভাষিত করে।

স্বাভাবিক উচ্চারণে প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনিই স্বরধ্বনি সহযোগে একমাত্রিক। কিন্তু কখনো কখনো গুরুত্ব প্রদান বা আবেগের আতিশয্য প্রকাশের জন্য ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব ঘটে বা তার উচ্চারণ প্রলম্বিত হয়। যেমন সগায় শব্দটির অর্থ সকলে। কিন্তু বিশেষ জোর দিয়ে বললে এই শব্দটির উচ্চারণ হবে সগ্গায়। আবার একই রকম জোর বা গুরুত্ব দিয়ে উচ্চারণ করলে এর উচ্চারণ হতে পারে সগা-আ-য়। এই জাতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব বা প্রলম্বিত উচ্চারণ এই উপভাষায় প্রচুর। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

স্বাভাবিক উচ্চারণ		গুরুত্ব বা ঝোঁক জনিত দ্বিত্ব	প্রলম্বিত উচ্চারণ
ম্যালা	'অনেক'	ম্যাল্লা	ম্যা----লা
ঝ্যাটৈলে	'টান দিয়ে'	ঝ্যাট্টৈলে	ঝ্যা--টৈ--লে
সগুল্	'সমস্ত'	সগ্গুল্	সগু--উ--ল
সগায়	'সকলে'	সগ্গায়	সগা--আ---য়
আছেরে	'আছড়িয়ে'	আচ্ছেরে	আছেরে-----এ
ঢুকি	'ঢুকিয়ে'	ঢুক্কি	ঢুকি--------ই
ঝাপি	'ঝাপিয়ে'	ঝাপ্পি	ঝাপি-------ই
পাকে	'পাকিয়ে'	পাক্কে	পাকে-------এ ইত্যাদি।

(২) শ্বাসাঘাত, বল বা প্রস্বন :

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সাধারণতঃ বাক্য এবং পদের গোড়াতেই শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন - 'আজি মুই তোমার্ বাড়ি জাইম্, 'আজ আমি তোমাদের বাড়িতে যাব'। কিন্তু বক্তার বিবক্ষায় গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বাক্যের যে কোনো অংশে শ্বাসাঘাত পড়তে পারে। পূর্বোদ্ধৃত বাক্যটিকে ব্যবহার করে এই বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে।

আজি মুই তোমার্ বাড়ি জাইম্, এই বাক্যটির কর্তার উপর গুরুত্ব দিলে, অর্থাৎ মুই বা আমিই যাব, অন্য কেউ নয়, এই ভাব প্রকাশ করতে চাইলে শ্বাসাঘাত পড়বে বাক্যের দ্বিতীয় শব্দ মুই-এর উপর। যেমন- আজি 'মুই তোমার্ বাড়ি জাইম্, 'আজ আমি তোমাদের বাড়িতে যাব'। আবার বাক্যের সৌন্দর্য

বাড়ি পদটির উপরে গুরুত্ব দিয়ে তোমাদের অন্য কোথাও নয়, বাড়িতেই যাব, এই ভাব প্রকাশ করতে চাইলে বাড়ি শব্দটির উপরে শ্বাসাঘাত পড়বে। যেমন-তুই আজি তোমার 'বাড়ি আইম ! আজ আমি তোমাদের 'বাড়িতে যাব '।অনুরূপভাবে তোমার শব্দটির উপর গুরুত্ব দিয়ে অন্য কারও নয়, তোমাদেরই বাড়িতে যাব, এই ভাব প্রকাশ করতে চাইলে শ্বাসাঘাত পড়বে তোমার শব্দটির উপর।যেমন -আজি তুই 'তোমার্ বাড়ি আইম্, 'আজ আমি 'তোমদের বাড়িতে যাব'। আবার আইম্,, এই ক্রিয়াপদটির উপরে জোর দিয়ে, যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তার ভাব প্রকাশ করতে চাইলে আইম্ শব্দটির উপরে শ্বাসাঘাত দিতে হবে। যেমন - আজি তুই তোমার বাড়ি 'আইম্, 'আজ আমি তোমাদের বাড়িতে 'যাব' ।

এই উপভাষায় শব্দের ক্ষেত্রে শ্বাসাঘাতের স্থান হ'ল শব্দের আদিতে। যেমন -'ভাত্ 'ভাত', 'কাপোর্ 'কাপড়', 'নদি 'নদী' ইত্যাদি। তবে শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে স্বাভাবিক অবস্থায়। কিন্তু শব্দে বক্তার বিবক্ষার গুরুত্ব বা প্রশ্ন আরোপিত হলে শ্বাসাঘাত পড়ে শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে। যেমন - কা'পোর্ (কাপড়ই অথবা কাপড় ? অর্থে), ন'দি (নদীই অথবা নদী ? অর্থে) ।উপসর্গযুক্ত শব্দ হলে উপসর্গটুকু বাদ দিয়ে পদের মূল অংশের প্রারম্ভে শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন - হা'ভাতিয়া 'হাভাতে', বে'আক্কেল্ 'কাণ্ডজ্ঞানহীন, নির্বুদ্ধি', নি'লাজ্ 'নির্লজ্জ', নি'দাবুন্ 'নিদারুন' ইত্যাদি।

সমাসবদ্ধ পদে প্রথম পদটির প্রথম অক্ষরের গোড়ায় মুখ্য শ্বাসাঘাত এবং উত্তরপদটির প্রথম অক্ষরের গোড়ায় গৌণ শ্বাসাঘাত পড়ে। উদাহরণ -'আইল্'ভাত 'আলভাত', 'বাতি'জাভাই 'বাতি জামাই', 'ঘর্'পোরা 'ঘরপোড়া', 'ধান্'চুরা 'ধান থেকে প্রস্তুত চিঁড়ে' ইত্যাদি।

কোনো শব্দের একটি অক্ষরে শ্বাসাঘাত দেওয়ার ফলে অন্য অক্ষরের স্বরধ্বনি অনেক সময় দুর্বল বা হ্রস্ব হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণ-

গামোছা 'গামছা 'গামছা'

মশলা 'মশ্লা 'মশলা' ইত্যাদি। আবার শ্বাসাঘাতের

ফলে অনেক সময় সেই অক্ষরের স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়ে যায় এবং ব্যঞ্জনধ্বনি হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার দ্বিত্ব ঘটে। উদাহরণ-

ম্যালা 'ম্যা--লা 'অনেক'

দুর্ 'দু---র 'দূর'

ম্যালা 'ম্যাল্লা 'প্রচুর' ইত্যাদি ।

বাক্যের সুরতরঙ্গ

(১) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বর্ণনামূলক বাক্যে সুর উঁচু থেকে নীচে নেমে আসে।অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্যের সুর এক্ষেত্রে অবরোহিত। উদাহরণ- মুই আজি তোমার বাড়ি যাইম, 'আমি আজ তোমাদের বাড়িতে যাব'।বর্ণনামূলক এই বাক্যটিতে সুর উঁচু থেকে ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে আসবে। তবে বাক্যের বিশেষ বিশেষ অংশের উপর জোর দিয়ে,কোনো বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করলে বাক্যের এই ক্রমাবরোহী সুর বজায় থাকে না। এক্ষেত্রে যে অংশটির উপরে গুরুত্ব দেওয়া হবে সেই অংশটিতে বাক্যের সুরতরঙ্গ উঁচুতে উঠে যাবে।যেমন -পূর্বোক্ত বাক্যটির'তোমার' শব্দটিতে জোর দিয়ে যদি বোঝানো হয় যে অন্য কারও বাড়িতে নয়,তোমাদের বাড়িতেই যাব, তাহলে এই অংশে সুরতরঙ্গ উঁচুতে উঠে পরের অংশগুলিতে আবার নীচে নেমে যাবে।আবার 'বাড়ি'শব্দটিতে জোর দিয়ে যদি বোঝানো হয় যে তোমাদের অন্য কোথাও নয়,বাড়িতেই যাব, তাহলে 'বাড়ি'শব্দটিতে সুরতরঙ্গ ঊর্দ্ধমুখী হবে। অনুরূপভাবে 'যাইম' শব্দটির উপরে জোর দিয়ে যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা বোঝানো হলে সুরতরঙ্গ 'যাইম' শব্দটিতে উঁচুতে উঠবে।

(২) অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে বা আদেশসূচক বাক্যে সর্বনাম পদটি যেখানে থাকে বাক্যের সুরতরঙ্গ সেখানে উঁচুতে ওঠে এবং তারপরেই আবার নীচুতে নেমে যায়।যেমন - তুই বাড়ি যা 'তুমি বাড়িতে যাও'। এই বাক্যটিতে'তুই' শব্দটি বাক্যের গোড়াতেই আছে বলে এই বাক্যটির সুর হবে ক্রমাবরোহী। কিন্তু তুই' শব্দটি স্থান পরিবর্তন করে বাক্যের শেষে চলে যাওয়াতে বাক্যের গঠন যদি এই রকম হয় যে- বাড়ি যা তুই 'বাড়িতে যাও তুমি', তাহলে বাক্যটির সুর প্রথমদিকে ক্রমাবরোহী হলেও শেষ অংশে, যেখানে 'তুই', এই সর্বনামপদটি রয়েছে সেখানে উঁচুতে উঠে যাবে।

(৩) সাধারণভাবে বর্ণনামূলক বাক্যের সুরতরঙ্গ ক্রমাবরোহী হলেও কর্ম এবং করণযুক্ত বাক্যে,কর্ম এবং করণের স্থানে সুরতরঙ্গ কিছুটা উঁচুতে ওঠে। যেমন-মুই ভাত্ খাম্, 'আমি ভাত খাই', এই বাক্য-টিতে কর্ম 'ভাত'-এর স্থানে সুরতরঙ্গ কিছুটা ঊর্দ্ধমুখী হবে।

(৪) প্রশ্নসূচক বাক্যে প্রশ্নসূচক অব্যয়টি যেখানে থাকে বাক্যের সুরতরঙ্গ সেখানে উঁচুতে ওঠে এবং সেই বাক্যের শেষে ক্রিয়া থাকলে সুরতরঙ্গ সেখানে নীচে নেমে আসে। যেমন - তুই কুত্তি যাবু 'তুমি কোথায় যাবে' ,এই বাক্যটিতে প্রশ্নসূচক অব্যয় 'কুত্তি'-এর স্থানে বাক্যের সুর কিছুটা উঁচুতে উঠবে এবং বাক্যের শেষে,যেখানে ক্রিয়াপদ 'যাবু' রয়েছে সেখানে নিম্নমুখী হবে।

(৫) প্রশ্নসূচক বাক্য,অথচ যেখানে প্রশ্নসূচক অব্যয়টি অনুপস্থিত, এমন ধরনের বাক্যের সুরতরঙ্গ হয় ক্রমারোহী। যেমন -মুই আজি যাইম,?'আমি আজ যাব ?' এই বাক্যটির সুরতরঙ্গ হবে ক্রমারোহী।

(৬) বিস্ময়সূচক বাক্যের সুর স্বাধীন স্বচ্ছন্দ। অর্থাৎ এই জাতীয় বাক্যে সুর ক্রমারোহী বা ক্রমাবরোহী, কোনোটাই নয়। এক্ষেত্রে সুরের ওঠা নামা অনেকটাই স্বাধীন। যেমন - কি তাড়াটায় না তাড়াইছে 'কি তাড়াটাই না তাড়িয়েছে', এই বাক্যটিতে বাক্যের প্রথম পদ 'কি'-তে সুরতরঙ্গ সর্বাপেক্ষা উঁচু, দ্বিতীয় পদের শেষ অক্ষর 'টায়'-তে সর্বাপেক্ষা নীচু, এর পরের পদ 'না'-তে অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং শেষ পদ 'তাড়াইছে'-তে না অবরোহী, না আরোহী।

(৭) অসমাপ্ত বক্তব্যবাহী বাক্যের সুরতরঙ্গ অনেকটাই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ। তবে এই জাতীয় বাক্যে সাধারণতঃ বাক্যের শেষে সুরতরঙ্গ উঁচুতে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ - তুই তো ভালে করলু, কিন্তুক মুই-- 'তুমি তো ভালোই করলে, কিন্তু আমি---'; এই বাক্যটিকে নেওয়া যেতে পারে। এই বাক্যটিতে সুরতরঙ্গ প্রথম পদ 'তুই'-তে উঁচু, দ্বিতীয় পদ 'তো'-তে অপেক্ষাকৃত নীচু, পরবর্তী পদ 'ভালে'-তে আবার উঁচু, এর পরের পদ 'করলু'-তে সবচাইতে নীচু, শেষ পদের আগের পদ 'কিন্তুক'-এ আবার উঁচু এবং শেষ পদ 'মুই'-তে সবচাইতে উঁচু।

পদের সুরতরঙ্গ

সাধারণভাবে বাক্যবিযুক্ত পদের কোনো স্বতন্ত্র সুর উত্তরবঙ্গের উপভাষায় নেই। তবে বাক্য থেকে বিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যে সমস্ত পদ বাক্যের কাজ করে সেগুলির বেশ কয়েকটিতে সুরের ওঠা নামা লক্ষ্য করা যায়। যেমন বিবৃতি মূলক ভাব প্রকাশে 'আইম', 'যাব'-এই শব্দটির সুর ক্রমাবরোহী। কিন্তু এই শব্দটিতে প্রশ্নের ভাব আরোপিত হলে এর উচ্চারণে সুরতরঙ্গ হবে ক্রমারোহী। নোহায় 'নয়'-এর সুরতরঙ্গ ক্রমাবরোহী। কিন্তু এই শব্দটিতে প্রশ্নের ভাব আরোপ করা হলে, এর সুরতরঙ্গ হবে ক্রমারোহী। আবার নোহায় শব্দটি যখন 'না, ঠিক তা নয়, কিন্তু---' এই অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন তার সুরতরঙ্গ প্রথমে অবরোহী, কিন্তু শেষে আরোহী। হ্যা 'হ্যা' শব্দটি সমর্থনসূচক হলে এর সুরতরঙ্গ অবরোহী। কিন্তু প্রশ্নসূচক হলে এই শব্দেরই সুরতরঙ্গ দ্রুত আরোহী। তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করতে হলে এর সুরতরঙ্গ হবে দ্রুত অবরোহী। আবার হ্যা শব্দটি একই সঙ্গে সমর্থন এবং দ্বিধার দ্যোতক হলে এর সুরতরঙ্গ প্রথমে অবরোহী এবং শেষে আরোহী।

ধ্বনির বিবর্তন

একক অন্ত্যস্বর ধ্বনি

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্বর ধ্বনি মধ্যভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তর পর্যন্ত বজায় ছিল। কিন্তু শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাতের ফলে নব্য ভারতীয় আর্য স্তরে বাংলা এবং তার উপভাষাগুলিতে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তর থেকে নব্য ভারতীয় স্তর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষায় অন্ত্যস্বরের বিবর্তনের ধারাটি নিম্নরূপ ঃ

প্রাচীনভারতীয় আর্য -অ > মধ্যভারতীয় আর্য -অ > নব্যভারতীয় আর্য (উত্তরবঙ্গের উপভাষা ∅ (শূন্য)

উদাহরণ –	প্রাচীনভারতীয় আর্য	নব্যভারতীয় আর্য (উত্তরবঙ্গের উপভাষা)	
	অন্ধকার >	আন্ধার্	'অন্ধকার'
	ইন্দুর >	এন্দুর্	'ইঁদুর'
	কুদ্দাল >	কোদাল্	'কোদাল'
	কদম্ব >	কদোম্	'কদম'
	কুম্ভকার >	কুমার্	'কুমোর'
	গো-উর্বর > গোর্বর >	গোবোর্	'গোবর'
	বিল্ব >	ব্যাল্	'বেল'
	বেত্র >	ব্যাত্	'বেত'
	পঙ্ক >	প্যাক্	'কাদা'
	যুদ্ধ >	জুদ্ (F. V. জুদ্)	'যুদ্ধ'
	পত্র >	পাত্	'পাতা'
	হস্ত >	হাত্	'হাত'
	কর্ণ >	কান্	'কান' ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্বর -অ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় -ও -তে রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে ধ্বনিপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৎসম শব্দ এই উপভাষায় অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ –

গন্ধ >	গোন্ধো	'গন্ধ'
বধ >	বধো	'বধ'
অংশ >	অংশো	'অংশ'

প্রাচীনভারতীয় আর্য	মধ্যভারতীয় আর্য	নব্যভারতীয় আর্য (উত্তরবঙ্গের উপভাষা)	
নলিকা>	নলিআ>	নলি	'নল'
স্থালিকা>	থালিআ>	থালি	'থালা'
কলিকা>	কলিআ>	কলি	'কলি'
গোলিকা>	গোলিআ>	গোলি>গুলি	'গোলাকার বস্তু'
ঢোলিকা>	ঢোলিআ>	ঢোলি>ঢুলি	'বড় আকারের বাঁশের ঝুড়ি'
বটিকা>	বড়িআ>	বড়ি	'বড়ি'
বাটিকা>	বাড়িআ>	বাড়ি	'বাড়ি'
মক্ষিকা>	মচ্ছিআ>	মাছি	'মাছি' ইত্যাদি।

কিছু কিছু শব্দে প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্বর -ই উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বিলুপ্ত হয়েছে। উদাহরণ-

প্রাচীন ভারতীয় আর্য	নব্যভারতীয় আর্য (উত্তরবঙ্গের উপভাষা)	
তরবারি>	তরোয়ার্	'তরবারি'
গর্ভিণী>	গাভিন্	'গর্ভিণী'
রাত্রি>	রাতি>রাইত্	'রাত'
গ্রন্থি>	গাণ্ঠি>গাইট্	'গাঁট'
অঞ্জলি>	আনজুল্	'অঞ্জলি' ইত্যাদি।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ত্যস্বর -ই উত্তরবঙ্গের উপভাষায় রক্ষিত। উদাহরণ-

জাতি>	জাতি	'জাতি'
তিন্তিড়ি>	তেতুলি	'তেঁতুল'
পত্তিক>	পাটি	'পাড়ি বা বীজতলা'
ভগিনী>	বইনি	'বোন'
রশ্মি>	রশি	'দড়ি'
রাশি>	রাশি	'জ্যোতিষ গণনার পরিভাষা' ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্বর স -ই এবং -ঈ, উভয়ই উত্তরবঙ্গের উপভাষায় -ই -তে রূপান্তরিত হয় এবং তার অব্যবহিত পূর্বের ব্যঞ্জনধ্বনি বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণ-

গাভী>	গাই	' গাই'

প্রাচীন ভারতীয় আর্য   নব্যভারতীয় আর্য (উত্তরবঙ্গের উপভাষা)

দ্যুতি >   জুই   'আগুন'

বাতি >   বাই   'বাতি'

তুমি >   তুই   'তুমি'   ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্বর হ্রস্ব-উ এবং দীর্ঘ -ঊ নব্যভারতীয় আর্যস্তরের শেষ ভাগে স্বরধ্বনির উচ্চারণে হ্রস্বত্ব এবং দীর্ঘত্বের ভেদ লুপ্ত হওয়ার ফলে -উ -তে পরিণত হয়। এই -উ অন্ত্যস্বর হিসেবে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বজায় থাকে। উদাহরণ-

চক্ষু >   চখু   'চোখ'

পশু >   পশু   'পশু'

বধূ >   বউ   'পুত্রবধূ বা স্ত্রী'   ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্বর -আয়, -আব, -অক উত্তরবঙ্গের উপভাষায়-আ, -আও এবং -আঁউ -তে রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণ-

উপাধ্যায় >   ওঝা   'ওঝা'

বরাহ >   বরা   'শুকর'

বিবাহ >   বিয়াও   'বিবাহ'

ঘোটক >   ঘোরা   'ঘোড়া'

গাত্র >   গাও   'শরীর'

পাদ >   পাও   'পা'

ঘাত >   ঘাও   'ঘা'

তাপ >   তাও   'তাপ বা উষ্ণতা'

বাত >   বাও   'বাতাস'   ইত্যাদি।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্বর ই -ইঅ এবং -ইআ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় -ই তে রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণ-

প্রাচীনভারতীয় আর্য	মধ্যভারতীয় আর্য	নব্যভারতীয় আর্য (উত্তরবঙ্গের উপভাষা)	
কৃত >	করিঅ > করিআ >	করি	'ক'রে'
ধৃত >	ধরিঅ > ধরিআ >	ধরি	'ধ'রে'
নবনীত >	নবণীঅ > নঅণিআ >	ননি	'ননী' ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্বর -ঊ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় -উ -তে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ

প্রাচীন ভারতীয় আর্য   নব্যভারতীয় আর্য (উত্তরবঙ্গের উপভাষা)

গোল্লুপ>   গোল্লু   'গোল্লু'   ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্বর -উ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বজায় থাকে। উদাহরণ-

শত্রু>   শত্তুরু   'শত্রু'

দদ্রু>   দাদু   'দাদ'   ইত্যাদি

প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্বর -এর উত্তরবঙ্গের উপভাষায় -অ্যাও -তে রূপান্তরিত। উদাহরণ-

ক্ষেপ>   খ্যাপাও   'বার, সময়'

ছেদ>   ছ্যাও   'কাটা, কাটা অংশ'

দেব>   দ্যাও   'দেবতা'   ইত্যাদি।

একক আদ্য অ-এর স্বরধ্বনি

প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার শব্দের আদিস্থিত অ-এর পরে একক ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে সেই অ- উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বজায় থাকে। উদাহরণ-

পদাকার>   পয়ার   'পয়ার, ছন্দোবিশেষ'

কলস>   কলোস   'কলসী'

করপত্র>   করোট   'করাত'

কটাহ>   করাই, করেয়া   'কড়াই'

চপেট>   চর   'চড়'   ইত্যাদি।

কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ-এর পরে একক ব্যঞ্জন থাকলেও সেই অ- আ- হয়ে যায়। উদাহরণ -

অবস্থা>   আবোস্থা   'অবস্থা'

অলক্তক>   আলতা   'আলতা'

অর্গাতি>   আখি   'আখি'

অপর>   আর   'আর'   ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের আদিস্থিত অ-এর পরে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সেই যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হয়ে একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয় এবং ক্ষতিপূরণমূলক দীর্ঘীভবনের ফলে অ- আ-তে রূপান্তরিত হয়। অ-এর পরে আনুনাসিক ব্যঞ্জন সংযোগে সৃষ্ট যুক্ত-ব্যঞ্জন থাকলে অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিটি পরিত্যক্ত হয়ে একমাত্র নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটিই বজায় থাকে। উদাহরণ-

প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার আদ্যস্বর আ- একক ব্যঞ্জনের আগে থাকলে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তা বজায় থাকে। উদাহরণ-

প্রাচীনভারতীয় আর্য	নব্যভারতীয় আর্য<উত্তরবঙ্গের উপভাষা>	
আকাশ >	আকাশ্	'আকাশ'
কাণ>	কানা	'কানা'
কায়স্থ>	কায়েত্	'কায়স্থ'
তাম্রক>	তাওয়া	'তাওয়া' ইত্যাদি।

প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী আদ্যস্বর আ- এই স্তরের শেষ পর্যায়ে অ-তে রূপান্তরিত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তা আবার আ-তে রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণ-

তাম্র >তম্বা>	তাম্বা	'তামা'
ব্যাখ্যান >বক্খান>	বাখান্	'কাহিনি'
কাংস্য >কংস>	কাঁসা	'কাঁসা'
আর্দ্রক >অদ্দক>	আদা	'আদা' ইত্যাদি।

প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার একক বা যুক্তব্যঞ্জনের পূর্বে অবস্থিত আদ্যস্বর ই- এবং ঈ- উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ই- তে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ-

ইন্দ্রাগারক	ইন্দিরা	'ইদারা'
শীত>	শিত্	'শান'
ভিক্ষা>	ভিখা	'ভিখ'
দ্বীপ>	ডিয়া	'টিপি'
দীর্ঘল>	দিঘোল্	'দীর্ঘ'
নিম্ব>	নিম্	'নিম'
গ্রীবা>	গিলাই	'গ্রীবা' ইত্যাদি।

প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী আদ্যস্বর ই- এবং ঈ- অনেক সময় এই উপভাষায় এ -তে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ-

ইন্দুর>	এন্দুর	'ইঁদুর'
সিন্দুর>	সেন্দুর	'সিঁদুর'
তিন্তিড়িক>	তেতিলি	'তেঁতুল'
বিল্ব>	বেল্/ব্যাল্	'বেল'
হিক্কা>	হেচকি	'হেঁচকি'

প্রাচীনভারতীয় আর্য	নব্যভারতীয় আর্য (উত্তরবঙ্গের উপভাষা)	
বেত্র>	ব্যাত্	'বেত'
তেজস্>	ত্যাজ্	'তেজ'
ব্রেংখা>	দ্যাখোন্	'দেখন'
ছত্র>	ছ্যাত্রা	'ছেত্রা'
শ্বেত>	শ্যাতা	'শাদা'
একক>	অ্যাকলা	'একলা' ইত্যাদি।

প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার শব্দের আদিস্থিত যুক্তস্বর ঐ-, অই- উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যা-তে রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণ-

তৈল>	ত্যাল্	'তেল'
জ্যৈষ্ঠ>	জ্যাট্	'জৈষ্ঠ' ইত্যাদি।

প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার আদ্য অক্ষরস্থিত ঔ যুক্তস্বর উত্তরবঙ্গের উপভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে একক স্বর ও-তে রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণ-

কৌপীন>	কোপিন্	'কৌপিন'
সৌবর্ণ>	সোনা	'সোনা'
গৌরক>	গোরা	'ফর্সা' ইত্যাদি।

প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষায় কিছু আদ্যস্বর মধ্যভারতীয় আর্য স্তরে লুপ্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও আদ্যস্বরের বিলোপের কিছু নমুনা পাওয়া গিয়েছে। উদাহরণ-

অতসী>	তিসি	'তিসি'
উপবিশতি >বইসই>	বইসে	'বসে' ইত্যাদি।

শব্দমধ্যস্থ স্বরলুপ্তি

ব্যঞ্জন ব্যবহিত একক মধ্যস্বর : শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাতের ফলে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তৎসম, তদ্ভব এবং দেশী, এই ত্রিবিধ শব্দেরই মধ্যস্বর অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে লুপ্ত হয়েছে। এর ফলে তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে এবং বহু অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ অনেক ক্ষেত্রে তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ-

-অ- লুপ্ত	কর্কটক>	কাকড়া	'কাঁকড়া'
	নিখনিক>	ন্যাক্রাই	'নেংটি ইঁদুর'
	কুক্কুরিকা>	কুকুরি	'কুকুর'
	মর্কটক>	মাকড়া	'মাকড়সা'

শব্দমধ্যস্থ হ্রস্ব -উ- এবং দীর্ঘ -ঊ- অনেক সময় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় -উ- হিসেবে বজায় থাকে। উদাহরণ -

প্রাচীনভারতীয় আর্য	নব্যভারতীয় আর্য(উত্তরবঙ্গের উপভাষা)	
কুক্কুর>	কুকুর্	'কুকুর'
শম্বুক>	শামুক্	'শামুক'
তাম্রকূট>	তামুক্	'তামাক' ইত্যাদি।

সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি

মধ্যভারতীয় আর্য স্তরে প্রাচীনভারতীয় আর্য স্তরের বহু শব্দের মধ্যবর্তী দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হওয়ার ফলে পাশাপাশি অবস্থানকারী কিছু উদ্বৃত্ত স্বরের সৃষ্টি হয়। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনিগুলির ত্রিবিধ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। (১) দুই স্বরের মধ্যে /য়/শ্রুতি বা /ব/শ্রুতির উদ্ভব, (২) দুইটি স্বরধ্বনিতে মিলে একটি দ্বিস্বরধ্বনিতে রূপান্তর এবং(৩) উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনি দুটির মধ্যে একটির বিলোপ বা সন্ধি। উদাহরণ-

দ্বিস্বরীভবন

(-অ ইঅ>-ঐ-)	পদস্থান>	পৈতান্	'খাটের পায়ের দিক'
	মহিষক>	মৈষা	'মহিষ বা মহিষ সংক্রান্ত'
	উপবিশতি>	বৈসে	'বসে' ইত্যাদি।
(-অ উ->-ঔ-)	চতুষ্ক>	চৌকা	'উনুন'
	শকুল>	শৌল্	'শোল মাছ'
	বকুল>	বৌল্	'বকুল'
	চতুর্থক>	চৌঠা	'চৌঠা' ইত্যাদি

উদ্বৃত্ত স্বরের লোপের মাধ্যমে এক স্বরে পরিণতি

(-অঅ->-অ-)	কদলক>	কলা	'কলা'
	কপর্দিকা>	কড়ি	'কড়ি'
	নবগুণ>	নগুন্	'দৈতা'
	অপবর্জন>	অপন্	'অপন' ইত্যাদি।
(-অঅ->-ও-)	বাসগৃহ>	বাসোর্	'বাসর'
	হীনাবস্থা>	হেনোস্থা	'হীন অবস্থা' ইত্যাদি।
(-অঅ->-আ-)	গর্দভক>	গাধা	'গাধা'
	অপর>	আর্	'আর'

ধ্বনি পরিবর্তন

প্রধানতঃ তিনটি পদ্ধতিতে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। এই পদ্ধতিগুলি হ'ল
(১) ধ্বনি আগম (২) ধ্বনি রূপান্তর (৩) ধ্বনি বিলোপ

ধ্বনি আগম ঃ

(১) শ্রুতি ঃ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় শব্দের মধ্যে /য়/, /ব/ এবং দুই সীমিত সংখ্যক শব্দে /ই/ শ্রুতি ধ্বনির আগমন ঘটে। উদাহরণ-

/য়/ শ্রুতি শৃগাল > শিআল > শিয়াল্ 'শিয়াল'
টীপক > টিঅঅ > টিয়া 'টিপি' ইত্যাদি।
/ব/ শ্রুতি তাপক > তাঅঅ > তাওয়া 'তাওয়া'
খা+আ > খাআ > খাওয়া 'খাওয়া' ইত্যাদি।
/ই/ শ্রুতি দিয়া > 'দিয়ে'
নিয়া > 'নিয়ে' ইত্যাদি।

(২) আদিস্বরাগম ঃ শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণকে বিশ্লিষ্ট করে উচ্চারণকে সহজ করে নেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বহুল পরিমাণে স্বরাগম ঘটে থাকে। উদাহরণ-

স্বর্গ > আস্‌সুরগ্গা 'স্বর্গ'
স্ত্রী > ইস্তিরি 'স্ত্রী'
স্নান > এস্নান্ 'স্নান'
স্থান > এস্থান্ 'স্থান'
(ইং) স্কুল > ইস্কুল্ 'স্কুল'
(ইং) স্টেশন > এস্টেশন্ 'স্টেশন' ইত্যাদি।

(৩) মধ্যস্বরাগম ঃ একটি স্বরধ্বনির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট যুক্তব্যঞ্জনের বিশ্লেষ ঘটিয়ে যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণকে সহজ করে নেওয়ার ফলে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচুর পরিমাণে মধ্যস্বরাগম ঘটে থাকে।
উদাহরণ-

(-ও- এর আগম) চক্র > চক্কোর্ 'চাকা'
স্বপ্ন > সপোন্ 'স্বপ্ন'
যত্ন > জতোন > জত্তোন্ 'যত্ন'
যন্ত্র > যন্তোর্ 'যন্ত্র'
মন্ত্র > মন্তোর্ 'মন্ত্র'
ধর্ম > ধরোম্ 'ধর্ম'

তুল্‌+আ=তোলা (উ-আ=ও←------আ) 'তোলা' ইত্যাদি।

মধ্যোচ্চ স্বর /এ/ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নস্বর /আ/ এবং মধ্যোচ্চ ও মধ্যনিম্ন স্বর/এ/, /ও/ এবং/অ/-এর প্রভাবে মধ্যনিম্ন স্বর /অ্যা/ -তে পরিণত হয়। উদাহরণ-

মেলা=ম্যালা (এ-আ=অ্যা←------আ) 'মেলা'

খেলা=খ্যালা (এ-আ=অ্যা←------আ) 'খেলা'

বেলা=ব্যালা (এ-আ=অ্যা←------আ) 'বেলা'

ঠেলা=ঠ্যালা (এ-আ=অ্যা←------আ) 'ঠেলা'

মেল্‌+ও=ম্যালো (এ-ও=অ্যা←-------আ) 'মেল'

দে+এ=দ্যায় (এ-এ=অ্যা←------অ্যা) 'দেয়' ইত্যাদি।

প্রগত স্বরসঙ্গতি

প্রগত স্বরসঙ্গতি উত্তরবঙ্গের উপভাষায় খুব কম পরিমাণে ঘটে। কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হ'ল। উদাহরণ-

সম্মুখ উচ্চস্বর/ই/-এর প্রভাবে /আ/-এর /এ/-তে রূপান্তর= বিলাত > বিলেত 'এলাকা'

উচ্চ পশ্চাৎ স্বর /উ/-এর প্রভাবে/আ/-এর /ও/-তে রূপান্তর=দুয়ার>দুয়োর্‌ 'দরজা'

উচ্চ স্বর /অ/-এর প্রভাবে /অ/-এর /ও/-তে রূপান্তর =মতন>মতোন্‌ 'মতন' ইত্যাদি।

(২) সমীভবন : উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রধানতঃ দু ধরণের সমীভবন হয়ে থাকে।

(ক) প্রগত সমীভবন (খ) পরাগত সমীভবন। দুই ধরণের সমীভবনের কিছু দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হ'ল। উদাহরণ-

প্রগত সমীভবন

আত্মা>আত্তা 'আত্মা'

পদ্ম>পদ্দো 'পদ্ম'

বাক্য>বাইক্কো 'বাক্য'

সামান্য>সামাইন্নো 'সামান্য'

রাজ্য>রাইজ্জো 'রাজ্য'

বক্তৃতা>বক্‌কিতা 'বক্তৃতা'

বাদ্য>বাইদ্দো 'বাদ্য' ইত্যাদি

পরাগত সমীভবন

ধর্ম>ধম্মো 'ধর্ম'

কর্ম>কম্মো 'কর্ম'

দেখা গিয়েছে যে এই উপভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে /র/-ই অন্যান্য ধ্বনির সঙ্গে সমীভূত হয়। উদাহরণ-

তর্ক>তক্কো 'তর্ক'

কর্জ >কজ্জো 'ধার'

নির্বন্ধ> নিবব্‌নধো 'নির্বন্ধ'

চাইর্‌নাথ>চাইন্‌নাথ্ 'চার নাথ'

মূর্খ >মুক্‌খো 'মূর্খ'

ঘরদুয়োর্>ঘদ্দুয়োর্ 'ঘর দুয়ার'

শুরশুরে >শুশ্শুরে 'বাধ্যতা সহকারে' ইত্যাদি।

স্বর সমীভবন

চাক্‌রি >চাকিরি 'চাকরি'

নিশ্চিন্ত >নিচ্‌চিন্‌তি 'নিশ্চিন্ত'

শিকোল্ >শিকিলি 'শেকল'

নাতুনি >নাতিনি 'নাতনি'

আজুলি >আজিলি 'যে জেনেও না জানার ভান করে'

দুধ>দুদু 'দুধ'

দোশরা >দোশোরা 'দ্বিতীয়'

ধুশরা >ধুশুরা 'ধানের চিটে' ইত্যাদি।

(৩) বিষমীভবন : উত্তরবঙ্গের উপভাষায় আদ্যব্যঞ্জন হিসেবে /ন/-এর ব্যবহার নেই বলে শিষ্ট বাংলায় যে সমস্ত শব্দের আদ্যব্যঞ্জন /ন/ সেই সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রে এই উপভাষায় বিষমীভবন ঘটে।। উদাহরণ-

নালা >লালা 'নালা'

নাল >লাল্ 'নাল'

নীলা >লিলা 'নীলা'

নালশা>লালোচ্ 'ডেও' ইত্যাদি।

অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধ্য ও অন্ত্যব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়েও এই উপভাষায় বিষমীভবন ঘটতে দেখা যায়। উদাহরণ-

জম্ম >জন্‌মো 'জন্ম'

স্নান > সিনান্ 'স্নান'

শরীর > শরিল্ 'শরীর'

আর্মারিও > আলমারি 'আলমারি'

জরুর > জরুল্ 'জরুরী' ইত্যাদি।

(৩) বিপর্যাস : উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বিপর্যাসের দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উদাহরণ–

আহ্লাদ > আলহাদ্ 'আহ্লাদ'

আহ্নিক > আনহিক 'আহ্নিক'

জ্যোৎস্না > জোনাক্ 'জ্যোৎস্না'

বারাণসী > বানারসি 'বারাণসী'

(তুর্কী) বুগচা > বোচকা 'বুঁচকি'

(ইং) বক্স > বাক্সো 'বাক্স'

মাৎস > মচোও্ 'মাৎস' ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনির বিপর্যাস

অস্থু > হাট্টুয়া 'হাঁটু'

বাঘ > ভাগ্ 'বাঘ'

গোবিন্ধা > ঘইলা 'বুড়ো'

গর্দভ > গাধা 'গাধা'

মহিষ > ভইস্ 'মোষ' ইত্যাদি।

আনুনাসিক ধ্বনির বিপর্যাস

আয়না > আঁহনা 'আয়না'

গোস্বামী > গোঁসাই 'গোস্বামী' ইত্যাদি।

(৪) ঘোষীভবন : ঘোষীভবনের দৃষ্টান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষায় খুব বেশী পাওয়া যায় না। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল। উদাহরণ–

কাক > কাগ্ > কাগা 'কাক'

সকল > সগল্ 'সকল'

শকুন > শেগুন্ 'শকুন' ইত্যাদি।

স্বতোমহাপ্রাণীভবন

শকড়া > ফড়িঙ্ 'ফড়িং'

লেকাই > ফ্যালায় 'ফেলে'

নির্বাপয়তি > নিভায় 'নেভায়'

ছেদা > ছ্যাদ্ 'ছিদ্র'

যখন > ঝ্যাখোন্ 'যখন'

জ্বালা > ঝ্যালা 'যখন'

যত > ঝতো 'যত'

যে > জে > ঝায় 'যে'

যেমন > ঝ্যামোন্ 'যেমন' ইত্যাদি।

(৮) অল্পপ্রাণীভবন : শব্দান্তে মহাপ্রাণধ্বনির উচ্চারণ হয় না বলে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় অনেক ক্ষেত্রেই অল্পপ্রাণীভবন ঘটে। এই উপভাষার বাচকগোষ্ঠীর শ্রমপ্রবর্তিত উচ্চারণ এই অল্পপ্রাণীভবনের আর একটি কারণ। উদাহরণ-

ব্যাঘ্র > বাঘ > বাগ্ 'বাঘ'

কথা > কতা 'কথা'

মধ্য > মাঝ > মাজ্ 'মধ্য'

মেঝে /মাজিয়া 'মেঝে'

অর্ধক > আধ্ > আদ্ 'অর্ধেক'

শৃঙ্খল > শিকোল্ 'শেকল'

ঢেঁপু > প্যাদো 'ঢেঁপু'

দুগ্ধ > দুদ্ > দুত্ 'দুধ' ইত্যাদি।

(৯) উষ্মীভবন : বঙ্গালী উপভাষায় উষ্মীভবন লক্ষ করার মত। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় উষ্মীভবন অত্যন্ত কম। সামান্য কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনি, যথা /ক/, /ত/ ইত্যাদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উষ্ম /খ়/ এবং /থ়/ হিসেবে উচ্চারিত হয়। কিন্তু এই দুটি ব্যঞ্জনের উষ্মীভূত উচ্চারণও বিশেষ বিশেষ ধ্বনি পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন- 'ভুত্' এই শব্দটিতে /ত/-এর উচ্চারণ উষ্ম নয়। কিন্তু 'পাথ়র' এই শব্দটিতে /ত/-এর উচ্চারণ উষ্ম। অনুরূপভাবে 'কাটা' এই শব্দটিতে /ক/-এর উচ্চারণ উষ্ম না হলেও 'পাখ়া' এই শব্দটিতে উষ্ম। সুতরাং বলা

(১১) মূর্ধন্যীভবন ঃ প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্য স্তরের [illegible] অনেক শব্দের দন্ত্যধ্বনি উত্তরবঙ্গের উপভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ

দক্ষিণ > ডাইন্	'ডান'
বিকৃত > বিকট	'বিকৃত'
তির্যক > ট্যারা	'তির্যক'
স্থাপিত > ঠাই	'স্থান'
চতুর্থক > চৌঠা	'চতুর্থ'
অস্থি > আঁটি	'আঠি' ইত্যাদি।

অমূর্ধন্যীভবন

দংশক > ডাশ্	'ডাঁশ'
দেউটি > ডেউটি	'দেউটি'
দাড়িম্ব > ডালিম্	'ডালিম'
দম্ভ > ডম্ফা	'দম্ভ'
দম্ভবৎ > ডম্ভবড়্	'গুমর'
তক্লি > টাকুরি	'তকলি'
দ্ব্যর্ধ > ড্যাড়্	'দেড়' ইত্যাদি।

(১২) তালব্যীভবন ঃ মূলতঃ সমীভবনের মাধ্যমেই প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্য স্তরের অনেক শব্দের দন্ত্যধ্বনি উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তালব্যধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণ-

সত্য > সচ্চ > সাচা	'সত্য'
মধ্য > মঝ > মাঝ	'মাঝ'
সন্ধ্যা > সাঁঝ > সাজ্	'সন্ধ্যা'
দ্যূত > জুয়া	'জুয়া খেলা'
দ্বিতীয় > দোজ	'দ্বিতীয়'
তৃতীয় > তেজ	'তৃতীয়'
মক্ষিকা > মাছি	'মাছি'
মহোৎসব > মোচ্ছব্	'মহোৎসব'
কুৎসা > কুচ্ছা	'কুৎসা'
উৎসর্গ > উচ্ছুগ্গো	'উৎসর্গ' ইত্যাদি।

(৪) মধ্যস্বরলোপের মাধ্যমে দ্বিমাত্রিকতা : মধ্যস্বর লুপ্ত হওয়ার ফলে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় অনেক ক্ষেত্রে তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে এবং তিনের অধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণ-

গামোছা > গামছা 'গামছা'

তামাশা > তামশা 'তামাশা'

মশলা > মশ্‌লা 'মশলা'

শিমুল > শিম্‌লা 'শিমুল'

হলুদ > হল্‌দি 'হলুদ'

আলাদা > আল্‌দা 'আলাদা' ইত্যাদি।

(৫) আদি ব্যঞ্জনলোপ : উত্তরবঙ্গের উপভাষায় /র/ আদিব্যঞ্জন হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং শিষ্ট বাংলার মতো সব রূপবিশিষ্ট শব্দ, যেখানে আদ্যব্যঞ্জন /র/ সেখানে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এক প্রকার অনিবার্যভাবেই আদিব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণ-

রঙ > অঙ্‌ 'রঙ'

রুগী > উগি 'রোগী'

রাতি > আতি 'রাত'

রস > অস্‌ 'রস'

রাখাল > আখোয়াল্‌ 'রাখাল' ইত্যাদি।

(৬) অনাদ্য ব্যঞ্জনলোপ : অনাদ্য অবস্থানেও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কোথাও কোথাও ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়েছে। উদাহরণ -

(-দ- লুপ্ত) (সং) নদী > নই 'নদী'

(-হ-লুপ্ত) (সং) কমাহার > কমার্‌ 'কামার'

নাহি > নাই 'নাই'

কহি > কই 'বলি' ইত্যাদি।

(৭) সমাক্ষরলোপ : উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সমাক্ষরলোপের দৃষ্টান্ত বেশী নেই। সামান্য সংখ্যক শব্দেই এই উপভাষায় সমাক্ষরলোপ ঘটে থাকে। উদাহরণ-

দাদা > দা 'দাদা', যেমন-বড়োদা 'বড়দা'

কাকা > কা 'কাকা', যেমন-ছোটোকা 'ছোটকাকা' ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়

রূপতত্ত্ব

শব্দগঠন

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় শব্দের গঠন এবং রূপান্তরের উপাদানগুলিকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ করা চলে। এই ভাগ দু'টি হ'ল (১) প্রত্যয় (২) বিভক্তি। প্রত্যয়গুলিকে প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে, (ক) কৃৎ প্রত্যয় এবং (খ) তদ্ধিত প্রত্যয়, এই দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে বিভক্তি-গুলিকেও, (ক) শব্দবিভক্তি এবং (খ) ক্রিয়া বিভক্তি, এই দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা চলে। বিভক্তির [illegible] আলোচনা কারক, বিভক্তি, বিশেষ্য, সর্বনাম এবং ক্রিয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এই অংশে কেবল দু'ধরণের প্রত্যয় সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

প্রত্যয় : কৃৎ

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কৃৎ প্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচী বিশেষ্য এবং বিশেষণপদ গঠন করে। নিম্নে এই উপভাষায় প্রচলিত প্রধান প্রধান কৃৎ প্রত্যয় সমূহের প্রয়োগরীতি উদাহরণ সহকারে বর্ণিত হ'ল।

(১) 'আ'- বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচী বিশেষ্যপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

কর্-আ=করা	'করা'	(√কর্-করা)
চল্-আ=চলা	'চলা'	(√চল্-চলা)
ঢাক্-আ=ঢাকা	'ঢাকা'	(√ঢাক্-ঢাকা)
ঢুক্-আ=ঢুকা	'ঢোকা'	(√ঢুক্-ঢোকা)
জা-আ=জাওয়া	'যাওয়া'	(√জা -যাওয়া)
খা-আ=খাওয়া	'খাওয়া'	(√খা -খাওয়া)
চা-আ=চাওয়া	'চাওয়া'	(√চা - চাওয়া)
থ-আ=থওয়া	'থাকা'	(√থ - থাকা)
ক-আ=কওয়া	'বলা'	(√ক - বলা)
ব-আ=বওয়া	'বহন করা'	(√ব -বহন করা) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে 'আ' যোগে গঠিত বিশেষ্যপদগুলি এই উপভাষায় বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- করা কাজ্ 'যে কাজটি করা হয়েছে', দ্যাখা মানষি 'যে মানুষটিকে দেখা হয়েছে', খাখা ভাত 'যে ভাত খাখা হয়েছে' ইত্যাদি।

(২) 'আই' – বিশেষ্য এবং ক্রিয়াবাচী বিশেষ্যপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ –

ঝাড়্-আই=ঝাড়াই 'ঝাড়ার কাজ' (√ঝাড়্-ঝাড়া)

মাড়্-আই=মাড়াই 'মাড়াইএর কাজ' (√মাড়্-মাড়াই করা)

বাছ্-আই=বাছাই 'বাছাইএর কাজ' (√বাছ্-বাছাই করা)

নড়্-আই=নড়াই 'লড়াই' (√নড়্-যুদ্ধ করা)

জাচ্-আই=জাচাই 'বিবেচনা' (√জাচ্-চিন্তা করা) ইত্যাদি।

(৩) 'আও' – বিশেষ্য ও বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ –

চড়্-আও=চড়াও 'আক্রমণোদ্যত' (√চড়্-আরোহণ করা)

পাকড়্-আও=পাকড়াও 'ধৃত' (√পাকড়্-ধরা)

উঠ্-আও=উঠাও 'স্থানচ্যুত' (√উঠ্-ওঠা)

চাল্-আও=চালাও 'প্রচুর' (√চাল্-চালা)

ঘির্-আও=ঘিরাও 'ঘেরাও' (√ঘির্-ঘেরা) ইত্যাদি।

(৪) 'আইত্' – বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ –

ন্যাব্-আইত্=ন্যাবাইত্ 'সেবাযুক্ত' (√ন্যাব্-সেবা করা)

গাপ্-আইত্=গাপাইত্ 'হরণকারী' (√গাপ্-গোপন করা) ইত্যাদি।

(৫) 'আন্' – বিশেষ্য ও বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ –

চাল্-আন্=চালান্ 'রপ্তানী' (√চাল্- চালা)

জান্-আন্=জানান্ 'বিজ্ঞপ্তি' (√জান্-জানা)

শুন্-আন্=শুনান্ 'শোনানোর যোগ্য' (√শুন্- শোনা)

ফির্-আন্=ফিরান্ 'ফেরার কাজ' (√ফির্- ফেরা) ইত্যাদি।

(৬) 'আনি' – বিশেষ্য ও বিশেষণপদ গঠনে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই প্রত্যয়টি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

মুছ্-আনি=মুছানি 'মোছার উপকরণ' (√মুছ্-মোছা)

ঘির্-আনি=ঘিরানি 'বেষ্টনী' (√ঘির্-ঘেরা)

ফির্-আনি=ফিরানি 'ফেরার প্রক্রিয়া' (√ফির্-ফেরা)

ঘুর্-আনি=ঘুরানি 'ঘূর্ণি' (√ঘুর্-ঘোরা)

পুড়্-আনি=পোড়ানি 'পোড়ার যন্ত্রণা' (√পুড়্-পোড়া)

উড়্-আনি=উড়ানি 'গায়ের কাপড়' (√উড়্-গায়ে দেওয়া) ইত্যাদি।

(৭) 'আইয়া' – বিশেষ্য ও বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

ধু–আইয়া=ধোয়াইয়া 'ধোয়ার লোক' (√ধু –ধোয়া)

দ্যাখ্–আইয়া=দ্যাখাইয়া 'দেখার লোক' (√দ্যাখ্–দেখা)

শুন্–আইয়া=শুনাইয়া 'শ্রোতা' (√শুন্– শোনা)

বুঝ্–আইলা=বুঝাইয়া 'জ্ঞানী' (√বুঝ্– বোঝা)

গন্–আইয়া=গনাইয়া 'গণৎকারী' (√গন্– গণনা করা) ইত্যাদি।

(৮) 'আরু' – বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

ডুব্–আরু=ডুবারু 'ডুবুরি' (√ডুব্–ডোবা)

জুঝ্–আরু=জুঝারু 'যোদ্ধা' (√জুঝ্– যুদ্ধ করা)

বুঝ্–আরু=বুঝারু 'বিবেকবান' (√বুঝ্–বোঝা) ইত্যাদি।

(৯) 'ইয়া' বিশেষ্য ও বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

খা–ইয়া=খাইয়া 'খাদক' (√খা – খাওয়া)

চা–ইয়া=চাইয়া 'প্রার্থী' (√চা–চাওয়া)

ব্যাচা–ইয়া=ব্যাচাইয়া 'বিক্রেতা' (√ব্যাচা–বিক্রয় করা)

চরা–ইয়া=চরাইয়া 'রাখাল' (√চরা–চড়ানো)

চাষা–ইয়া=চাষাইয়া 'কৃষক' (√চাষা–চাষ করা) ইত্যাদি।

(১০) 'ইল্' – বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

দ্যাখ্–ইল্=দেখিল্ 'দৃষ্ট বা দৃশ্যমান' (√দ্যাখ্– দেখা)

জাগ্–ইল্=জাগিল্ 'জাগ্রত' (√জাগ্–জাগা)

আশ্–ইল্=আশিল্ 'আগত বা আসন্ন' (√আশ্–আসা)

পা–ইল্=পাইল্ 'প্রাপ্ত বা প্রাপ্য' (√পা–পাওয়া) ইত্যাদি।

(১১) 'উ' বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

নিব্–উ=নিবু 'নিভন্ত' (√নিব্– নেভা)

হ–উ=হবু 'ভাবী' (√হ –হওয়া)

হাগ্–উ=হাগু 'পেটরোগা' (√হাগ্–মলত্যাগ করা)

চাল্–উ=চালু 'চালাক' (√চাল্–চালা)

ঢাল্–উ=ঢালু 'নিম্নাভিমুখী' (√ঢাল্–ঢালা) ইত্যাদি।

(১২) 'উরা' – বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। এর স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ 'উরি'। উদাহরণ–

হাগ্–উরা=হাগুরা	'পেট রোগা'(পুং)	(√হাগ্–মলত্যাগ করা)
মুত্–উরা=মুতুরা	'মূত্ররোগী'(পুং)	(√মুত্–মূত্রত্যাগ করা)
হাদ্–উরা=হাদুরা	'বমির রোগী'(পুং)	(√হাদ্–বমি করা)
কান্দ্–উরা=কান্দুরা	'কাঁদুনে স্বভাব বিশিষ্ট'(পুং)	(√কান্দ্–কাঁদা)
হাগ্–উরি=হাগুরি	'পেট রোগা'(স্ত্রী)	(√হাগ্–মলত্যাগ করা)
কান্দ্–উরি=কান্দুরি	'কাঁদুনে স্বভাবের'(স্ত্রী)	(√কান্দ্–কাঁদা) ইত্যাদি।

(১৩) 'ওক্' – বিশেষ্যপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

চর্–ওক্=চরোক্	'চড়ুক'	(√চর্–চড়া)
ধর্–ওক্=ধরোক্	'ধড়ুক'	(√ধর্–ধরা)
নর্–ওক=নরোক্	'লড়াই'	(√নর্–লড়াই করা)
টান্–ওক্=টনোক্	'চেতনা'	(√টান্–টানা) ইত্যাদি।

(১৪) 'উনি' – বিশেষ্য এবং বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

নাচ্–উনি=নাচুনি	'নাচ বা নর্তকী'	(√নাচ্–নাচা)
আন্ধ্–উনি=আন্ধুনি	'রাঁধুনী'	(√আন্ধ্–রান্না করা)
পিন্ধ্–উনি=পিন্ধুনি	'পরিধানকারিনী'	(√পিন্ধ্–পরিধান করা)
বক্–উনি=বকুনি	'বকুনি'	(√বক্–কথা বলা)
হা–উনি=হাউনি	'হাউনী'	(√হা–হাওয়া)
চা–উনি=চাউনি	'চাউনি, দৃষ্টি'	(√চা–চাওয়া, দেখা) ইত্যাদি।

(১৫) 'ওনা' বিশেষ্যপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

খা–ওনা=খাওনা	'খাওনা'	(√খা–খাওয়া)
ন্যা–ওনা=ন্যাওনা	'গৃহীতব্য'	(√ন্যা–নেওয়া)
গা–ওনা=গাওনা	'গান'	(√গা–গান গাওয়া)
ক–ওনা=কওনা	'কথা'	(√ক–বলা) ইত্যাদি।

(১৬) 'ওন্' – বিশেষ্যপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

চাক্–ওন্=চাকোন্	'চাকনা'	(√চাক্–চাকা)
কান্দ্–ওন্=কান্দোন্	'কান্না'	(√কান্দ্–কাঁদা)
বান্ধ্–ওন্=বান্ধোন্	'বাঁধন'	(√বান্ধ্–বাঁধা)

মর্-ওন্=মরোন্	'মৃত্যু'	(√মর্-মরা)
তর্-ওন্=তরোন্	'বায়ু'	(√তর্-তর্জি করা)
মাগ্-ওন্=মাগোন্	'ভিক্ষা'	(√মাগ্-ভিক্ষা করা)
কর্-ওন্=করোন্	'কাজ'	(√কর্-করা)
চল্-ওন্=চলোন্	'চলা, চলার রীতি'	(√চল্-চলা) ইত্যাদি।

(১৭) 'ন' - বিশেষ্য ও বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

জোগা-ন=জোগান্	'যোগান'	(√জোগা-যোগানো)
ব্যাচা-ন=ব্যাচান্	'বিক্রয়যোগ্য'	(√ব্যাচা-বিক্রি করা)
উড়া-ন=উড়ান্	'ওড়ার উপযুক্ত'	(√উড়া-ওড়া)
উজা-ন=উজান্	'উজান'	(√উজা-উজান দিকে যাওয়া)
গা-ন=গান্	'গান'	(√গা-গাওয়া)
খা-ন=খান্	'খাউনী'	(√খা-খাওয়া)
নাগা-ন=নাগান্	'আভিচারিক ক্রিয়া'	(√নাগা-লাগানো) ইত্যাদি।

(১৮) 'না' - বিশেষ্যপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

চাক্-না=চাক্না	'চাকনি'	(√চাক্-চাকা)
বাজ্-না=বাজ্না	'বাজনা'	(√বাজ্-বাজা)
হাগ্-না=হাগ্না	হাগ'উদরাময় রোগ'	(√হাগ্-মলত্যাগ করা)
দ্যা-না/দ্যানা	'ঋণ'	(√দ্যা-দেওয়া)
ধার্-না=ধার্না	'পালোয়ান'	(√ধার্-ধারা) ইত্যাদি।

(১৯) 'ওয়াল্' - বিশেষ্য ও বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

রাখ্-ওয়াল্=রাখোয়াল্	'রাখাল'	(√রাখ্-রাখা)
পার্-ওয়াল্=পারোয়াল্	'সমর্থ'	(√পার্-সমর্থ হওয়া)
ধাট্-ওয়াল্=ধাটোয়াল্	'যা দিয়ে বাঁটা হয়'	(√ধাট্-বাঁটা) ইত্যাদি।

(২০) 'তি'- বিশেষ্য ও বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

উঠ্-তি=উঠ্তি	'উঠতি'	(√উঠ্-ওঠা)
পড়্-তি=পড়তি	'পড়ন্ত'	(√পড়্-পড়ে যাওয়া)
কম্-তি=কম্তি	'কমতি'	(√কম্-কমে যাওয়া)
ঘাট্-তি=ঘাট্তি	'ঘাটতি'	(√ঘাট্-ঘাটা)
কাট্-তি=কাট্তি	'চাহিদা বা বিক্রি'	(√কাট্-কাটা) ইত্যাদি।

(২১) 'নি' – বিশেষ্য ও বিশেষণপদ গঠন করে। উদাহরণ–

ক্যালা–নি=ক্যালানি	'ফেলে দেওয়ার যোগ্য'	(√ক্যালা– ফেলে দেওয়া)
বকা–নি=বকানি	'ঝাঁকুনি'	(√বকা–ঝাঁকি দেওয়া)
চরা–নি=চরানি	'চড়ানোর পারিশ্রমিক	(√চরা–চড়ানো)
ব্যারা–নি=ব্যারানি	'ভ্রমণ'	(√ব্যারা–বেড়ানো)
ঘ্যালা–নি=ঘ্যালানি	'মিড়ানি'	(√ঘ্যালা – মিড়ানো)
ঘ্যাদা–নি=ঘ্যাদানি	'লাথি'	(√ঘ্যাদা– লাথি মারা)
ঘ্যাঙা–নি=ঘ্যাঙানি	'কাতরোক্তি'	(√ঘ্যাঙা–কাতরোক্তি করা)
ঝোরা–নি=ঝোরানি	'চাবি'	(√ঝোরা–ঝাড়ানো) ইত্যাদি।

(২২) 'ড়ি' বিশেষ্য ও বিশেষণপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

ঘ্যাঙা–ড়ি=ঘ্যাঙাড়ি	'কাতরোক্তি'করা	(√ঘ্যাঙা–কাতরোক্তি করা)
গাজা–ড়ি=গাজাড়ি	'সদ্য গজিয়ে ওঠা'	(√গাজা–গজানো)
চোতা–ড়ি=চোতাড়ি	'চীৎকার'	(√চোতা–চীৎকার করা)
ভ্যাবা–ড়ি=ভ্যাবাড়ি	'বিরক্তিকর কান্না'	(√ ভ্যাবা– কাঁদা)
গোঙা–ড়ি=গোঙাড়ি	'গোঁ গোঁ শব্দ'	(√গোঙা– গোঁ গোঁ শব্দ করা)
গোহা–ড়ি=গোহাড়ি	'অগোছালো'	(√গোহা– গোছানো) ইত্যাদি।

(২৩) 'ই' – বিশেষ্যপদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

ঘ্যাদা–ই=ঘ্যাদাই	'লাথি'	(√ঘ্যাদা–লাথি মারা)
গুরা–ই=গুরাই	'লাথি'	(√গুরা–লাথি মারা)
গোহা–ই=গোহাই	'গোছানোর কাজ	(√গোহা–গোছানো) ইত্যাদি।

প্রত্যয় ঃ তদ্ধিত

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণ, বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গুণবাচক বিশেষ্য, বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নামধাতু গঠন করে। নীচে উদাহরণ সহযোগে এই উপ-ভাষায় বহুলপ্রচলিত তদ্ধিত প্রত্যয়গুলির আলোচনা করা হ'ল।

(১) 'আ' - উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই প্রত্যয়টি নামপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ এবং নামধাতু গঠন করে থাকে। উদাহরণ-

পশ চিম্-আ=পশ্চিমা	'পশ্চিম দিক থেকে আগত বা পশ্চিমাঞ্চলে জাত'
ভাটি-আ=ভাটিয়া	'ভাটি দেশ থেকে আগত বা ভাটি দেশে জাত'
মাটি-আ=মাটিয়া	'মাটির তৈরী বা মাটির মত রঙ বিশিষ্ট'
বিচি-আ=বিচিয়া	'বীজযুক্ত'
হলদি-আ=হলদিয়া	'হলুদ রঙ বিশিষ্ট'
চৈত্-আ=চৈতা	'চৈত্রের মাসে জাত বা চৈত্রমাস সংক্রান্ত'
বুধ-আ=বুধা	'বুধবারে যার জন্ম'
হাত্-আ=হাতা	'হস্তার্পণ করা বা হস্তগত করা'
মন্-আ=মনা	'ইচ্ছা হওয়া বা করা'
ফোর্-আ=ফোরা	'ছিদ্র করা' ইত্যাদি।

(২) 'আই' - বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্যপদ গঠন করে। উদাহরণ-

ভাল্-আই=ভালাই	'মঙ্গল'
বর্-আই=বরাই	'গর্ব'
বামোন্-আই=বামনাই	'ব্রাহ্মণসুলভ আচরণ বা অভ্যাস'
চ্যাংড়া-আই=চ্যাংড়াই	'ছোট' ইত্যাদি।

(৩) 'আতি'- বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য এবং ক্রিয়াবাচী বিশেষ্যপদ গঠন করে। উদাহরণ-

হাকিম্-আতি=হাকিমাতি	'হাকিমের কাজ বা বিচারকার্য'
চাউল্-আতি=চাউলাতি	'চালের ব্যবসা বা ব্যবসায়ী'
উকিল্-আতি=উকিলাতি	'উকিলের কাজ বা আইনব্যবসা'
মাও-আতি=মাওয়াতি	'মাতৃস্থানীয়া'

পো-আতি=পোয়াতি 'প্রসূতি বা মা' ইত্যাদি।

(৪)'আনি' - বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য ও বিশেষণপদ গঠন করে। উদাহরণ-

ঠাও্-আনি=ঠাওআনি 'গুহার'

তল্-আনি=তলানি 'তলার জিনিস'

মাক্-আনি =মাকানি 'মাঝখা'

পার্-আনি =পারানি 'পার হওয়ার মাশুল'

চিন্-আনি=চিনানি 'চিহ্ন-চেনা ভাব' ইত্যাদি।

(৫)'আমি' - বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গুণবাচক বিশেষণপদ গঠন করে। উদাহরণ-

লাজিন্-আমি=লাজিনামি 'লাজলামো'

দুষ্টো-আমি=দুষ্টোমি 'দুষ্টামি'

ঠক্-আমি=ঠকামি 'ঠকামো'

বদ্-আমি=বদামি 'বদ কাজ বা বদ লোকের মত স্বভাব'

বান্দোর্-আমি=বান্দোরামি 'বাঁদরামো'

নষ্টো-আমি=নষ্টোমি 'নষ্টামি' ইত্যাদি।

(৬) 'আর্' - বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণপদ গঠন করে। উদাহরণ-

ভক্তি-আর্=ভক্তিয়ার্ 'ভক্তিমান'

দালি-আর্=দালিয়ার 'যে ব্যক্তি বন্ধু পাতিয়ে দালি করে দেয়'

সুত্-আর্=সুতার্ 'সুতার'

চুড়ি-আর্=চুড়িয়ার্ 'চুড়ি'

ঘাট্-আর্=ঘাটিয়ার্ 'যে ঘাটে কাজ করে, ঘাটি' ইত্যাদি।

(৭)'আরি' - বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণপদ গঠন করে। উদাহরণ-

পাত্-আরি=পাতারি 'পাতা বা পাতার মত হালকা স্বভাবের লোক'

যুত্-আরি=যুতারি 'যুক্তযুক্ত'

খাড্-আরি=খাডারি 'খাড়ারি'

বোঝ্-আরি=বোঝারি 'বোঝাই' ইত্যাদি।

(৮) 'আরু' - বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণপদ গঠন করে। উদাহরণ-

বোঝ্-আরু =বোঝারু 'বোঝা বহনে সক্ষম'

বাঘ্-আরু=বাঘারু 'বাঘের মত শক্তিমান'

আপোষ্-ঈ=আপোষি 'আপোষী'

ঢাক্-ঈ=ঢাকি 'যে ঢাক বাজায়'

তেল্-ঈ=তেলি 'কলু'

ভাগ্-ঈ=ভাগি 'অংশীদার'

সোয়ার্-ঈ=সোয়ারি 'আরোহী'

পণ্ডিত্-ঈ=পণ্ডিতি 'পাণ্ডিত্য বা পণ্ডিতের কাজ'

মাস্টার্-ঈ=মাস্টারি 'শিক্ষকতা'

পাইকার্-ঈ=পাইকারি 'ব্যবসাকার্য' ইত্যাদি।

(১৩) 'ইয়া' - বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে বিশেষণে রূপান্তরিত করে। উদাহরণ-

বাইগোন্-ইয়া=বাইগোনিয়া 'সবুজ, বেগুনের মত রঙবিশিষ্ট'

বাজার্-ইয়া=বাজারিয়া 'বাজারজাত সামগ্রী বা বাজারের অধিবাসী'

চাটিমর্-ইয়া=চাটিমরিয়া 'উন্নাসিক'

জাত্-ইয়া=জাতিয়া 'একই জাতিযুক্ত' ইত্যাদি।

(১৪) 'ইন্' - বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে বিশেষণে রূপান্তরিত করে। উদাহরণ-

রঙ্-ইন্=রঙিন্ 'রঙিন'

সঙ্-ইন্=সঙিন্ 'সঙ্গীন' ইত্যাদি।

(১৫) 'ইলা' - বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণপদ গঠন করে। উদাহরণ-

আগ্-ইলা=আগিলা ' অগ্রবর্তী বা পূর্ববর্তী'

পাছ্-ইলা=পাছিলা 'পরবর্তী বা [illegible] পশ্চাৎবর্তী'

রঙ্-ইলা=রঙিলা 'রঙিন' ইত্যাদি।

(১৬) 'উ' - বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণপদ গঠনে সহায়তা করে। উদাহরণ-

দাক্-উ=দাকু 'প্রকটদক্ষ ব্যক্তি'

ভাত্-উ=ভাতু 'ভোজনপ্রিয় অথচ অকর্মণ্য'

গাট্-উ=গাট্টু 'গাঁটযুক্ত বা হ্রস্বকায় ব্যক্তি'

আন্ধার্-উ=আন্ধারু 'কৃষ্ণপক্ষে যার জন্ম'

জোনাক্-উ=জোনাকু 'শুক্লপক্ষে যার জন্ম'

কাচান্-উ=কাচানু 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী' ইত্যাদি।

(২২) 'চা' - বিশেষণের অর্থে মাত্রা যোজনা করে। উদাহরণ-

নাল্-চা=নালচা 'লালচে'

কাল্-চা=কালচা 'কালচে' ইত্যাদি।

(২৩) 'টিয়া' - সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংখ্যার সমাহার নির্দেশ করে। উদাহরণ-

ষোলো-টিয়া=ষোলোটিয়া 'ষোল সংখ্যার সমাহার'

চইদ্দো-টিয়া=চইদ্দোটিয়া 'চোদ্দ সংখ্যার সমাহার' ইত্যাদি।

এই প্রত্যয়টি বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণের অর্থে মাত্রা যোজনা করে। উদাহরণ-

শুকান্-টিয়া=শুকানটিয়া 'শুকনো মত'

ঘোলা-টিয়া=ঘোলাটিয়া 'ঘোলাটে' ইত্যাদি।

(২৪) 'তি' - বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণপদ গঠন করে। উদাহরণ-

হাওয়া-তি=হাওয়াতি 'সন্তানবতী'

ঘোড়া-তি=ঘোড়াতি 'যে ঘোড়ার ব্যবসা করে'

বোকা-তি=বোকাতি 'ঠোঁট এবং পরিত্যক্ত'

বুড়া-তি=বুড়াতি 'বৃদ্ধ' ইত্যাদি।

(২৫) 'মি'-এই প্রত্যয়টি 'আমি'-এর সম্প্রসারণ। এটি স্বরান্ত পদের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করে। উদাহরণ-

চ্যাঙরা-মি=চ্যাঙরামি 'চপলতা'

বুড়া-মি=বুড়ামি 'বৃদ্ধত্ব বা বার্ধক্য'

কিপট্টা-মি=কিপট্টামি 'কৃপণতা'

বোকা-মি=বোকামি 'বোকামি' ইত্যাদি।

(২৬) 'রিয়া' - বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে বিশেষণে রূপান্তরিত করে। উদাহরণ-

পাপ্-রিয়া=পাপারিয়া 'পাপুড়ে'

হাউ-রিয়া=হাউরিয়া 'সর্বহারা'

ডাউ-রিয়া=ডাউ রিয়া 'উদ্ধত'

পাও-রিয়া=পাউরিয়া 'চতুর' ইত্যাদি।

(২৭)'ল' - বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে বিশেষণে রূপান্তরিত করে। উদাহরণ-

আঠা-ল=আঠাল্ 'আঁঠাযুক্ত'

গোটা-ল=গোটাল্ 'গুটিকা'

ধম্দা-ল=ধামদাল্ 'রহস্যময়' ইত্যাদি।

(২৮)'রা' - বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে বিশেষণে রূপান্তরিত করে। কখনও কখনও এই প্রত্যয়টি বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন বিশেষ্যপদ গঠন করে। উদাহরণ-

কাম্-রা=কাম্রা 'পরিশ্রমী'

দিগ্-রা=দিগ্রা 'দীর্ঘ' ইত্যাদি।

(২৯) 'সরা' ক্রমাঙ্ক সূচক শব্দ গঠনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

দুই-সরা=দোসোরা 'দ্বিতীয়'

তিন্-সরা=তেসোরা 'তৃতীয়' ইত্যাদি।

(৩০) 'হারা'- সাধারণ কয়েকটি সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেগুলিকে বিশেষণে রূপান্তরিত করে। উদাহরণ-

অ্যাক্-হারা=অ্যাক্হারা 'একহারা'

দুই-হারা=দোহারা 'দোহারা' ইত্যাদি।

তৎসম প্রত্যয়

(১) 'ক' /'উক্' বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণপদ গঠন করে। উদাহরণ-

প্যাট্-উক=পেটুক্ 'পেটুক'

নিন্দা-উক= নিন্দুক্ 'নিন্দুক'

ঘিন্-উক = ঘিনুক্ 'ঘিনুক'

হিংসা-উক= হিংসুক্ 'হিংসুক' ইত্যাদি।

(২) 'ময়'/'মই' - বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোনো কিছুর ব্যাপ্তি (কিছু দ্বারা পূর্ণ, এই রকম অর্থ) নির্দেশ করে। উদাহরণ-

ঘর্-মই=ঘরমই 'ঘরময়'

দ্যাশ্-মই=দ্যাশমই 'দেশময়'

বাবা-মই=বাবামই 'বাবাময়'

গাও-মই=গাওমই 'শরীরময়' ইত্যাদি।

ফারসী প্রত্যয়

(১) 'আন্' - বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণপদ গঠন করে। উদাহরণ-

গাড়ি-আন= গাড়িয়ান্ 'গাড়োয়ান'

ত্যাজ্-আন= ত্যাজোয়ান্ 'তেজী' ইত্যাদি।

(২) 'আনা', 'আনি' - সমার্থক এই প্রত্যয়দুটি বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করে। উদাহরণ-

বাবু-আনা=বাবুয়ানা 'বাবুসুলভ আচরণ'
বাবু-আনি=বাবুয়ানি 'বাবুসুলভ আচরণ'
গরিব্-আনা=গরিবানা 'গরীবসুলভ আচরণ'
গরিব্-আনি=গরিবানি 'গরীবসুলভ আচরণ' ইত্যাদি।

(৩) 'খানা'- বিশেষ্য বা বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোনো কিছুর অবস্থানকে নির্দেশ করে। উদাহরণ-

ডাক্তার্-খানা=ডাক্তারখানা 'ডাক্তারের কর্মস্থল বা চিকিৎসালয়'
মুদি-খানা=মুদিখানা 'মুদিখানা'
ছাপা-খানা=ছাপাখানা 'ছাপাখানা' ইত্যাদি।

(৪) 'খোর্' বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে বিশেষণে রূপান্তরিত করে এবং কোনো কিছুর অভ্যাস বা আসক্তি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

হারাম্-খোর্=হারামখোর্, 'অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক'
চশোম্-খোর্=চশোমখোর্, 'চক্ষুলজ্জাহীন'
ঘুষ-খোর্=ঘুষখোর্, 'ঘুষখোর'
তাড়্-খোর্=তাড়খোর্, 'মাদকদ্রব্যে আসক্ত'
মদ্-খোর্=মদখোর্, 'মদে আসক্ত বা অভ্যস্ত' ইত্যাদি।

(৫) 'গর'>'কর্' - বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণপদ গঠন করে এবং বৃত্তি নির্দেশ করে। উদাহরণ-

বাজি-কর্=বাজিকর্, 'বাজিকর'
জাদু-কর্=জাদুকর্, 'যাদুকর'
কারু-কর=কারিকর, 'কারিগর'
নাবিক্-কর্=নাবিকর্ 'গাড়োয়ান' ইত্যাদি।

(৬) 'গিরি' - সাধারণভাবে এই প্রত্যয়টি কোনো শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবিকা, অভ্যাস, আসক্তি, প্রবণতা ইত্যাদি নির্দেশ করে। উদাহরণ-

বাবু-গিরি=বাবুগিরি 'বাবুসুলভ আচরণ'
কুলি-গিরি=কুলিগিরি 'কুলিগিরি'
খিদমত্-গিরি=খিদমত্গিরি 'তত্ত্বাবধান'

তাউঙ্‌রা-কাটা=তাউঙ্‌রাকাটা 'নির্বোধ ও উদ্ধত'

লালুয়া-কাটা=লালুয়াকাটা 'বড়' ইত্যাদি।

(২)'পরা'এর ব্যবহার কতকটা স্বার্থিক প্রত্যয়ের মত হলেও সাধারণভাবে এটি বিশেষণের অর্থে মাত্রা যোজনা করে থাকে। উদাহরণ-

নাদান্‌-পরা=নাদান্‌পরা 'দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত'

ধ্যাঙ্‌টিয়া-পরা=ধ্যাঙ্‌টিয়াপরা 'স্বাস্থ্যহীন'

বানচ্ছেয়া-পরা=বানচ্ছেয়াপরা 'বৃদ্ধ এবং হতশ্রী'

নাজুক্‌তা-পরা=নাজুক্‌তাপরা 'দরিদ্র এবং দুর্বল' ইত্যাদি।

(৩) 'নাগা' - এই প্রত্যয়টিও বিশেষণের অর্থে মাত্রা যোজনা করে। উদাহরণ-

থিম্‌-নাগা=থিম্‌নাগা 'দুলিত'

শুকানি-নাগা=শুকানিনাগা 'একেবারেই শুকনো'

ব্যালব্যালা-নাগা=ব্যালব্যালানাগা'কর্মঠ এবং বচনশীল'

লোরুপোটা-নাগা=লোরুপোটানাগা'অত্যন্ত সঙ্কুচিত'

চ্যামুরা-নাগা=চ্যামুরানাগা 'শুষ্ক এবং কোঁচকানো' ইত্যাদি।

(৪) 'বারি'কোনো বিষয় অথবা বস্তুর অবস্থানকের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

গরু-বারি=গরুবারি 'গোচারণভূমি বা গোয়াল'

ধান্‌-বারি=ধান্‌বারি 'ধানক্ষেত'

হাটি-বারি=হাটিবারি 'মেলা'

পাথার্‌-বারি=পাথার্‌বারি 'মাঠ' ইত্যাদি।

(৫)'মুয়া' - অনুরক্তি এবং সাদৃশ্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

মাইয়া-মুয়া=মাইয়ামুয়া 'স্ত্রীলোকের সদৃশ বা স্ত্রৈণ'

তল্‌-মুয়া=তল্‌মুয়া 'নিম্নমুখী বা বিনীত'

বিলাই -মুয়া=বিলাইমুয়া 'বিড়ালের মত মুখ যার বা যে বিড়ালের মত স্বভাববিশিষ্ট'

আন্ধার্‌-মুয়া=আন্ধারমুয়া 'যার মুখমণ্ডল বিষন্ন'

মান্‌জি-মুয়া=মান্‌জিমুয়া 'ভীরু এবং স্বল্পবাক্‌' ইত্যাদি।

(৬)'হাটি' - এই প্রত্যয়টিও কোনো কিছুর অবস্থানকের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

ধান্‌-হাটি=ধান্‌হাটি 'যেখানে ধান বিক্রী হয়'

কাউর্‌-হাটি=কাউর্‌হাটি 'যেখানে কাপড় ইত্যাদি হয়' ইত্যাদি।

উপসর্গ ঃ তৎসম, তদ্ভব, দেশী

(১) 'অ'-না অর্থে শব্দের সঙ্গে এই উপসর্গটির ব্যবহার ঘটে থাকে। উদাহরণ-

অ-কাম্=অকাম্ 'অর্থহীন কাজ'

অ-কথা=অকথা 'অর্থহীন কথা'

অ-চুকা=অচুকা 'অচেনা'

অ-ঢোদা=অঢোদা 'কাণ্ডজ্ঞানহীন' ইত্যাদি।

(২) 'অ' কোথাও কোথাও স্বার্থিক প্রত্যয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

অ-কুমারি=অকুমারি 'কুমারী'

অ-মদ্দো=অমদ্দো 'মদ' ইত্যাদি।

(২) 'অন্'-সাধারণ কিছু শব্দে এই প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় এ নঞর্থক ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

অন্-দিশা=অন্দিশা 'দিশাহীন, দিশভ্রান্ত'

অন্-বুঝ্=অন্বুঝ্ 'বিবেচনাহীন'

(৩)'কু'- 'খারাপ' এই অর্থে এই উপসর্গটির ব্যবহার ঘটে থাকে। উদাহরণঃ-

কু-কথা=কুকথা 'খারাপ কথা'

কু-মান্ষি=কুমান্ষি 'খারাপ মানুষ'

কু-কাম্=কুকাম্ 'খারাপ কাজ'

কু-বজোর্=কুবজোর্ 'খারাপ দৃষ্টি, কোপ দৃষ্টি' ইত্যাদি।

(৪) 'দর্' - অপরিপক্কতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

দর্-পাকা=দর্পাকা 'আধপাকা'

দর্-কাচা=দর্কাচা 'আধপাকা'

দর্-কচা=দর্কচা 'নিকৃষ্ট এবং বিদকুটপ্রায়' ইত্যাদি।

(৫)'নি' - 'নাই' অর্থে এই উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

নি-লাজ্=নিলাজ্ 'নির্লজ্জ'

নি-মায়া=নিমায়া 'মায়া নেই যার'

নি-পয়দাশ্=নিপয়দাশ্ 'নিরুদ্দেশ'

নি-পুত্তিরি=নিপুত্তিরি 'অপুত্রক' ইত্যাদি।

(৬) 'বি' এই প্রত্যয়টির ব্যবহারও 'নাই' অর্থে ঘটে থাকে। উদাহরণ-

বি-ধুয়া=বিধুয়া 'বিধবা'

বি-পরিত্=বিপরিত্ বিপরিত 'বিপরীত' ইত্যাদি।

(৭) 'স'/'ব' -অন্তর্ভুক্তি বোঝাতে এই উপসর্গটির ব্যবহার ঘটে থাকে। উদাহরণ-

স-ধুয়া=সধোয়া 'সধবা'

স-বালোক=সাবালোক্ 'সাবালক'

স-ঠিক=সঠিক্ 'সঠিক' ইত্যাদি।

(৮)'সু'/'শু'- 'ভাল' অর্থে এর ব্যবহার ঘটে থাকে। উদাহরণ-

সু-নাম=সুনাম্ 'সুনাম'

সু-জন=সুজন্ 'ভালো মানুষ'

সু-নজোর=সুনজোর্ 'আনুকূল্য' ইত্যাদি।

(৯) 'হা'- 'নাই' অর্থে বা 'অভাব' অর্থে 'ইয়া'এবং'উয়া'প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে এই উপসর্গটির ব্যবহার হয়ে থাকে। উদাহরণ-

হা-ভাতিয়া=হাভাতিয়া 'নিরন্ন বা অভাবগ্রস্ত'

হা-ঘরিয়া=হাঘরিয়া 'গৃহহীন'

হা-বাড়িয়া=হাবাড়িয়া 'গৃহহীন' ইত্যাদি।

উপসর্গ ঃ বিদেশী(ফারসী)

(১) 'গর' -'অভাব' অর্থে এই উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

গর্-মিল=গর্মিল্ 'গরমিল', মিলের অভাব'

গর্-হাজির=গর্হাজির্ 'গরহাজির, হাজিরার অভাব'

গর্-আদোর=গরাদোর্ 'অনাদর' ইত্যাদি।

(২) 'না' - 'না' অর্থে এর ব্যবহার ঘটে। উদাহরণ-

না-জুক্তা=নাজুক্তা 'গরিব এবং দুর্বল'

না-বালোক=নাবালোক্ 'অপ্রাপ্তবয়স্ক'

না-দান=নাদান্ 'অকর্মণ্য' ইত্যাদি।

(৩) 'ফি'- সাধারণতঃ ব্যাপ্তি বোঝানোর জন্য এই উপসর্গটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উদাহরণ-

ফি-সন=ফিসন্ 'প্রতিবৎসর'

ফি-হাপ্তা=ফিহাপ্তা 'প্রতিসপ্তাহ'

ফি-মানুষি=ফিমানুষি 'প্রতিটি মানুষ'

ফি-হাত=ফিহাত্ 'প্রতিহাত' ইত্যাদি।

(৪) 'বদ্' – 'খারাপ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

বদ্–কাম=বদ্কাম 'খারাপ কাজ'
বদ্–নাম=বদ্নাম্ 'দুর্নাম'
বদ্–মেজাজ=বদ্মেজাজ্ 'খারাপ মেজাজ'
বদ্–হজোম=বদ্হজোম্ 'বদহজম বা অজীর্ণ রোগ' ইত্যাদি।

(৫) 'বে' – 'না' অর্থে এই উপসর্গটি উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। তবে তৎসম উপসর্গ 'বি'–এর সঙ্গে এই উপসর্গটি এই উপভাষায় প্রায়শঃই একাকার হয়ে যায়। উদাহরণ–

বে–হাত=বেহাত্ 'হাতছাড়া'
বে–নিয়ম=বেনিয়ম্ 'অনিয়ম'
বে–গার=বেগার্ 'পারিশ্রমিকহীন কাজ'
বে–শরোম=বেশরোম্ 'লজ্জাহীন' ইত্যাদি।

(৬) 'হর্'– ব্যাপ্তি অর্থে প্রচলিত। উদাহরণ–

হর্–বোলা=হর্বোলা 'যে বিভিন্ন পশু পাখির ডাক নকল করতে পারে'
হর্–দিনা=হর্দিনা 'প্রত্যহ'
হর্–হামেশা=হর্হামেশা 'প্রায় সর্বদাই'
হর্–রোজ=হর্রোজ্ 'প্রতিদিন'
হর্–দম=হর্দম্ 'সারাক্ষণ'
হর্–কিছিম=হর্কিছিম্ 'সব রকম' ইত্যাদি।

প্রত্যয় ঃ ইংরেজী

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সামান্য কয়েকটি ইংরেজী উপসর্গ প্রচলিত। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল। উদাহরণ–

হেড্–মাস্টার=হেড্মাস্টার্ 'প্রধান শিক্ষক'
ফুল্–শার্ট্=ফুল্শার্ট্ 'পুরোহাতা জামা'
ফুল্–বাবু=ফুল্বাবু 'নিখুঁত বাবু' ইত্যাদি।

বিশেষ্যের রূপভেদ

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কারক, বিভক্তি, বচন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে বিশেষ্যের রূপভেদ ঘটে থাকে। তবে এই উপভাষায় প্রচলিত সমস্ত রকমের বিশেষ্যপদ সরাসরিভাবে সমস্ত বিভক্তি চিহ্ন গ্রহণ করতে পারে না। বস্তুবাচক ও গুণবাচক বিশেষ্যে সরাসরিভাবে বিভক্তি যোগ করে কর্তৃ, কর্ম-সম্প্রদান, সম্বন্ধ এবং অধিকরণ, এই চারটি কারকের রূপ পাওয়া যায়। যেমন-

	বস্তুবাচক বিশেষ্য		গুণবাচক বিশেষ্য	
কর্তৃ	মাটি	'মাটি'	ভাল্‌	'ভাল'
কর্ম-সম্প্রদান	মাটিক্‌	'মাটিকে'	ভালোক্‌	'ভালকে'
সম্বন্ধ	মাটির্‌	'মাটির'	ভালের্‌	'ভালোর'
অধিকরণ	মাটিত্‌	'মাটিতে'	ভালোত্‌	'ভালোতে'

কিন্তু সংজ্ঞাবাচক এবং জাতিবাচক বিশেষ্যে সরাসরিভাবে বিভক্তি যোগ করে কর্তৃ, কর্ম-সম্প্রদান, এবং সম্বন্ধ, এই তিনটি কারকের রূপ পাওয়া যায়। যেমন-

	সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য		জাতিবাচক বিশেষ্য	
কর্তৃ	নরেন্‌	'নরেন'	নাউয়া	'নাপিত'
কর্ম-সম্প্রদান	নরেনোক্‌	'নরেনকে'	নাউয়াক্‌	'নাপিতকে'
সম্বন্ধ	নরেনের্‌	'নরেনের'	নাউয়ার্‌	'নাপিতের'

তবে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের মধ্যে যেগুলি স্থানবাচক সেগুলিতে বিভক্তি যোগ করে কর্তৃ, কর্ম-সম্প্রদান, সম্বন্ধ এবং অধিকরণ, এই চারটি কারকের রূপ পাওয়া যায়। যেমন-

কর্তৃ	পাহাড়্‌	'পাহাড়'
কর্ম-সম্প্রদান	পাহাড়োক্‌	'পাহাড়কে'
সম্বন্ধ	পাহাড়ের্‌	'পাহাড়ের'
অধিকরণ	পাহাড়োত্‌	'পাহাড়ে'

বাকি কারকগুলি বোঝানোর জন্য মূল পদের সঙ্গে একাধিক বিভক্তি চিহ্ন এবং অনুসর্গ যোগ করতে হয়। যেমন-

কর্তৃ	মান্‌ষি	'মানুষ'
কর্ম-সম্প্রদান	মান্‌ষিক্‌	'মানুষকে'
করণ	মান্‌ষির দারা, মান্‌ষিক্‌দিয়া	'মানুষের দ্বারা, মানুষকে দিয়ে'
অপাদান	মান্‌ষিরঠে হতে	'মানুষের কাছ থেকে'
সম্বন্ধ	মান্‌ষির্‌	'মানুষের'

অধিকরণ　　　'মান্শিরটৈ'　'মানুষের কাছে'

বলা যেতে পারে যে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত বিশেষ্যপদগুলি কর্তৃ, কর্ম-সম্প্রদান, সম্বন্ধ এবং অধিকরণ, মোট এই চারটি কারকের বিভক্তিই সরাসরিভাবে গ্রহণ করতে পারে।

বচন

সমস্ত নব্যভারতীয় আর্যভাষার মত উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও ব্যাকরণগতভাবে বচন দুই প্রকার। (১) একবচন (২) বহুবচন। কিন্তু অর্থের দিক থেকে বিচার করলে আরও এক প্রকারের বচন এই উপভাষায় পাওয়া যেতে পারে। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক মান্শি 'মানুষ', এই শব্দটির কথা। এখানে মান্শি বলাতে মানুষের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা হ'ল না। সুতরাং শব্দটি ব্যাকরণগত দিক থেকে একবচনসূচক, না বহুবচনসূচক তা এখানে স্পষ্ট নয়। অর্থাৎ মান্শি শব্দটি একটি মানুষকেও বোঝাতে পারে, আবার একাধিক মানুষকেও বোঝাতে পারে। সুতরাং এই শব্দটিতে যে বচন প্রযুক্ত হয়েছে তাকে 'উভয়বচন' বলা যেতে পারে। তবে এই ধরনের বচনের সর্বাপেক্ষা সুপ্রযুক্ত নাম ডঃ সুকুমার সেনের একটি প্রস্তাব অনুসারে হওয়া উচিত 'সাধারণ বচন'।[১] উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই সাধারণ বচনই একবচন ও বহুবচনের ভিত্তি। অর্থাৎ সাধারণ বচনের সঙ্গেই টা, খান্ ইত্যাদি নির্দেশক এবং অ্যাক্ এই সংখ্যাসূচক শব্দটি যোগ করে এই উপভাষায় একবচনের রূপ গঠন করতে হয়। অনুরূপভাবে সাধারণ বচনের সঙ্গে গুলা, গিলা ইত্যাদি বহুবচনসূচক প্রত্যয় এবং সংখ্যাসূচক শব্দ যোগ করে বহুবচনের রূপ গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে এই সাধারণ বচন একমাত্র বিশেষ্যপদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বচন দুই প্রকার। (১) একবচন (২) বহুবচন।

টা ও খান্ যোগে একবচনের রূপ গঠনের উদাহরণ-

সাধারণবচন		একবচন	
মান্শি	'মানুষ'	মান্শিটা	'মানুষটি'
কাপোর্	'কাপড়'	কাপোর্খান্	'কাপড়খানা' ইত্যাদি।

দ্বিত্ব বোঝাতে (যুগপদের সঙ্গে) সাধারণবচনের সঙ্গে সমষ্টিবাচক শব্দ 'জোরা' এবং সংখ্যা শব্দ দুই যোগ করতে হয়। যেমন- অ্যাক্ জোরা কইতোর্ 'এক জোড়া কবুতর', দুইজোন মান্শি 'দুইজন মানুষ', দুই খান্ কাপোর্ 'দুখানা কাপড়' ইত্যাদি।

---

(১) সেন সুকুমার, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ কেমনটি হওয়া উচিত, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, বিশেষ ষাণ্মাসিক সংখ্যা, বর্ষ-১১, সংখ্যা-৩, পৃঃ ২৮৭-২৮৮।

সহগামী বিশেষণপদের দ্বিত্ব ছাড়াও প্রশ্নসূচক ও সাপেক্ষ সর্বনামের ক্ষেত্রে মূল পদের দ্বিত্ব ঘটিয়ে বহুবচন বোঝানো হয়। উদাহরণ-

একবচন		বহুবচন	
কায়	'কে'	কায় কায়	'কারা'
কি	'কী'	কি কি	'কী কী'
কোন্	'কোন'	কোন্ কোন্	'কোন কোন'
জায়	'যে'	জায় জায়	'যারা' ইত্যাদি।

লিঙ্গ

ব্যাকরণগত দিক থেকে বিচার করলে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় লিঙ্গ দুই প্রকার।(১) পুংলিঙ্গ (২) স্ত্রীলিঙ্গ। তবে কিছু শব্দ, যেমন-ছাওয়া 'শিশু', গরু 'গরু', ছাগোল্ 'ছাগল', আন্ধুনি 'রাঁধুনি', বিলাই 'বিড়াল', পখি 'পাখি', কইতোর্ 'পায়রা' ঘোরা 'ঘোড়া' ইত্যাদি শব্দ এই উপভাষায় উভলিঙ্গ। উল্লিখিত শব্দগুলির সঙ্গে স্বতন্ত্র কিছু শব্দ যোগ করলে এগুলির পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ পাওয়া যায়। উদাহরণ-

	পুংলিঙ্গ		স্ত্রীলিঙ্গ	
ছাওয়া	চ্যাঙরা ছাওয়া	'ছেলে'	চেঙরি ছাওয়া	'মেয়ে'
ছাগোল্	পাটা ছাগোল্	'পুং ছাগল'	পাটি ছাগোল্	'স্ত্রী ছাগল'
কইতোর্	পারা কইতোর্	'পুং পায়রা'	পারি কইতোর্	'স্ত্রী পায়রা'
ঘোরা	টাঘোন্ ঘোরা	'পুং ঘোড়া'	মাঘোন্ ঘোরা	'স্ত্রী ঘোড়া' ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে যে মূল পদ যেখানে উভলিঙ্গবাচক সেখানে এই জাতীয় শব্দ প্রয়োগে পদের পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে মূল পদের সঙ্গে প্রযুক্ত এই সমস্ত শব্দ বিশেষণস্থানীয়। তাছাড়া সাধারণভাবে পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরের ক্ষেত্রে এই উপভাষায় কিছু স্ত্রীলিঙ্গবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। মূলতঃ নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির সাহায্যে পদের এই জাতীয় রূপান্তর ঘটে। (১) 'ই' (২) 'আনি' (৩) 'নি'। এছাড়া বাকি শব্দগুলির লিঙ্গান্তর (যে সমস্ত পদের লিঙ্গান্তর সম্ভব) সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ যোগে করা হয়।

উদাহরণ :'ই' যোগে

পুংলিঙ্গবাচক বিশেষ্য অথবা বিশেষণপদ অ-রান্ত এবং অন্ত্যস্বর-আ হলে পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরের সময় এই -আ [illegible] -ই -তে পরিণত হয়।

পুংলিঙ্গ		স্ত্রীলিঙ্গ	
ব্যাটা	'পুত্র'	বেটি	'কন্যা'
চ্যাংরা	'ছেলে'	চেংরি	'মেয়ে'
পাগ্‌লা	'পাগল'	পাগ্‌লি	'পাগলি'
বুরা	'বৃদ্ধ'	বুরি	'বৃদ্ধা'
ডোম্মা	'পুং পশু'	ডুম্মি	'স্ত্রী পশু' ইত্যাদি।

অন্ত্যস্বর -উ হলে লিঙ্গান্তরে [illegible] সেই -উ -ই -তে রূপান্তরিত হয়। যেমন-

বৈশাখু	'বৈশাখ মাসে যে পুরুষের জন্ম'	বৈশাখি	'বৈশাখ মাসে যে মহিলার জন্ম'
জোবারু	'শুক্রবারে যে পুরুষের জন্ম'	জোবারি	'শুক্রবারে যে মহিলার জন্ম'
কালটু	'কালো গায়ের রঙ যে পুরুষের'	কালটি	'কালো গায়ের রঙ যে মহিলার' ইত্যাদি।

উদাহরণ : 'আনি যোগে'

পুংলিঙ্গবাচক বিশেষ্য অথবা বিশেষণপদ [illegible] ব্যঞ্জনান্ত হলে মূল পদের সঙ্গে 'আনি' প্রত্যয় যোগে তাকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়।

চাকোর্	'চাকর'	চাকোরানি	'চাকরানী'
ম্যাতোর্	'মেথর'	ম্যাতোরানি	'মেথরানী'
মিতোর্	'বন্ধু'	মিতরানি	'বন্ধুপত্নী'
সাইব্	'সাহেব'	সাইবানি	'মেম' ইত্যাদি।

উদাহরণ : 'নি' যোগে

স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত, পুংলিঙ্গবাচক উভয় প্রকার পদেই 'নি' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নিষ্পন্ন হয়।

মাস্টার্	'শিক্ষক'	মাস্টার্নি	'মহিলা শিক্ষক'
চোর্	'চোর'	চুর্নি	'মহিলা চোর'
নাউয়া	'নাপিত'	নাউয়ানি	'নাপিতানী'
নাল্‌চিয়া	'লোভী পুরুষ'	নাল্‌চিয়ানি	'লোভী মহিলা' ইত্যাদি।

কিছু কিছু শব্দে 'আনি' প্রত্যয় যোগ করে লিঙ্গান্তর করা হলে সেই শব্দান্ত শব্দে এক প্রকার অনিবার্যভাবেই অপিনিহিতি ঘটে। যেমন-

পুংলিঙ্গ		স্ত্রীলিঙ্গ	
ধালি	'ধালি'	ধাইরানি	'ধালিনী'
তেলি	'কলু'	তেইলানি	'কলুপত্নী বা কলু জাতীয়া স্ত্রীলোক'

ইত্যাদি।

উদাহরণ ঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ যোগে

গাবুরু	'বর'	কইনা	'কনে'	
দাদা	'দাদা'	ভজি	'বৌদি'	
দামড়া	'পুং গরু'	বাছুরি	'স্ত্রী গরু, যার বাছুর হয়নি'	
গোলাম	'চাকর'	বান্দি	'চাকরানী'	
ভাতার	'স্বামী'	মাইয়া	'স্ত্রী'	
সোয়ামি	'স্বামী'	বহুন	'স্ত্রী'	ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত কিছু শব্দের পুংলিঙ্গের রূপ নেই। যেমন–

বৈরাতি	'এয়ো, বিবাহে বরের তত্ত্বাবধানকারিনী সধবা স্ত্রীলোক'
বিধুয়া	'বিধবা'
সধোয়া	'সধবা'
ধোয়াতি	'প্রসূতি বা মা'
ভুকানি	'যে মহিলা ধান থেকে চাল তৈরী করে'
ধোকানি	'শিশুর রক্ষণাবেক্ষণকারিণী'
চাউলাতি	'যে মহিলা চালের ব্যবসা করে'
গোলাতি	'যে মহিলা গোয়ার ব্যবসা করে'
ভুজারি	'যে মহিলা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করে'
ভাইরানি	'ধাত্রী'
ঘরুনি	'ঘরের কর্ত্রী' ইত্যাদি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বিশেষ্য এবং বিশেষণের ক্ষেত্রেই লিঙ্গান্তর ঘটে থাকে। সর্বনামের ক্ষেত্রে কোনো রূপ লিঙ্গান্তর ঘটে না। সর্বনামগুলি এই উপভাষায় উভলিঙ্গবাচক।

কারক

বিশেষ্য বা ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অপরাপর অংশের সম্বন্ধ বিচারের অর্থগতভাবে, অর্থাৎ বাক্যের নিহিত অর্থের উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কারকের সংখ্যা সাত হলেও এই উপভাষার শব্দরূপে সম্বন্ধসহ কারকের সংখ্যা চার। (১) কর্তৃ কারক (২) কর্ম-সম্প্রদান কারক (৩) সম্বন্ধ কারক (৪) অধিকরণ কারক। মোটামুটি ভাবে সমস্ত শব্দের রূপে এই চারটি কারক পাওয়া গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন স্থানবাচক, বস্তুবাচক, গুণবাচক এবং ভাববাচক বিশেষ্য বাদে বাকি সমস্ত বিশেষ্যপদে ও পুরুষবাচক সর্বনামপদে অধিকরণ কারক পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে কারকের সংখ্যা অতএব তিন। (১) কর্তৃ কারক, (২)কর্ম-সম্প্রদান কারক এবং(৩) সম্বন্ধ কারক। কর্তৃ, কর্ম-সম্প্রদান, সম্বন্ধ এবং অধিকরণ কারক ছাড়া বাকি সমস্ত কারক বোঝানোর জন্য এই উপভাষায় শব্দের সঙ্গে একাধিক বিভক্তি এবং অনুসর্গ যোগ করতে হয়। নিম্নে বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত বিভক্তিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

কর্তৃ কারক

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কর্তৃ কারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। সাধারণভাবে প্রথমা বিভক্তির চিহ্ন এক্ষেত্রে শূন্য(০)। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা বোঝানোর জন্য প্রথমা বিভক্তির চিহ্ন হিসেবে'এ' ব্যবহৃত হয়। যেমন-

(শূন্য বিভক্তি যোগে) গরু ঘাস্ খায় 'গরু ঘাস খায়'।

('এ' বিভক্তি যোগে) গরুএ ঘাস্ খায় 'গরুই ঘাস খায়'।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিশ্চয়তার ভাব ছাড়াও এই উপভাষায় কর্তৃ কারকে শূন্য 'এ' বিভক্তি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন-

হাসে ধান্ খায়া গেইছে 'হাঁসে ধান খেয়ে গেছে'

পখিএ ধান্ খায়া গেইল্ 'পাখিতে ধান খেয়ে গেল' ইত্যাদি।

কর্ম কারক

কর্ম কারকে স্বরান্ত পদে -ক এবং ব্যঞ্জনান্ত পদে -অক্ বিভক্তি হয়। উদাহরণ-

স্বরান্ত পদে : জোনাকু-ক=জোনাকুক্ ড্যাকাও 'জোনাকুকে ডাক'

আবো-ক =আবোক্ কও 'ঠাকুরমাকে বলি' ইত্যাদি।

-'ক', -'অক্' ছাড়াও কর্মে শূন্য বিভক্তি প্রয়োগের উদাহরণও আলোচ্য উপভাষায় প্রচুর। সাধারণতঃ মনুষ্যেতর প্রাণী এবং জড়বস্তুর ক্ষেত্রে কর্মে শূন্য বিভক্তি হয়। যেমন-

তুই ভাত্ খাইস্ 'তুমি ভাত খাও'

মুই বারি জাও, 'আমি বাড়ি যাই' ইত্যাদি।

উদ্ধৃত বাক্য দুটিতে 'ভাত্' এবং 'বাড়ি' এই দুটি শব্দের সঙ্গে কোনো বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয়নি। কিন্তু নিশ্চয়তামূলক বাক্যে কর্মে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন-

তুই ভাতে খাইস্, 'তুমি ভাতই খাও'

মুই বাড়িৎ জাঙ্, 'আমি বাড়িই যাই' ইত্যাদি।

করণ কারক

করণ কারকের ভাব বোঝাতে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় মূল পদের সঙ্গে -'দারা' (দ্বারা) এবং -'দিয়া', এই দুটি অনুসর্গ যুক্ত হয়। দ্বারা যোগে করণ কারকের রূপ গঠন করতে হলে প্রথমতঃ মূল পদে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন -'র', -'এর্' যুক্ত হয় এবং অবশেষে -'দারা' অনুসর্গটি যোগ করতে হয়। কিন্তু -'দিয়া' যোগে করণের ভাব প্রকাশ করতে হলে প্রথমে মূল পদের সঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন-'ক', -'এক্' যুক্ত করতে হয় এবং সবশেষে যুক্ত হয় অনুসর্গ -'দিয়া'। শিষ্ট বাংলায় প্রচলিত করণের বিভক্তি -'এ' এই উপভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। উদাহরণ-

(-'দারা' যোগে) মোর্ দারা হিল্লা কাম্ হবে না 'আমাকে দিয়ে এসব কাজ হবে না'

উয়ার্ দারা হবে বোধায় 'তাকে দিয়ে হবে বোধ হয়।'

নরেনের্ দারা কাজটা করান 'নরেনের দ্বারা কাজটি করাও' ইত্যাদি।

(-'দিয়া যোগে) মোক্ দিয়া হিল্লা কাম্ হবে না 'আমাকে দিয়ে এসব কাজ হবে না'

উয়াক্ দিয়া হবে বোধায় 'ওকে দিয়ে হবে বোধ হয়'

নরেনোক্ দিয়া কাজ্টা করান্ 'নরেনকে দিয়ে কাজটি করাও' ইত্যাদি।

মনুষ্যেতর প্রাণী এবং জড়বস্তুর ক্ষেত্রে -'দারা' এবং -'দিয়া' যোগে করণের ভাব প্রকাশে মূল পদে স্বতন্ত্র বিভক্তি চিহ্ন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। যেমন-

গরু দারা হাল্ বাই 'গরু দ্বারা চাষ করি'

দাও দিয়া বাশ্ কাটি 'দা দিয়ে বাঁশ কাটি' ইত্যাদি।

এছাড়াও বস্তুবাচক দূর ও নিকট নির্দেশক সর্বনাম, প্রশ্নসূচক বস্তুবাচক সর্বনাম, এবং সাপেক্ষ ও অনির্দিষ্টতা সূচক বস্তুবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রেও -'দারা' এবং -'দিয়া' যোগে করণের রূপ নিষ্পন্ন করতে হলে মূল পদে আলাদা বিভক্তি যুক্ত হয় না। যেমন-

ওইটা দিয়া 'ঐটি দিয়ে'

ওইটা দারা 'ঐটির দ্বারা'

জা দিয়া 'যা দিয়ে'

কিছু দিয়া 'কিছু দিয়ে' ইত্যাদি।

সম্প্রদান কারক

সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন এক্ষেত্রে স্বরান্ত পদে -'ক' এবং ব্যঞ্জনান্ত পদে -'অক্'। উদাহরণ-

(স্বরান্ত পদে) হামাক্ খাবার্ দিছে — 'আমাদের খেতে দিয়েছে'
দোমাশুক্ কামের্ মজুরী দ্যাও — 'দোমাশুকে কাজের পারিশ্রমিক দাও'
গরিব্ মান্ষিক সাহাইজ্জো দ্যাও — 'গরীব লোককে সাহায্য কর' ইত্যাদি।
(ব্যঞ্জনান্ত পদে) নরেনোক্ টাকা দিলুং — 'নরেনকে টাকা দিয়েছি'
জতিনাক্ বই কিনি দিবু — 'যতীনকে বই কিনে দেবে'
অমোক্ এইল্লা টাকা দিয়া দিলুং — 'রামকে এই টাকাগুলি দিয়ে দিলাম' ইত্যাদি।

-'গিলা' যোগে গঠিত বহুবচনসূচক পদে বহুবচনসূচক প্রত্যয় -'গিলা'-এর সঙ্গে -'ক' যোগে সম্প্রদান কারকের রূপ নিষ্পন্ন করতে হয়। -'ঘর্' যোগে গঠিত বহুবচনসূচক পদের ক্ষেত্রেও বহুবচনসূচক প্রত্যয় -'ঘর'-এর সঙ্গেই বিভক্তি যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে সম্প্রদান কারকের বিভক্তি হ'ল-'অক্'। উদাহরণ-

গরু গিলাক্ ঘাস্ খাবার্ দিলুং — 'গরুগুলিকে ঘাস খেতে দিয়েছি'
দোকানির্ ঘরোক্ পাইসা দ্যাও — 'দোকানদারদের পয়সা দাও' ইত্যাদি।

-'গিলা'-যোগে গঠিত বহুবচনসূচক সর্বনামপদে অনেক সময় মূল পদ এবং বহুবচনসূচক প্রত্যয়, উভয়তই বিভক্তি যোগ করে সম্প্রদান কারকের রূপ নিষ্পন্ন হয়। উদাহরণ-

তোমাক্ গিলাক্ কি আর্ দিম্ — 'তোমাদের কী আর দেব'
হামাক্ গিলাক্ কিছুই দিবার্ না নাগে — 'আমাদের কিছুই দেওয়ার দরকার নেই' ইত্যাদি।

অপাদান কারক

মূল পদ অপ্রাণিবাচক হলে তার সঙ্গে সরাসরিভাবে -'হাতে' এবং -'থাকি', এই দুটি অনুসর্গ যোগ করে অপাদান কারকের ভাব প্রকাশ করা হয়। যেমন-

গছ্ থাকি ফল্ পড়ে — 'গাছ থেকে ফল পড়ছে'
দ্যাওয়া হাতে বতষোন্ পড়ে — 'আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে'
দোলাবাড়ি হাতে গরু আনো — 'মাঠ থেকে গরু আনো' ইত্যাদি।

কিন্তু মূল পদ প্রাণী এবং ব্যক্তিবাচক হলে অপাদানের ভাব প্রকাশে প্রথমে মূল পদে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করতে হয়। তারপরে মূল পদে যুক্ত হয় অধিকরণ কারকের বিভক্তি -'ঠে', এবং সবশেষে যোগ করতে হয় -'হাতে' অথবা -'থাকি', এই দুটির যে কোনো একটি অনুসর্গ। উদাহরণ-

মান্ষির্ ঠে হাতে উপোকার্ পাবু — 'মানুষের কাছ থেকে উপকার পাবে'

(স্বরান্ত পদে) গাছিত্ ত্যাল্ নাই — 'গাছিতে তেল নেই'
নদিত্ মাছ্ আছে — 'নদীতে মাছ আছে'
অক্তোত্ ত্যাজ্ আছে — 'রক্তে শক্তি আছে' ইত্যাদি।

(ব্যঞ্জনান্ত পদে) জলোত্ মাছ্ থাকে — 'জলে মাছ থাকে'
ঘরোত্ মানষি থাকে — 'ঘরে মানুষ থাকে'
গছোত্ পখি থাকে — 'গাছে পাখি থাকে' ইত্যাদি।

(-'ট্ঠ', -'ঠে'যোগে) মোরট্ঠে ভাল্ বই আছে — 'আমার কাছে ভাল বই আছে'
উয়ারট্ঠে ম্যালা ছবি আছে — 'ওর কাছে অনেক ছবি আছে'
নরেনেরট্ঠে টাকা আছে — 'নরেনের কাছে টাকা আছে' ইত্যাদি।

নিশ্চয়তা বোঝাতে স্বরান্ত পদে -'তে' এবং ব্যঞ্জনান্ত পদে -'ওতে' যোগ করে অধিকরণ কারকের রূপ নিষ্পন্ন হয়। যেমন-

নদিতে জল্ আছিলো না — 'নদীতেই জল ছিল না'
গছোতে আম্ আছে — 'গাছেই আম আছে' ইত্যাদি।

পদের দ্বিত্ব ঘটলে স্বরান্ত পদে অধিকরণ কারকের বিভক্তি হিসেবে -'য়' এবং ব্যঞ্জনান্ত পদে -'এ' ব্যবহৃত হয়। যেমন-

ডাঙায় ডাঙায় কাশিয়া ফুটিছে — 'মাঠে মাঠে কাশ ফুল ফুটেছে'
জলে জলে ভাষি ব্যারাছ্ — 'জলে জলে ভেসে বেড়াই' ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদের দ্বিত্ব ঘটলে অধিকরণ কারক শূন্য বিভক্তিও হয়। যেমন-

বাড়ি বাড়ি ঘুরি বারায় — 'বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়'
নদি নদি নাও পাওয়ায় — 'নদীতে নদীতে নৌকা বায়' ইত্যাদি।

বিশেষণ

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বিশেষণপদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ্যপদের মত ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ্যের মতই বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয় এবং বিভক্তি বিশেষণের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে। যেমন-

একবচন		বহুবচন	
ভাল্	'ভালো'	ভাললা	'ভালোগুলি'
ভালোক্	'ভালোকে'	ভাললাক্	'ভালোগুলিকে'
ভালোর্	'ভালোর'	ভাললার্	'ভালোগুলির' ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে 'তিতা 'তিক্ত', মিঠা 'মিষ্ট', বড়ো 'বড়', ছোটো 'ছোট' ইত্যাদি একপদময় বিশেষণ এই উপভাষায় স্বাধীনভাবে নামপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতি বিচার করে এই উপভাষায় প্রচলিত

সমস্ত বিশেষণকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) নাম বিশেষণ

(২) ক্রিয়া বিশেষণ

নাম বিশেষণ

অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই উপভাষায় প্রচলিত নাম বিশেষণগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়।

(ক) গুণ বা অবস্থাবাচক। উদাহরণ- লাল্'লাল', কালা 'কালো', ধওলা 'সাদা', পাগ্লা 'পাগল', বুঢ়া 'বুড়া', চ্যাঙড়া 'ছেলে', পাতুরানি 'যুবতী', মহলনিয়া 'গ্রাম্য', পচা 'পচা' ইত্যাদি।

(খ) উপাদান বাচক। উদাহরণ-মাটিয়া হাড়ি 'মেটে হাড়ি', বাউনা মাটি 'বেলে মাটি', খেড়ুয়া ঘর্'খোড়ো ঘর' ইত্যাদি।

(গ) সংখ্যা বা পরিমাণবাচক। উদাহরণ- শ 'শত', হাজার্'হাজার', অ্যাকহাত্'একহাত', দুই স্যার্'দুই সের', দুই পোন্'দুই পণ', ম্যালা 'প্রচুর', অনেক্'অনেক', বহু 'বহু', ঢেঙরা 'প্রচুর', অলপ্পো 'অল্প', কম্'কম' ছোটো 'ছোট', বড়ো 'বড়' ইত্যাদি।

(ঘ) পূরণ বা ক্রমবাচক। উদাহরণ- পহেলা 'প্রথম', দোসোরা 'দ্বিতীয়', তেসোরা 'তৃতীয়', চৌঠা 'চতুর্থ', সাতই 'সপ্তম' ইত্যাদি।

(ঙ) সর্বনামীয় বিশেষণ। উদাহরণ- এইল্লা মান্সি 'এই মানুষগুলি', ঐল্লা মান্সি 'ঐ মানুষগুলি', কোনট্টা কথা 'কোন কথাটি', সেই কথা 'সেই কথা' ইত্যাদি।

গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই উপভাষার নাম বিশেষণগুলির নিম্নানুরূপ শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব।

(ক) একপদময়। উদাহরণ- ভাল্'ভাল', খন্নো 'খারাপ', ছোট্টো 'ছোট', বড়ো 'বড়', কালা'কালো', গোরা 'ফর্সা', দিঘ্রা 'দীর্ঘ' খাটো 'হ্রস্ব', মোটা 'মোটা', সরু 'সরু' ইত্যাদি।

(খ) যৌগিক। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই জাতীয় বিশেষণের সংখ্যা কম। উদাহরণ- মাউরিয়া ছাওয়া 'মাতৃহীন সন্তান', কাউকলানি মান্সি 'পুরুষহীন মানুষ', ছাওয়া অলি বেটি-ছাওয়া 'সন্তানবতী স্ত্রীলোক', হেমতি ধান্'আমন ধান' ইত্যাদি।

(গ) বহুপদময় বা বাক্যময়। এই শ্রেণীর বিশেষণের ব্যবহারও আলোচ্য উপভাষায় সীমিত। উদাহরণ- সাত্রাজার্ধন্অ্যাকেনা মানিক্'সাত রাজার ধন একটি মানিক', খরুপোরা গরু 'খড়পোড়া গরু', নিজের্ভালো'ঠিক্মান্সি 'নিজের বিষয়ে সচেতন ব্যক্তি', তিন্মাথিয়া নাটি ধরা বুড়া 'তিন মাথা ওয়ালা লাঠিধারী বৃদ্ধ' ইত্যাদি।

একপদময় বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ

একপদময় বিশেষণগুলিকে গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নিম্নানুরূপ শ্রেণীগুলিতে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) মৌলিক : প্রত্যয়বিহীন অবিকৃত শব্দ দ্বারা এই শ্রেণীর বিশেষণ গঠিত। উদাহরণ-বড়ো 'বড়' ছোটো 'ছোট', ভাল্ 'ভাল', বয়া 'খারাপ', লহু 'লঘু', দিঘলা 'দীর্ঘ' ইত্যাদি।

(খ) কৃদন্ত : উদাহরণ- উঠ্তি 'উঠতি', পড়তি 'পড়তি', নিন্দালু 'নিদ্রালু' ইত্যাদি।

(গ) তদ্ধিতান্ত : উদাহরণ - মদোরিয়া 'মধুরে', হালুয়া 'কৃষক', জালুয়া 'জেলে' ইত্যাদি।

(ঘ) বিভক্তিযুক্ত : উদাহরণ-পরানবন্ধু 'পরাণবন্ধু', মাওকাটা 'মায়ে কাটা', হাতগরা 'হাতে গড়া', নুনমাখা 'লবণ দিয়ে মাখা' ইত্যাদি।

(ঙ) উপসর্গযুক্ত : উদাহরণ- বেআক্কেল 'নির্দয়', বেলাজ্ 'নির্লজ্জ', নিবোধা 'নির্বোধ' ইত্যাদি।

বিশেষণের লিঙ্গ

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় অধিকাংশ বিশেষণের লিঙ্গ বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে পরিবর্তিত হয় না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণেরও লিঙ্গভেদ ঘটে থাকে। প্রধানতঃ নিম্ন-লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষণের লিঙ্গ পরিবর্তিত হয়।

(১) গুণ বা অবস্থাবাচক বিশেষণের ক্ষেত্রে : এই শ্রেণীর সমস্ত বিশেষণের লিঙ্গভেদ ঘটে না, কিছু কিছু বিশেষণের ঘটে। যেমন-ধলা 'সাদা'(পুং), ধউলি 'সাদা'(স্ত্রী), পাগলা 'পাগল', পাগ্লি 'পাগলিনী', খান্কা 'চরিত্রহীন', খান্কি 'চরিত্রহীনা', ইত্যাদি।

(২) কৃদন্ত বিশেষণের ক্ষেত্রে : এই শ্রেণীর অধিকাংশ বিশেষণ পরিবর্তনশীল। উদাহরণ- নিন্দালু 'নিদ্রালু'(পুং), নিন্দালি 'নিদ্রালু'(স্ত্রী), খাদেখলা 'খাইয়ে'(পুং), খাদেখলি 'খাইয়ে'(স্ত্রী) ইত্যাদি।

(৩) তদ্ধিতান্ত বিশেষণের ক্ষেত্রে : এই শ্রেণীর অধিকাংশ বিশেষণের লিঙ্গভেদ ঘটে। উদাহরণ- হালুয়া 'কৃষক', হালুয়ানি 'কৃষাণী', জালুয়া 'জেলে', জালুয়ানি 'জেলেনী' ইত্যাদি।

(৪) যৌগিক বিশেষণ : এই শ্রেণীর বিশেষণের মধ্যে যেগুলি পুংলিঙ্গবাচক বা স্ত্রীলিঙ্গবাচক নামপদের বিশেষণ সেগুলির রূপান্তর ঘটে। ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত এই শ্রেণীর বিশেষণের কোনো রূপান্তর ঘটে না। যেমন- ছাওয়ালা ব্যাটাছাওয়া 'সন্তানবান', ছাওয়ালি বেটিছাওয়া 'সন্তানবতী', পাইশাওলা মানষি 'ধনবান পুরুষ', পাইশাওলি বেটিছাওয়া 'ধনবতী স্ত্রীলোক', কানরাবাজ্ 'ঝগড়াটে পুরুষ', কানরাবাজি 'ঝগড়াটে স্ত্রীলোক' ইত্যাদি।

ক্রিয়া বিশেষণ

অন্যান্য নব্যভারতীয় আর্যভাষার মত উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও ক্রিয়াবিশেষণগুলি মূলতঃ নামপদ, সর্বনামপদ এবং বিশেষণমূলক। কিছু কিছু ক্রিয়াবিশেষণ বিভক্তি চিহ্ন সহযোগে নামপদের মত ব্যবহৃত হয়। যেমন- আজিকার্ কথা 'আজকের কথা', কালিকার্ দিন্ 'কালকের দিন' ইত্যাদি। বাক্যগঠনে ক্রিয়াবিশেষণ বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদের আগে বসে। যেমন- তুই কালি আসুবু 'তুমি কাল আসবে', মুই ভালে আছুং 'আমি ভালোই আছি' ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত ক্রিয়াবিশেষণ সমূহের মধ্যে তিন প্রকার ক্রিয়াবিশেষণ উল্লেখযোগ্য।

(১) কালজ্ঞাপক ক্রিয়াবিশেষণ ঃ উদাহরণ-

এ্যালায় 'এক্ষুনি'

এ্যালা 'এখন'

ত্যালা 'তখন'

জ্যালা 'যখন'

কোনহালা 'কখন'

কালি 'কাল'

উদিনকা 'পরশুদিন'

আগোত্‌ 'আগে'

পাছোত্‌ 'পরে'

পরকুরি 'তাড়াতাড়ি'

ঘিলকুরি 'দ্রুত'

দিনাও 'প্রতিদিন'

সদায় 'সর্বদা'

নগোদে 'সম্প্রতি'

হালে 'সম্প্রতি'

আইজকাল 'বর্তমানে' ইত্যাদি।

(২) স্থানসূচক ক্রিয়া বিশেষণ ঃ উদাহরণ-

এইঠে 'এখানে'

ওইঠে 'ওখানে'

সেইঠে 'সেখানে'

কোঠে 'কোথায়'

জেটে 'যেখানে'

এতৃতি 'এখানে'

অতৃতি 'ওখানে'

সেতৃতি 'সেখানে'

জিতৃতি 'যেখানে'

জিদি 'যেদিকে'

ভিতোরোত্ 'ভিতরে'

বাহুরাত্ 'বাইরে'

মদ্ধোত্ 'মধ্যে'

আগোত্ 'সম্মুখে'

পাছোত্ 'পিছনে' ইত্যাদি।

(৩) পদ্ধতিজ্ঞাপক ক্রিয়া বিশেষণ-ঃ উদাহরণ-

খ্যাঙ্করি 'এইভাবে'

ক্যাঙ্করি 'কিভাবে'

য্যাঙ্করি 'যেভাবে'

শ্যাঙ্করি 'সেইভাবে'

আস্তে 'আস্তে'

ধিরে 'ধীরে'

ধরবেগে 'দ্রুতবেগে'

অক্স্মিতে 'হটাৎ'

শক্করি 'তাড়াতাড়ি'

আথকা 'হটাৎ'

শক্ষরে 'বিরামহীনভাবে'

খোকরাবুদি 'দলবদ্ধভাবে'

আতরাত্করি 'অমনোযোগী হয়ে'

শ্যালশ্যাশ্করি 'শিথিলভাবে'

ঠাটঠেবাজে 'প্রকাশ্যভাবে'

সোতরলা করি 'দ্বিধা সহকারে' ইত্যাদি।

প্রদত্ত উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই উপভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ ক্রিয়া বিশেষণই ধ্বন্যাত্মক ধাতুযোগে গঠিত হতে পারে। উল্লেখ্য যে এই জাতীয় ক্রিয়াবিশেষণই এই উপভাষায় সংখ্যায় সর্বাধিক।

এই তিন প্রকার ক্রিয়া বিশেষণ ছাড়াও এই উপভাষায় কয়েক প্রকারের ক্রিয়া বিশেষণ আছে। সেগুলিকে নিম্নানুরূপ ভাবে ভাগ করা যায়।

(১) পরিমাণবাচক ক্রিয়া বিশেষণ ঃ উদাহরণ–

অলোপ্‌ 'অল্প'

বেশি 'বেশী'

অ্যাতোলা 'এতগুলি'

কতোলা 'কতগুলি'

অতোলা 'অতগুলি'

জতোলা 'যতগুলি'

অ্যাক্‌না 'একটু'

অ্যাতোটা 'এতটা'

অতোটা 'অতটা ইত্যাদি।

(২)সম্মতিসূচক বা অনুমোদনাত্মক এবং অসম্মতিসূচক ক্রিয়া বিশেষণ ঃ উদাহরণ–

হয় 'হ্যাঁ'

হয় হয় 'হ্যাঁ হ্যাঁ'

নোহায় 'নয়'

উঁহু 'নয়'

অ্যাকেবারে নোহায় 'একেবারেই নয়'

শইত্তুত 'সত্যই'

শইত্তুত শইত্তুত 'সত্য সত্যই' ইত্যাদি।

(৩) হেতু বা কারণাত্মক ক্রিয়া বিশেষণ ঃ উদাহরণ –

কি 'কি'

ক্যানে 'কেন'

ক্যাঙ্করি 'কিভাবে'

কিবাদে 'কিজন্য'

এইবাদে 'এইজন্য' ইত্যাদি।

(৪) যৌগিক ক্রিয়া বিশেষণ : উদাহরণ –

যেইটে যেহাটে 'এখানে ওখানে'

হিত্তি হুত্তি 'এদিকে সেদিকে'

জ্যালায় খ্যালায় 'যখন তখন'

সউক্ সময় 'সর্বদা'

জ্যামোন্ ত্যামোন্ 'যেমন তেমন'

জিদি দিদি 'যেদিকে সেদিকে' ইত্যাদি।

ক্রিয়া বিশেষণের গঠনগত শ্রেণীবিভাগ

গঠনগত দিক থেকে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত ক্রিয়া বিশেষণগুলিকে নিম্নানুরূপ শ্রেণীগুলিতে বিন্যস্ত করা যায়।

(১) বিভক্তিহীন পদ দ্বারা গঠিত ক্রিয়া বিশেষণ : উদাহরণ – নিশ্চয় 'নিশ্চয়', খালি 'শুধু', ব্যাকিলামাদে 'ক্রমাগত', আজি 'আজ', কালি 'কাল' ইত্যাদি।

(২) সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত পদ যোগে ক্রিয়া বিশেষণ : উদাহরণ – ভিরে 'ধীরে', আস্তে 'আস্তে', এইটে 'এখানে', ওইটে 'ওখানে', সুখে 'সুখে', জোরে 'জোরে' নিচোত্ 'নীচে' ইত্যাদি।

(৩) –'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে গঠিত ক্রিয়া বিশেষণ : উদাহরণ – ক্যাঙ্করি 'কেমন করে', ভাল্ করি 'ভালো করে', হন্ হন্ করিয়া 'হন্ হন্ করে', নাচি 'নেচে', হাসি 'হেসে', ঢোল্ ঢোল্ করি 'শিথিল ভাবে' ইত্যাদি।

(৪) –'কলে' যোগে গঠিত ক্রিয়া বিশেষণ : উদাহরণ – চলিতে কলে 'চলা যায়', দেখিতে কলে 'দেখা যায়', দিতে কলে 'দিবা যায়' ইত্যাদি।

(৫) –'দিয়া' যোগে গঠিত ক্রিয়া বিশেষণ : উদাহরণ – ওতকৃতি দিয়া 'প্রণাম পূর্বক', আউলি-দিয়া 'এলো মেলো করে দিয়ে', ধাসে দিয়া 'ঘেসে দিয়ে' ইত্যাদি।

(৬) 'মোতোন্', 'চক্', 'নাকান্', প্রত্যয়ান্ত পদ দ্বারা গঠিত ক্রিয়াবিশেষণ : উদাহরণ – ভাল্ মোতোন্ 'ভাল মত', ঠিক্মোতোন্ 'ঠিক মত', এই চক্ 'এইরকম', এই নাকান্ 'এইরকম', সেইচক্ 'সেইরকম', আস্তুরা মোতোন্ 'অল্প মত' ইত্যাদি।

(৭) বীপ্সা অর্থে শব্দদ্বৈত দ্বারা গঠিত ক্রিয়া বিশেষণ : উদাহরণ – বারে বারে 'বারে বারে', ভিরে ভিরে 'ধীরে ধীরে', আস্তে আস্তে 'আস্তে আস্তে', নাচিতে নাচিতে 'নাচতে নাচতে', কান্দিতে কান্দিতে 'কাঁদতে কাঁদতে', দেখিতে দেখিতে 'দেখতে দেখতে' ইত্যাদি।

জ্যামোন্ ত্যামোন্ 'যেমন তেমন', জেইটে সেইটে 'যেখানে সেখানে', জিদি দিদি 'যেদিকে সেদিকে', জ্যালায় খ্যালায় 'যখন তখন' ইত্যাদি পরস্পর সাপেক্ষ শব্দযোগে গঠিত ক্রিয়া বিশেষণকেও এই শ্রেণী-

তুক্ত ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

সংখ্যাসূচক শব্দ বা বিশেষণ

গণন সংখ্যা

(১)	অ্যাক্	২৬	ছাব্বিশ
২	দুই	২৭	শাতাইশ্
৩	তিন্	২৮	আটাইশ্
৪	চাইর্	২৯	উন্তিরিশ্
৫	পাচ্	৩০	তিরিশ্
৬	ছয়	৩১	অ্যাক্তিরিশ্
৭	শাত্	৩২	বত্তিরিশ্
৮	আট্	৩৩	তেত্তিরিশ্
৯	নও	৩৪	চোউতিরিশ্
১০	দশ্	৩৫	পইন্তিরিশ্
১১	অ্যাগারো	৩৬	ছত্তিরিশ্
১২	বারো	৩৭	শাইন্তিরিশ্
১৩	তারো	৩৮	আট্তিরিশ্
১৪	চইদ্দো	৩৯	উনচল্লিশ্
১৫	পোনারো	৪০	চল্লিশ্
১৬	শোবদো	৪১	অ্যাকচল্লিশ্
১৭	শোতোরো	৪২	বেয়াল্লিশ্
১৮	আঠারো	৪৩	তেতাল্লিশ্
১৯	ঊনিশ্	৪৪	চুয়াল্লিশ্
২০	বিশ্	৪৫	পয়চল্লিশ্
২১	অ্যাকোইশ্	৪৬	ছয়চল্লিশ্
২২	বাইশ্	৪৭	শাতচল্লিশ্
২৩	তেইশ্	৪৮	আটচল্লিশ্
২৪	চব্বিশ্	৪৯।	উনোপঞ্চাশ
২৫	পচিশ্	৫০	পঞ্চাশ্

৫১	অ্যাক্স্নানহুনা	৭৮	আটাতহুতার্
৫২	বাহানহুনা	৭৯	উনোআশি
৫৩	তেহ্রানহুনা	৮০	আশি
৫৪	চুয়ানহুনা	৮১	আকাশি
৫৫	পচ্‌চানহুনা	৮২	বেয়াশি
৫৬	ছাপ্পানহুনা	৮৩	তেয়াশি
৫৭	সাতানহুনা	৮৪	চুয়াশি
৫৮	আটানহুনা	৮৫	পচাশি
৫৯	উনোসাইট্	৮৬	ছেয়াশি
৬০	সাইট্	৮৭	সাতাশি
৬১	অ্যাক্সট্টি	৮৮	আটাশি
৬২	বাসট্টি	৮৯	উনোনব্বোই
৬৩	তেসট্টি	৯০	নব্বোই
৬৪	চোউসট্টি	৯১	আকানব্বোই
৬৫	পয়ুসট্টি	৯২	বেয়ানব্বোই
৬৬	ছেসট্টি	৯৩	তেয়ানব্বোই
৬৭	সাসট্টি	৯৪	চুয়ানব্বোই
৬৮	আসট্টি	৯৫	পচানব্বোই
৬৯	উনোসোয়াত্তুতার্	৯৬	ছেয়ানব্বোই
৭০	সোয়াত্তুতার্	৯৭	সাতানব্বোই
৭১	অ্যাকাত্তুতার্	৯৮	আটানব্বোই
৭২	বাহাত্তুতার	৯৯	নিয়ানব্বোই
৭৩	তেহাত্তুতার্	১০০	স, অ্যাক্স্
৭৪	চুয়াত্তুতার	১০০০	হাজার
৭৫	পচাত্তুতার্	১০০০০	অজুত্
৭৬	ছেয়াত্তুতার্	১০০০০০	লাখ্
৭৭	সাতাত্তুতার্	১০০০০০০০	কুটি

ক্রমবাচক শব্দ

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ক্রমবাচক শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মোটামুটিভাবে চার পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলিকে পরিবর্তিত করে চারটি ক্রমবাচক শব্দ এই উপভাষায় ব্যবহার করা হয়। এই ক্রমবাচকগুলি হ'ল –

পহেলা 'প্রথম'

দোসোরা 'দ্বিতীয়'

তেসোরা 'তৃতীয়'

চৌঠা 'চতুর্থ'

এর পর, অর্থাৎ পাঁচ থেকে আঠারো পর্যন্ত ক্রমবাচক শব্দ গঠনে মৌলিক সংখ্যার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এক্ষেত্রে মৌলিক সংখ্যার সঙ্গে 'ই' প্রত্যয় যোগ করে ক্রমবাচক শব্দ গঠিত হয়। উদাহরণ–

পাচ্+ই=পাচোই 'পঞ্চম'

সাত্+ই=সাতোই 'সপ্তম'

অ্যাগারো+ই=অ্যাগারোই 'একাদশ'

আঠারো+ই=আঠারোই 'অষ্টাদশ' ইত্যাদি।

উনিশ থেকে শুরু করে আটচল্লিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে ক্রমবাচক শব্দ গঠন করা হয়। উদাহরণ–

উনোচল্লিশ্+আ=উনোচল্লিশা ' উনচল্লিশ সংখ্যক'

উনিশ্+আ=উনিশা 'উনিশ সংখ্যক'

চল্লিশ্+আ=চল্লিশা 'চল্লিশ সংখ্যক' ইত্যাদি।

আটচল্লিশ থেকে একশ পর্যন্ত ক্রমবাচক শব্দ গঠনে মৌলিক সংখ্যার সঙ্গে 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়। উদাহরণ–

পন্চাশ্+ইয়া = পন্চাশিয়া 'পঞ্চাশ সংখ্যক'

বাহাত্তোর+ইয়া=বাহাত্তোরিয়া 'বাহাত্তর সংখ্যক' ইত্যাদি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মূলতঃ মাসের তারিখ গণনার জন্যই এই উপভাষায় ক্রমবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই কারণে বত্রিশ পর্যন্তই ক্রমবাচকের ব্যবহার এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচলিত। ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে ক্রমবাচক প্রয়োগের রীতি এই উপভাষায় নেই।

সন্তান বা ভাই বোনের ক্রম বোঝাতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ক্রমবাচকগুলি এই উপভাষায় ব্যবহৃত হয়।

পইলা বা বড়ো 'প্রথম বা বড়'

বড়ো মাজ্‌ কিলা 'বড় মেজ'

মাজ্‌ কিলা 'মেজ'

ছোটো মাজ্‌ কিলা 'ছোট মেজ'

ছোক্কী 'সর্বশেষ' ইত্যাদি।

গুণবাচক

সাধারণভাবে যৌগিক সংখ্যার সঙ্গে অন্য শব্দ যোগ করে এই উপভাষায় গুণবাচক শব্দ গঠন করা হয়। উদাহরণ–

অ্যাকবার্‌ 'একবার'

দুইবার্‌ 'দু'বার'

তিন্‌বার্‌ 'তিনবার' ইত্যাদি। আবার গুণবাচক দুই হলে দুকুনা, তিন হলে তিরিকা, চার হলে চাইরা, পাঁচ হলে পাচা, ছয় হলে ছয়া ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ–

২×২ = দুই দুকুনা

৩×৩ = তিন্‌ তিরিকা

৪×৪ = চাইর্‌ চাইরা

৫×৫ = পাচ্‌ পাচা

৬×৬ = ছয় ছয়া ইত্যাদি।

ভগ্নাংশসূচক শব্দ

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত ভগ্নাংশসূচক শব্দগুলি প্রায় শিষ্ট বাংলারই অনুরূপ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ–

পোয়া 'এক চতুর্থাংশ'

আদ্‌ 'দুই চতুর্থাংশ'

পওনে 'তিন চতুর্থাংশ'

সাড়ে 'একটি অভগ্ন সংখ্যা এবং অর্ধেক'

ডাড়্‌ 'এক এবং অর্ধেক'

আড়াই 'দুই এবং অর্ধেক' ইত্যাদি।

তুলনা অথবা তর, তম বোধক শব্দ সমূহ

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় Comparative বা Superlative degree বোঝানোর জন্য শব্দের পৃথক কোনো রূপ নেই। বিশেষণে বিশেষ প্রত্যয় যোগ করার রীতিও এই উপভাষায় প্রচলিত নয়। এক্ষেত্রে বিশেষণটিকে অবিকৃত রেখে, উপমানকে, 'হাতে', 'থাকি', 'চায়া' ইত্যাদি পদানুগী অব্যয় যোগ করে পঞ্চমী বিভক্তিতে নিয়ে আসা হয় এবং বিশেষণটিকে উপমেয়ের বিধেয় হিসেবে পরে স্থাপন করে তুলনার ভাব প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ-

নাই মামা হাতে কানা মামা ভাল, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'

নাই মামার্ থাকি কানা মামা ভাল, 'নাই মামার থেকে কানা মামা ভাল'

নাই মামার্ চায়া কানা মামা ভাল, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' ইত্যাদি।

উৎকর্ষ বা অপকর্ষের আধিক্য বিশেষভাবে জ্ঞাপন করতে হলে, অথবা পার্থক্যের আধিক্য বা অল্পতা বোঝাতে হলে উপমানকে অপাদান কারকে স্থাপন করে 'অনেক্', 'বেশি', 'কোনেক' ইত্যাদি বিশেষণের বিশেষণকে মূল বিশেষণের আগে বসাতে হয় এবং এক্ষেত্রে বিশেষণ উপমেয়ের বিধেয় হিসেবে পরে বসে। উদাহরণ-

তুই হাতে মুই ভাল, 'তোমার চেয়ে আমি ভাল'

তোর্ চায়া মুই বেশি ভাল, 'তোমার চেয়ে আমি বেশী ভাল'

উমার্ থাকি তুই কোনেক্ গরিব, 'তার থেকে তুমি কিছুটা গরীব' ইত্যাদি।

অনেক পদার্থ, বিষয় বা ব্যক্তির মধ্যে একটির বা একজনের শ্রেষ্ঠতা বোঝাতে হলে উপমানের পরিবর্তে সাকল্য বাচক শব্দ 'সগা' ব্যবহৃত হয় এবং এই সাকল্যবাচক শব্দ 'সগা'-কে সপ্তমী বিভক্তিতে স্থাপন করতে হয়। এক্ষেত্রেও উপমেয়ের বিশেষণ পদটি সব শেষে বসে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই 'সগা' কে অপাদান কারকে স্থাপন করেও এই ভাব প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ-

তুই সগাতে ভাল, 'তুমি সকলের চেয়ে ভাল'

গঙ্গা সগারে থাকি বড়ো নদি 'গঙ্গা সব চাইতে বড় নদী' ইত্যাদি।

তুলনা বা সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের ভাব বোঝাতে উপমানকে সপ্তমী বিভক্তিতে স্থাপন করার ক্ষেত্রে অনেক সময় 'ত' বিভক্তিও ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

মুই তোত্ ভাল, 'আমি তোমার চেয়ে ভাল'

তুই মোত্ বয়া 'তুমি আমার চেয়ে খারাপ' ইত্যাদি।

অন্য একটি পদ্ধতিতে উপমানকে সম্বন্ধ কারকে স্থাপন করে 'হাতে', 'থাকি', 'চায়া', ইত্যাদি অনুসর্গ বা যৌগিক শব্দ 'চক্', 'নাকান্', 'মোতোন্' ইত্যাদিকে উপমানের বিশেষণের আগে বসানো হয়

এবং বিশেষণটি সবশেষে বসে। উদাহরণ—

তোর্ বাকি উয়ায় ভাল্, 'তোমার থেকে সে ভাল'

তোর্ চক্ ভাল্, 'তোমার মত ভাল'

মুই তোর্ মোতোন্ নোহাও 'আমি তোমার মত নই' ইত্যাদি।

সর্বনাম

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কারক, বিভক্তি এবং সর্বনামের সম্পর্ক বিশেষ্যের মতই। সাধারণভাবে এই উপভাষায় কারক এবং বচনভেদেই সর্বনামের রূপভেদ ঘটে থাকে। তবে মধ্যম এবং প্রথম পুরুষের সর্বনামে তুচ্ছার্থে এবং সম্ভ্রমার্থে পৃথক পৃথক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে লিঙ্গভেদে সর্বনামের রূপে কোনো প্রকার পার্থক্য এই উপভাষায় ঘটে না। একমাত্র নির্দেশক সর্বনামের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য ঘটে থাকে। নির্দেশক সর্বনামের পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গে একই সর্বনাম ব্যবহৃত হলেও ক্লীবলিঙ্গের ক্ষেত্রে পৃথক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়।

প্রচলিত সর্বনামগুলির প্রায় সমস্তই প্রাচীন এবং মধ্যভারতীয় আর্য স্তরে প্রচলিত বিভিন্ন সর্বনামের বিবর্তিত রূপ মাত্র। যেমন উত্তম পুরুষের সর্বনাম 'মুই'। এই সর্বনামটি সংস্কৃত 'অস্মদ' শব্দের তৃতীয়ার একবচনের রূপ 'ময়া' থেকে নিষ্পন্ন। প্রাচীন বাংলায় এই পদটির করণ কারকের অর্থ বজায় ছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই পদটির করণ কারকের অর্থ বিলুপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে পদটি কর্তৃ কারকের অর্থে প্রযুক্ত হয়।

সর্বনামগুলির সমস্তই সরাসরিভাবে প্রথমা, দ্বিতীয়া, চতুর্থী এবং ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন গ্রহণ করতে পারে এবং স্বতন্ত্র কোনো অনুসর্গ যোগ না করে সমস্ত সর্বনামপদের কর্তৃ, কর্ম-সম্প্রদান, এবং সম্বন্ধ, এই তিনটি কারকের রূপ পাওয়া যায়। তবে বস্তুবাচক নির্দেশক সর্বনামগুলি একটি অতিরিক্ত বিভক্তি, তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্নও সরাসরিভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং পৃথক কোনো অনুসর্গ যোগ না করেই এই জাতীয় সর্বনামগুলির কর্তৃ, কর্ম-সম্প্রদান, সম্বন্ধ এবং অধিকরণ, এই চারটি কারকের রূপ পাওয়া যায়। অন্যান্য কারকের ভাব বোঝানোর জন্য বিভক্তি ছাড়াও সর্বনামের সঙ্গে একাধিক অনুসর্গ যোগ করা হয়। নিম্নে এই উপভাষায় প্রচলিত প্রধান প্রধান সর্বনামগুলির রূপভেদ প্রদর্শিত হ'ল।

পুরুষবাচক সর্বনাম

উত্তম পুরুষ : মুই 'আমি'

	একবচন	বহুবচন	দ্বিগুণাত্ম বহুবচন
কর্তৃ -	মুই	আমরা, আমা	আমরালা, আমরাগিলা
কর্ম -	মোক্	আমাক্	আমাকলাক্, আমাকগিলাক্
করণ	মোক্ দিয়া, মোর্ দারা	আমাক্ দিয়া, আমার্ দারা	আমাকলাক্ দিয়া, আমাকগিলাক্ দিয়া, আমারলার্ দারা, আমারগিলার্ দারা
সম্প্রদান-	মোক্	আমাক্	আমাকলাক্, আমাকগিলাক্
অপাদান-	মোরঠে হাতে/থাকি	আমারঠে হাতে/থাকি	আমারলারঠে হাতে/থাকি, আমারগিলারঠে হাতে/থাকি
সম্বন্ধ-	মোর্	আমার্	আমারলার্, আমারগিলার্
অধিকরণ -	মোরঠে	আমারঠে	আমারলারঠে, আমারগিলারঠে

মধ্যম পুরুষ : তুই 'তুই, তুমি'

	একবচন	বহুবচন	দ্বিগুণাত্ম বহুবচন
কর্তৃ	তুই	তোমরা, তোমা	তোমরালা, তোমরাগিলা
কর্ম	তোক্	তোমাক্	তোমাকলাক্, তোমাকগিলাক্
করণ-	তোক্ দিয়া, তোর্ দারা	তোমাক্ দিয়া, তোমার্ দারা	তোমাকলাক্ দিয়া, তোমাকগিলাক্ দিয়া, তোমারলার্ দারা, তোমারগিলার্ দারা
সম্প্রদান	তোক্	তোমাক্	তোমাকলাক্, তোমাকগিলাক্
অপাদান -	তোরঠে হাতে/থাকি	তোমারঠে হাতে/থাকি	তোমারলারঠে হাতে/থাকি, তোমারগিলারঠে হাতে/থাকি
সম্বন্ধ-	তোর্	তোমার্	তোমারলার্, তোমারগিলার্
অধিকরণ -	তোরঠে	তোমারঠে	তোমারলারঠে, তোমারগিলারঠে

প্রথম পুরুষ : উয়ায় 'সে'

	একবচন	বহুবচন	দ্বিত্বপ্রাপ্ত বহুবচন
কর্তৃ -	উয়ায়	উমুরা, উমা	উমুরালা, উমুরাগিলা
কর্ম -	উয়াক্	উমাক্	উমাক্লাক্, উমাক্গিলাক্
করণ -	উয়াক্ দিয়া, উয়ার্ দারা	উমাক্ দিয়া, উমার্ দারা	উমাক্লাক্ দিয়া, উমাক্গিলাক্ দিয়া, উমার্লার্ দারা, উমার্গিলার্ দারা
সম্প্রদান -	উয়াক্	উমাক্	উমাক্লাক্, উমাক্গিলাক্
অপাদান -	উয়ারঠে হাতে/থাকি	উমারঠে হাতে/থাকি	উমার্লারঠে হাতে/থাকি, উমার্গিলারঠে হাতে/থাকি
সম্বন্ধ -	উয়ার্	উমার্	উমার্লার্, উমার্গিলার্
অধিকরণ -	উয়ারঠে	উমারঠে	উমার্লারঠে, উমার্গিলারঠে

প্রথম পুরুষ : তায় 'সে'

	একবচন	বহুবচন	দ্বিত্বপ্রাপ্ত বহুবচন
কর্তৃ -	তায়	তায় তায়	-
কর্ম -	তাক্	তাক্ তাক্	-
করণ -	তাক্ দিয়া, তার্ দারা	তাক্ তাক্ দিয়া, তার্ তার্ দারা	-
সম্প্রদান -	তাক্	তাক্ তাক্	-
অপাদান -	তারঠে হাতে/থাকি	তার্ তারঠে হাতে/থাকি	-
সম্বন্ধ -	তার্	তার্ তার্	-
অধিকরণ -	তারঠে	তার্ তারঠে	-

পুরুষবাচক নিকট নির্দেশক সর্বনাম : ইয়ায় 'এই ব্যক্তি'

	একবচন	বহুবচন	দ্বিত্বপ্রাপ্ত বহুবচন
কর্তৃ -	ইয়ায়	ইমরা, ইমা	ইমরালা, ইমরাগিলা
কর্ম -	ইয়াক্	ইমাক্	ইমাক্লাক্, ইমাক্গিলাক্
করণ -	ইয়াক্ দিয়া, ইয়ার্ দারা	ইমাক্ দিয়া, ইমার্ দারা	ইমাক্লাক্ দিয়া, ইমাক্গিলাক দিয়া ইমার্লার্ দারা, ইমার্গিলার্ দারা
সম্প্রদান -	ইয়াক্	ইমাক্	ইমাক্লাক্, ইমাক্গিলাক্
অপাদান -	ইয়ারঠে হাতে/থাকি	ইমারঠে হাতে/থাকি	ইমার্লারঠে হাতে/থাকি ইমার্গিলারঠে হাতে/থাকি
সম্বন্ধ	ইয়ার্	ইমার্	ইমার্লার্, ইমার্গিলার্
অধিকরণ -	ইয়ারঠে	ইমারঠে	ইমার্লারঠে, ইমার্গিলারঠে

নিকট নির্দেশক বস্তুবাচক সর্বনাম ঃ এই 'এই'

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ -	এই	এইলা, এইগিলা
কর্ম -	এইটা, এই	এইলা, এইলাক্, এইগিলা, এইগিলাক্
করণ -	এইটা দিয়া, এইটার্‌দারা	এইলা দিয়া, এইগিলা দিয়া, এইলার্‌দারা এই গিলার্‌দারা
সম্প্রদান -	এইটাক্	এইলাক্, এইগিলাক্
অপাদান -	এইটা হাতে/থাকি	এইলা হাতে/থাকি, এইগিলা হাতে/থাকি
সম্বন্ধ -	এইটার্	এইলার্, এইগিলার্
অধিকরণ -	এইটাত্	এইলাত্, এইগিলাত্

দূর নির্দেশক বস্তুবাচক সর্বনাম ঃ ওই 'ঐ'

কর্তৃ -	ওই	ওইলা, ওইগিলা
কর্ম -	ওইটা, ওইটাক্	ওইলা, ওইলাক্, ওইগিলা, ওইগিলাক্
করণ -	ওইটা দিয়া, ওইটার্ দারা	ওইলা দিয়া, ওইগিলা দিয়া, ওইলার্ দারা, ওইগিলার্ দারা
সম্প্রদান -	ওইটাক্	ওইলাক্, ওইগিলাক্
অপাদান -	ওইটা হাতে/থাকি	ওইলা হাতে/থাকি, ওইগিলা হাতে/থাকি
সম্বন্ধ -	ওইটার্	ওইলার্, ওইগিলার্
অধিকরণ -	ওইটাত্	ওইলাত্, ওইগিলাত্

পুরুষবাচক সাপেক্ষ সর্বনাম ঃ জায় 'যে'

কর্তৃ -	জায়	জায় জায়
কর্ম -	জাক্	জাক্ জাক্
করণ -	জাক্ দিয়া, জার্ দারা	জাক্ জাক্ দিয়া, জার্ জার্ দারা
সম্প্রদান -	জাক্	জাক্ জাক্
অপাদান -	জারটে হতে/থাকি	জার্ জারটে হতে/থাকি
সম্বন্ধ -	জার্	জার্ জার্
অধিকরণ -	জারটে	জার্ জারটে

বস্তুবাচক সার্বেঃ সর্বনাম : জা 'যা'

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ -	জা	জা জা
কর্ম -	জা, জাক্	জাজা, জাক্ জাক্
করণ -	জা দিয়া, জাক্ দিয়া, জার্ দারা	জা জা দিয়া, জাক্ জাক্ দিয়া, জার্ জার্ দারা
সম্প্রদান -	জাক্	জাক্ জাক্
অপাদান -	জা হাতে/থাকি	জা জা হাতে/থাকি
সম্বন্ধ -	জার্	জার্ জার্
অধিকরণ -	জাত্	জাত্ জাত্

প্রশ্নসূচক পুরুষবাচক সর্বনাম : কায় 'কে'

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ -	কায়	কায় কায়
কর্ম -	কাক্	কাক্ কাক্
করণ -	কাক্ দিয়া, কার্ দারা	কাক্ কাক্ দিয়া, কার্ কার্ দারা
সম্প্রদান -	কাক্	কাক্ কাক্
অপাদান -	কারটে হাতে/থাকি	কার্ কারটে হাতে/থাকি
সম্বন্ধ -	কার্	কার্ কার্
অধিকরণ -	কারটে	কার্ কারটে

প্রশ্নসূচক বস্তুবাচক সর্বনাম : কি 'কী'

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ -	কি	কি কি
কর্ম -	কি, কিসোক্	কি কি, কিসোক্ কিসোক্
সম্প্রদান -	কি দিয়া, কিসের্ দারা	কি কি দিয়া, কিসের্ কিসের্ দারা
অপাদান্ -	কি হাতে/থাকি	কি কি হত হাতে/থাকি
সম্বন্ধ -	কিসের্	কিসের্ কিসের্
অধিকরণ -	কিসোত্	কিসোত্ কিসোত্

প্রশ্নসূচক বস্তুবাচক সর্বনাম : কোন্ 'কোন'

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ -	কোন্	কোনগিলা
কর্ম -	কোনটা, কোনটাক্	কোনগিলা, কোনগিলাক্
করণ -	কোনটা দিয়া, কোনটার্ দারা, কোনটাক্ দিয়া	কোনগিলা দিয়া, কোনগিলার্ দারা, কোনগিলাক্ দিয়া

	একবচন	বহুবচন
সম্প্রদান-	কোনটাক্	কোন্‌গিলাক্
অপাদান্-	কোনটা হাতে/থাকি	কোন্‌গিলা হাতে/থাকি
সম্বন্ধ -	কোনটার্	কোন্‌গিলার্
অধিকরণ -	কোনটাত্	কোন্‌গিলাত্

অনির্দিষ্টতা সূচক পুরুষবাচক সর্বনাম ঃ কারো 'কেউ'

কর্তৃ -	কারো	কারো কারো
কর্ম -	কারো	কারো কারো
করণ-	কারো দিয়া, কারো দ্বারা	কারো কারো দিয়া, কারো কারো দ্বারা
সম্প্রদান -	কারো	কারো কারো
অপাদান -	কারোটে হাতে/থাকি	কারো কারোটে হাতে/থাকি
সম্বন্ধ -	কারো	কারো কারো
অধিকরণ -	কারোটে	কারো কারোটে

অনির্দিষ্টতাসূচক বস্তুবাচক সর্বনাম ঃ কিছু 'কিছু'

কর্তৃ -	কিছু	কিছু কিছু
কর্ম -	কিছু, কিছুক্	কিছু, কিছুক্
করণ -	কিছু দিয়া, কিছুর্ দ্বারা	কিছু কিছু দিয়া, কিছু কিছুর্ দ্বারা
সম্প্রদান -	কিছুক্	কিছু কিছুক্
অপাদান -	কিছু হাতে/থাকি	কিছু কিছু হাতে/থাকি
সম্বন্ধ -	কিছুর্	কিছু কিছুর্
অধিকরণ -	কিছুত্	কিছু কিছুত্

আত্মবাচক সর্বনাম ঃ নিজ্ 'নিজ'

কর্তৃ -	নিজে	নিজে নিজে
কর্ম -	নিজোক্	নিজোক্ নিজোক্
করণ -	নিজোক্ দিয়া, নিজের্ দ্বারা	নিজোক্ নিজোক্ দিয়া, নিজের্ নিজের্ দ্বারা
সম্প্রদান -	নিজোক্	নিজোক্ নিজোক্
অপাদান -	নিজেরটে হাতে/থাকি	নিজেরটে নিজেরটে হাতে/থাকি
সম্বন্ধ -	নিজের্	নিজের্ নিজের্
অধিকরণ -	নিজেরটে	নিজের্ নিজেরটে

আত্মবাচক সর্বনাম ঃ আপোন্ 'আপন'

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ -	আপোনে	আপোনে আপোনে
কর্ম -	আপোন্রাক্	আপোন্ আপোন্রাক্
করণ -	আপোন্রাক্ দিয়া, আপোন্রার্ দারা	আপোন্ আপোন্রাক্ দিয়া, আপোন্ আপোন্রার দারা
সম্প্রদান -	আপোন্রাক্	আপোন্ আপোন্রাক্
অপাদান -	আপোন্রাট্টে হাতে/থাকি	আপোন্ আপোন্রাট্টে হাতে/থাকি
সম্বন্ধ -	আপোন্, আপোন্রার্	আপোন্ আপোন্, আপোন্ আপোন্রার্
অধিকরণ -	আপোন্রাট্টে	আপোন্ আপোন্রাট্টে

মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমবাচক সর্বনাম ঃ তোমরা 'আপনি, আপনারা'

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমবাচক সর্বনামের পৃথক কোনো রূপ নেই। এক্ষেত্রে মধ্যম পুরুষের সাধারণ সর্বনাম 'তুই'-এর বহুবচনের রূপটিই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এই জাতীয় সর্বনামের কোনো বহুবচনের রূপ নেই। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহুবচনের দ্বিত্ব ঘটিয়ে বহুবচন বোঝানো হয়ে থাকে।

	একবচন	দ্বিত্বপ্রাপ্ত বহুবচন
কর্তৃ -	তোমরা, তোমা	তোমরা গিলা
কর্ম -	তোমাক্	তোমাক্ গিলাক্
করণ -	তোমাক্ দিয়া, তোমার্ দারা	তোমাক্ গিলাক্ দিয়া, তোমার্ গিলার্ দারা
সম্প্রদান -	তোমাক্	তোমাক্ গিলাক্
অপাদান্ -	তোমারট্টে হাতে/থাকি	তোমার্ গিলারট্টে হাতে/থাকি
সম্বন্ধ -	তোমার্	তোমার্ গিলার্
অধিকরণ -	তোমারট্টে	তোমার্ গিলারট্টে

প্রথম পুরুষের সম্ভ্রমবাচক সর্বনাম ঃ তোমরা 'তিনি, তাঁরা'

	একবচন	দ্বিত্বপ্রাপ্ত বহুবচন
কর্তৃ -	উমরা, উমা	উমরা গিলা
কর্ম -	উমাক্	উমাক্ গিলাক্
করণ -	উমাক্ দিয়া, উমার্ দারা	উমাক্ গিলাক্ দিয়া, উমার্ গিলার্ দারা
সম্প্রদান -	উমাক্	উমাক্ গিলাক্
অপাদান -	উমারট্টে হাতে/থাকি	উমার্ গিলারট্টে হাতে/থাকি

	একবচন	দ্বিত্বপ্রাপ্ত বহুবচন
সম্বন্ধ -	উমার্‌	উমার্‌ দিগার্‌
অধিকরণ-	উমারটে	উমার্‌ দিগারটে

লক্ষণীয় যে প্রথম পুরুষের সম্বন্ধবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে এখানেও প্রথম পুরুষের সাধারণ সর্বনামের বহুবচনের রূপই ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এক্ষেত্রেও এই সর্বনামের একবচন এবং বহুবচনের রূপ অভিন্ন।

উত্তম পুরুষের সর্বনামের কোনো সম্ভ্রমবাচক রূপ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় নেই। তবে কোথাও কোথাও উত্তম পুরুষের সর্বনামের বহুবচনের রূপ গৌরবার্থে, একবচনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- না খাই হামা খাইকের গুয়া, দাড়ি মুড়িয়ে (গ্রাম্য ছড়া) 'আমি খাইকের দেওয়া পান খাইনা, তাতে দাড়ি গোজা হয়েছে'। এখানে একবচন হওয়া সত্ত্বেও সর্বনামের বহুবচনের রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এই জাতীয় প্রয়োগ উত্তরবঙ্গের মহিলাদের ভাষায় সর্বাধিক।

ক্রিয়া ধাতু

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় প্রচলিত সমস্ত ক্রিয়াধাতুগুলিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে (১) সিদ্ধ ধাতু এবং (২) সাধিত ধাতু, এই দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই দুটি প্রধান ভাগকে তিনি আবার একাধিক শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। এই বিভাজন অনুসারে সিদ্ধ ধাতুগুলি উৎপত্তির দিক থেকে (ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সিদ্ধ ধাতু (তদ্ভব), (খ) মূল প্রাচীন ভারতীয় নিজন্ত ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত সিদ্ধ ধাতু, (গ) সংস্কৃত থেকে আগত সিদ্ধ ধাতু (তৎসম, অর্ধতৎসম) এবং (ঘ) অজ্ঞাতমূল সিদ্ধ ধাতু (দেশী), এই কটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত হতে পারে। অনুরূপভাবে সাধিত ধাতুগুলিকেও (ক) -আ প্রত্যয়ান্ত নিজন্ত ধাতু, (খ) নামধাতু, (গ) সংযোগমূলক ও প্রত্যয়ান্ত ধাতু (তদ্ভব) এবং (ঘ) ধ্বন্যাত্মক ধাতু, এই কটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। এর মধ্যে ধাতুগুলির প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সিদ্ধ ধাতুগুলিকে (১) উপসর্গহীন সরল ধাতু এবং (২) উপসর্গযুক্ত ধাতু, এই দুটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে নামধাতুগুলিকেও তিনি উৎপত্তির দিক থেকে (১) দেশী (তদ্ভব), (২) তৎসম এবং (৩) বিদেশী, এই তিনটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। আবার দেশী নামধাতুগুলিকে তিনি (ক) প্রাচীন (উত্তরাধিকৃত) এবং (খ) মধ্য ও আধুনিক বাংলা (উদ্ভূত), এই দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন।[২]

---

(২) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭৫ ভল্যুম - ২, পৃঃ ৮৪০-৮৭২

যে কোনো নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রচলিত ক্রিয়াধাতু সমূহের উৎপত্তি নির্ধারণ এবং শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই মত প্রযুক্ত হতে পারে। আর উত্তরবঙ্গের উপভাষা যেহেতু বাংলারই একটি উপভাষা, তাই তার ক্ষেত্রে এই মতের প্রাসঙ্গিকতা অপেক্ষাকৃত বেশী এবং আলোচ্য বিষয়টিতে বাংলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। এই সাদৃশ্যের উপরে ভিত্তি করে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত ক্রিয়াধাতুগুলিকে নিম্নানুরূপ শ্রেণীগুলিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

(১) সিদ্ধ ধাতু

(ক) উত্তরাধিকৃত বা তদ্ভব

(ক ১) উপসর্গহীন সরল ধাতু

(ক ২) উপসর্গযুক্ত ধাতু

(খ) মূল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ণিজন্ত ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত সিদ্ধ ধাতু

(গ) সন্দিগ্ধমূল বা দেশী ধাতু

(২) সাধিত ধাতু

(ক) ণিজন্ত ধাতু

(খ) নামধাতু

(গ) সংযোগমূলক ধাতু

(ঘ) ধ্বন্যাত্মক ধাতু

(ঘ ১) -আ প্রত্যয়ান্ত

(ঘ ২) সংযোগমূলক

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা ভাষার গঠন সম্পূর্ণ হওয়ার পরে সাহিত্যচর্চার সূত্রে বহু সংস্কৃত ধাতু অবিকৃতভাবে বাংলাভাষায় গৃহীত হয়েছে। মূলতঃ ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাধকরা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর কতিপয় অভিধান সাহিত্যিক এই ভাবে বাংলাভাষায় বহু সংস্কৃত ধাতুর প্রচলন ঘটিয়েছেন।[৩] এই জাতীয় ধাতুর মধ্যে যেগুলি অবিকৃতভাবে বাংলাভাষায় প্রচলিত সেগুলিকে তৎসম এবং যেগুলি তাদের মূল রূপ থেকে ঈষৎ বিকৃত অবস্থায় প্রচলিত সেগুলিকে তিনি অর্ধতৎসম ধাতু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সাহিত্যচর্চা বিশেষ হয়নি। তাই এই সূত্রে কোনো সংস্কৃত ধাতু এই উপভাষায় আসেনি বলেই অনুমান করা যায়। প্রাচীন এবং

---

(৩) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭০, ভল্যুম -২, পৃঃ ৮৭৯

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু ধাতু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রায় অবিকৃত অবস্থায় থেকে গিয়েছে। এই ধাতুগুলিকেই এই উপভাষায় প্রচলিত অর্ধতৎসম ধাতু বলে চিহ্নিত করা চলে। আর যেহেতু উত্তরাধিকৃত সমস্ত ধাতুই এই উপভাষার বাচকগোষ্ঠীর নিজস্ব উচ্চারণরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুনিশ্চিতভাবে অল্প বিস্তর পরিবর্তিত হয়েছে তাই এগুলির কোনোটিরই মূল রূপ আর বজায় নেই। সুতরাং তৎসম ধাতু বলতে যা বোঝায় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তা নেই। আবার মূল রূপ থেকে বিবর্তিত ধাতুগুলিকে যেহেতু সাধারণভাবে তদ্ভব ধাতু বলে চিহ্নিত করা হয় তাই আমাদের বিভাজনে তৎসম বা অর্ধতৎসম বলে পৃথক কোনো শ্রেণী রাখা হয়নি। এই জাতীয় ধাতুগুলিকে তদ্ভব ধাতুর তালিকাতেই রাখা হয়েছে।

বাংলায় ধ্বন্যাত্মক ধাতুর প্রচলন থাকলেও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তার বিচিত্রায়িত ব্যবহার বাংলা অপেক্ষা অনেক বেশী। দেখা গিয়েছে যে বাংলায় ধ্বন্যাত্মক ধাতুর রূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌগিক বা সংযোগমূলক। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ধ্বন্যাত্মক ধাতুর যৌগিক রূপের প্রচলন থাকলেও এক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তরে -আ প্রত্যয় যোগ করে যে রূপটি নিষ্পন্ন হয় তার সঙ্গে সরাসরিভাবে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ এই উপভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে -আ প্রত্যয় যোগ করে ধ্বন্যাত্মক ধাতুর রূপ নিষ্পন্ন করার রীতিও প্রচলিত। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে এই রীতিই এই উপভাষায় সর্বাধিক প্রচলিত। যেমন - বক্‌বক্‌+আ=বকবকা 'বক্‌বক্‌ করা', কিন্তু বাংলায় এই ধাতুটির রূপ হবে বক্‌বক্‌+√কর= বকবক্‌ কর্‌।

আলোচ্য ক্ষেত্রগুলি ছাড়া বাংলার সঙ্গে ক্রিয়াধাতুর ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের উপভাষার আর কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। নিম্নে এই উপভাষায় প্রচলিত প্রধান প্রধান ক্রিয়াধাতুগুলির বিবরণ দেওয়া হ'ল।

মিশ্র ধাতু : উত্তরাধিকৃত বা তদ্ভব

উপসর্গহীন সরল মিশ্র ধাতু সমূহ -

√অচৰ্‌ (√অর্চ) 'অর্চনা করা'
√অজর্‌ (√অর্জ) 'অর্জন করা'
√আছ্‌ (√অস্‌) 'অবস্থান করা'
√আখ্‌ (√রক্ষ) 'রাখা'
√আন্দ (√রন্ধ) 'রান্না করা'
√কর্‌ (√কৃ) 'করা'
√কান্দ্‌ (√ক্রন্দ্‌) 'কাঁদা'
√ক(কহ্‌) (√কথ্‌) 'বলা'

√কাট্ <√কর্ত> 'কাটা'

√কাপ্ <√কম্প্> 'কাঁপা'

√কিন্ <√ক্রী> 'কেনা'

√খা <√খাদ্> 'খাওয়া'

√খ্যালা <√খেল্> 'খেলা'

√গন্ <√গণ্> 'গণনা করা'

√গজ্জ <√গর্জ> 'গর্জন করা'

√চর্ <√চর্> 'চড়ে বেড়ানো'

√চল্ <√চল্> 'চলা'

√চ্যাত্ <√চিত্> 'জাগা'

√ছাড়্ <√ছর্দ> 'ত্যাগ করা'

√ছিড়্ <√ছিন্দ্> 'ছেঁড়া'

√ছ্যাচ্ <√সিঞ্চ্> 'সেচ করা'

√জপ্ <√জল্প্> 'জপ করা'

√জা <√যা> 'যাওয়া'

√জাচ্ <√যাচ্> 'চাওয়া বা প্রার্থনা করা'

√জাগ্ <√জাগৃ> 'জাগা'

√জি <√জীব্> 'বাঁচা'

√জিন্ <√জি> 'জয় করা'

√জল্ <√জ্বল্> 'জ্বলা'

√ঝুঝ্ <√যুধ্> 'যুদ্ধ করা'

√টান্ <√তান্> 'টানা'

√টুট্ <√ত্রুট্> 'শেষ হওয়া'

√ঢাক্ <√ঢাক্ক> 'ঢাকা'

√তর্ <√তৃ> 'উত্তীর্ণ হওয়া'

√তুল্ <√তুল্> 'তোলা'

√দুল্ <√দোল্> 'দোলা'

√দুষ্ <√দুষ্> 'দোষারোপ করা'

√দঙশ্ <√দংশ> 'কামড়ানো'

√দে	(√দা)	'দেওয়া'
√দ্যাখ্	(√দৃশ)	'দেখা'
√ধর্	(√ধৃ)	'ধরা'
√ধস্	(√ধ্বস্)	'ধসা'
√ধা	(√ধাব্)	'ধাবিত হওয়া'
√ধু	(√ধাব্)	'ধোয়া'
√ধিয়া	(√ধ্যা)	'ধ্যান করা'
√নে	(√নী)	'নেওয়া'
√লাগ্	(√লগ্)	'লাগা'
√লুঠ্	(√লুণ্ঠ্)	'লুণ্ঠন করা'
√ল্যাখ্	(√লিখ্)	'লেখা'
√পড়্	(√পত্)	'পতিত হওয়া'
√পচ্	(√পচ্)	'পচে যাওয়া'
√পি	(√পা)	'পান করা'
√পুছ্	(√প্রচ্ছ)	'জিজ্ঞাসা করা'
√পুজ্	(√পূজ্)	'পূজা করা'
√ফাট্	(√স্ফট্)	'ফেটে যাওয়া'
√ফাড়্	(√স্ফট্+ণিচ্)	'ছেঁড়া'
√ব	(√বহ্)	'বহন করা'
√বাট্	(√বণ্ট্)	'বণ্টন করা'
√বর্	(√বৃ)	'বরণ করা'
√বাচ্	(√বঞ্চ্)	'বাঁচা'
√বত্ত	(√বৃত্)	'বাঁচা'
√বান্ধ্	(√বন্ধ্)	'বাঁধা'
√বিন্ধ্	(√ব্যাধ্)	'বিদ্ধ হওয়া'
√বুঝ্	(√বুধ্)	'বোঝা'
√হ	(√ভূ)	'হওয়া'
√ভজ্	(√ভজ্)	'ভজনা করা'
√ভর্	(√ভৃ)	'ভর্তি হওয়া'

সন্দিগ্ধমূল বা দেশী ধাতু সমূহ

√আলা	'হাতের আঙুল দিয়ে মৃদুভাবে আঘাত করা'
√উঘট্টা	'অন্বেষণ করা'
√ওকা	'উদ্‌গীরণের চেষ্টা করা'
√উদুর্	'ঝুলে পড়া'
√ওথা	'বিচ্ছিন্ন হওয়া'
√ওদা	'অনিচ্ছুক হওয়া'
√উর্	'কাপড় গায়ে দেওয়া'
√কুট্	'খন্ড খন্ড করে কাটা'
√খচ্	'কাপড় ধোয়া'
√খচ্	'পা দিয়ে মাড়ানো'
√খাট্	'পরিশ্রম করা'
√খশ্	'খসে পড়া'
√খুল্	'খোলা'
√খাউজ্রা	'খামচানো'
√খোক্রা	'হাতের আঙুলের আগা দিয়ে মাটি খোঁড়া'
√ঘির্	'ঘেরা'
√চট্	'রেগে যাওয়া'
√চাচ্	'তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে কোনো কিছু কেটে পালিশ করা'
√চুচ্	'শেষ হওয়া'
√চিপ্	'চাপ দেওয়া'
√চাট্	'চাটা'
√ছাট্	'ছাঁটা'
√ছুপ্	'লুকনো'
√চুক্	'শেষ হওয়া'
√চুপ্‌রা	'জলে চোবানো'
√ছাদ্	'বন্দী করা'
√ছোলা	'তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে কেটে কোনো কিছু পালিশ করা'
√ছিট্‌রা	'ছড়িয়ে দেওয়া'

√ছ্যাকড়া 'ধাক্কা দেওয়া'

√তরত্ 'তুলে ধরা'

√তারা 'ছুরি দিয়ে কেটে কোনো কিছুর ধারা ছুঁচলো করা'

√থ্যাতরা 'থেঁতলানো'

√থক্কুর্ 'উপর্যুপরি অনুরোধ করা'

√থুরা 'আঘাত করা বা শাস্তি দেওয়া'

√থর্ 'স্থানান্তরিত হওয়া'

√ন্যাকা 'নিড়ানো বা খোঁসা ছাড়ানো'

√ন্যাদা 'লাথি মারা'

√ন্যালা 'নিড়ানো'

√পলট্টা 'পাঁচানো'

√পচর্ 'বাড়া'

√পাউকড়া 'সাঁতার কাটা'

√পাজলা 'চোখে পলক ফেলা'

√পুক্ 'ডুবিয়ে যাওয়া'

√প্যাচকাটা 'গাধা'

√প্যাটা 'পাঠানো'

√প্যালা 'ঠেলা দেওয়া বা শাস্তি দেওয়া'

√ফক্দ্ 'উদ্ধত ভাব দেখানো'

√ফাব্ 'কোনো কাজ দ্রুত হওয়া'

√ফাচ্ 'ছুরি দিয়ে কোনো জিনিসে খোঁচ দেওয়া'

√ফিকর্ 'ছুটে যাওয়া'

√ফোচা 'খোঁচ দেওয়া'

√বাতা 'নির্দেশ দেওয়া'

√ব্যাকট্টা 'বিকৃত করা'

√ভ্যাপেরা 'বিদীর্ণ করা'

√ভ্যাঙেলা 'ভ্যাংচানো'

√মোচরা 'মোচড়ানো'

✓হকল্	'খুলে যাওয়া'
✓হাবর্	'ঢুকে পড়া'
✓ভ্যাওয়া	'ভিজানো'
✓ঘটক্	'লটকানো বা টাঙানো'
✓নিকিল্	'বাইরে বের হওয়া'
✓ক্যালা	'ধোঁয়া ছাড়ানো'
✓ক্যাকট়া	'বিকৃত করা'
✓ক্যালট়া	'ধোঁয়া ছাড়ানো' ইত্যাদি।

সাধিত ধাতু

ণিজন্ত ধাতু সমূহ

সাধারণভাবে ধাতুর উত্তরে -আ প্রত্যয় যোগ করে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ণিজন্ত ধাতুর রূপ গঠন করা হয়। এই উপভাষায় এই জাতীয় ক্রিয়াধাতুর সংখ্যা প্রচুর। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

✓অচ্চ্	'অর্চনা করা'	✓অচ্চা	'অর্চনা করানো'
✓অজ্জ্	'অর্জন করা'	✓অজ্জা	'অর্জন করানো'
✓আউজ্	'হেলান দেওয়া	✓আউজা	'হেলান দেওয়ানো'
✓আন্	'আনা'	✓আনা	'আনানো'
✓আন্দ্	'রান্না করা'	✓আন্দা	'রান্না করানো'
✓উঠ্	'ওঠা'	✓উঠা	'ওঠানো'
✓উর্	'কাপড় গায়ে দেওয়া	✓উরা	'গায়ে দেওয়ানো'
✓উলট্	'উল্টে যাওয়া'	✓উলট়া	'ওল্টানো'
✓উরা	'ওড়া'	✓উরা	'ওড়ানো'
✓ক	'বলা'	✓কওয়া	'বলানো'
✓কম্	'কমে যাওয়া'	✓কমা	'কমানো'
✓কাট্	'কাটা	✓কাটা	'কাটানো'
✓কাঁপ্	'কাঁপা'	✓কাপা	'কাঁপানো'
✓কাপ্	'কাপা'	✓কাপা	'কাঁপানো'
✓কুট্	'খণ্ড খণ্ড করে কাটা	✓কুটা	'খণ্ড খণ্ড করে কাটানো'

√খস্	'খসে পড়া'	√খসা	'খসানো'
√খাট্	'পরিশ্রম করা'	√খাটা	'পরিশ্রম করানো'
√কর্	'করা'	√করা	'করানো'
√খুল্	'খুলে যাওয়া'	√খুলা	'খোলা বা খোলানো'
√গল্	'গলে যাওয়া'	√গলা	'গলানো'
√গণ্	'গণনা করা'	√গণা	'গণনা করানো'
√গাড়্	'রোপন করা'	√গাড়া	'রোপন করানো'
√ঘষ্	'ঘষা'	√ঘষা	'ঘষানো'
√ঘির্	'ঘেরা'	√ঘিরা	'ঘেরানো'
√ঘুচ্	'শেষ হওয়া'	√ঘুচা	'শেষ করা বা করানো'
√ঘুর	'ঘোরা	√ঘুরা	'ঘোরানো'
√চকট্	'উল্টে যাওয়া'	√চকটা	'ওল্টানো'
√চট্	'রেগে যাওয়া'	√চটা	'রাগানো'
√চমক্	'চমকে যাওয়া'	√চমকা	'চমকানো'
√চড়্	'আরোহণ করা'	√চড়া	'আরোহণ করানো'
√চল্	'চলা'	√চলা	'চালানো'
√চাখ্	'আস্বাদ নেওয়া'	√চাখা	'আস্বাদন করানো'
√চাল্	'স্থানান্তরিত করা'	√চালা	'স্থানান্তরিত করানো'
√চিন্	'চেনা'	√চিনা	'চেনানো'
√চ্যাত্	'জাগা'	√চ্যাতা	'জাগানো'
√ছা	'ছাওয়া'	√ছাওয়া	'ছাওয়ানো'
√ছাচ্	'সঞ্চয় করা'	√ছাচা	'সঞ্চয় করানো'
√ছাট্	'ছাঁটা'	√ছাটা	'ছাঁটানো'
√ছাড়্	'ত্যাগ করা'	√ছাড়া	'ছাড়ানো'
√ছোচ্	'শৌচকর্ম করা'	√ছোচা	'শৌচকর্ম করানো'
√ছিড়্	'ছিঁড়ে যাওয়া'	√ছিড়া	'ছেঁড়া, ছেঁড়ানো'
√জপ্	'জপ করা'	√জপা	'জপ করানো'
√জল্	'জ্বলা'	√জলা	'জ্বালানো'

√জাগ্	'জাগা'	√জাগা	'জাগানো'
√যাচ্	'চাওয়া বা প্রার্থনা করা'	√যাচা	'চাওয়ানো বা প্রার্থনা করানো'
√জান্	'জানা'	√জানা	'জানানো'
√জিত্	'জয়লাভ করা'	√জিতা	'জয়লাভ করানো'
√জিন্	'জয়লাভ করা'	√জিনা	'জয়লাভ করানো'
√জোত্	'আরম্ভ করা'	√জোতা	'আরম্ভ করানো'
√ঝর্	'ঝরে পড়া'	√ঝরা	'ঝরানো'
√ঝোল্	'ঝোলা'	√ঝুলা	'ঝোলানো'
√টলক্	'টলমল্ করা'	√টলকা	'টলানো, টলমল্ করে নাড়ানো'
√ঠক্	'ঠকা'	√ঠকা	'ঠকানো'
√ঠাউর্	'বোঝা'	√ঠাউরা	'বোঝানো'
√ঠাক্	'ঠকা'	√ঠাকা	'ঠকানো'
√ডুব্	'ডুবে যাওয়া'	√ডুবা	'ডোবানো'
√ঢল্	'ঢলে পড়া'	√ঢলা	'ঢলানো'
√ঢুক্	'ঢোকা'	√ঢুকা	'ঢোকানো'
√ঢুল্	'ঢোলা'	√ঢুলা	'ঢোলানো'
√তর্	'উত্তীর্ণ হওয়া'	√তরা	'উত্তীর্ণ বা উদ্ধার করা'
√দে	'দেওয়া'	√দ্যাওয়া	'দেওয়ানো'
√দ্যাখ্	'দেখা'	√দ্যাখা	'দেখানো'
√ধস্	'ধুসে পড়া'	√ধসা	'ধুসানো'
√নড়্	'নড়া চড়া করা'	√নড়া	'নড়ানো'
√নাগ্	'সংলগ্ন হওয়া'	√নাগা	'সংলগ্ন করা বা করানো'
√নাচ্	'নাচা'	√নাচা	'নাচানো'
√নাম্	'নামা'	√নামা	'নামানো'
√নিকিল্	'বাইরে বের হওয়া'	√নিকিলা	'বাইরে বের করা বা করানো'
√মিল্	'মিলে যাওয়া'	√মিলা	'মেলানো'
√লুকা	'লুকানো'	√লুকা	'লুকনো'
√পাক্	'পেকে যাওয়া'	√পাকা	'পাকানো'

√পুজ্	'শেষ হওয়া'	√পুজা	'শেষ করা'
√পুর্	'পূর্ণ হওয়া'	√পুরা	'পূর্ণ করা বা করানো'
√পুর্	'পুড়ে যাওয়া'	√পুরা	'পোড়ানো'
√ফল্	'ফলা'	√ফলা	'ফলানো'
√ফাট্	'ফেটে যাওয়া'	√ফাটা	'ফাটানো'
√ফার্	'ছিড়ে যাওয়া'	√ফারা	'ছেড়া'
√ফুট্	'ফোটা'	√ফুটা	'ফোটানো'
√ফুরা	'ফুরিয়ে যাওয়া'	√ফুরা	'ফুরানো'
√ফুল্	'ফুলে ওঠা'	√ফুলা	'ফোলানো'
√ব	'বহন করা'	√বওয়া	'বহন করানো'
√বচ্	'বাঁচা'	√বচা	'বাঁচানো'
√বইশ্	'বসা'	√বশা	'বসানো'
√বাক্	'স্বীকারোক্তি করা'	√বাকা	'স্বীকারোক্তি করানো'
√বাচ্	'বাঁচা'	√বাচা	'বাঁচানো'
√বাজ্	'বাজা'	√বাজা	'বাজানো'
√বার্	'বৃদ্ধি পাওয়া'	√বারা	'বাড়ানো'
√বিরা	'বের হওয়া'	√বিরকা	'বের করা'
√ভ	'প্রস্তুত হওয়া'	√ভওয়া	'প্রস্তুত করা বা করানো'
√ভজ্	'ভজনা করা'	√ভজা	'ভজনা করানো'
√ভাব্	'ভাবা'	√ভাবা	'ভাবানো'
√ভাশ্	'ভাসা'	√ভাশা	'ভাসানো'
√ভিজ্	'ভেজা'	√ভিজা	'ভেজানো'
√ভুগ্	'ভোগ করা'	√ভোগা	'ভোগানো'
√ভুল্	'ভুলে যাওয়া'	√ভুলা	'ভোলানো'
√মজ্	'মজে যাওয়া'	√মজা	'মজানো'
√মাত্	'মেতে ওঠা'	√মাতা	'মাতানো'
√মিট্	'মিটে যাওয়া'	√মিটা	'মেটানো'
√মিল্	'মিলিত হওয়া'	√মিলা	'মেলানো'

কাক্কোই 'চিরুনি'

মূল পদ		নামধাতু	
থরো	'থর'	√থরা	'থর হয়ে যাওয়া'
গাজা	'অঙ্কুর'	√গাজা	'অঙ্কুরোদ্গম হওয়া'
চোখা	'ধারাল'	√চোখা	'ধার দেওয়া'
ঘুশি	'ঘুষি'	√ঘুশা	'ঘুষি মারা'
গাইল্	'গালি'	√গাইলা	'গালি দেওয়া'
গান্ধ্	'ঘ্রাণ'	√গান্ধা	'ঘ্রাণ তোলা বা কামড়ানো'
ঘোড়া	'ঘোড়া'	√ঘোড়া	'ঘুড়িয়ে চলা'
ছাল্	'চামড়া'	√ছালা	'চামড়া ছাড়ানো'
ঘাম্	'ঘাম'	√ঘাম্	'[illegible] ঘর্মাক্ত বা পরিশ্রান্ত হওয়া'
জুতা	'জুতা'	√জুতা	'জুতা দিয়ে মারা'
ঘণ্	'ঘাম'	√ঘণ্	'ঘর্মাক্ত বা পরিশ্রান্ত হওয়া'
ঝাল্	'ঝাল'	√ঝালা	'ঝালের অনুভূতি হওয়া'
ছল্	'ছল'	√ছল্	'ছলনা করা'
ঢ্যাট্টোল্	'ঢিল'	√ঢ্যাট্টোলা	'ঢিল ছুড়ে মারা'
চুপ্	'চুপ'	√চুপ্	'চুপ করা বা হওয়া'
ছুকি	'কলার ছড়ি'	√ছুকা	'কাঁদি থেকে কলার ছড়ি কেটে নেওয়া'
গোন্দো	'গন্ধ'	√গোন্দা	'গন্ধ করা'
কোদাল্	'কোদাল'	√কোদ্লা	'কোদাল দিয়ে কাটা'
চাউল্	'চাল'	√চাউলা	'কচি ধানের খোসার ভিতরে চাল আসা'
চিত্	'ছবি'	√চিতা	'ছবি আঁকা বা আলপনা দেওয়া'
ছক্	'ছক, পরিকল্পনা'	√ছক্	'ছক কাটা বা পরিকল্পনা তৈরী করা'
কোশ্	'কোষ'	√কোশা	'কোষের মত গুচ্ছাবদ্ধ ভাবে সাজানো'
কামোর্	'কামড়'	√কামরা	'কামড়ানো'
ডাঙ্	'প্রহার, প্রহার দণ্ড'	√ডাঙা	'প্রহার করা'
ঢ্যাল্	'ঢিল'	√ঢ্যালা	'ঢিল ছোড়া'
ডল্	'ডল'	√ডলা	'ডলিয়ে যাওয়া'
ডাল্	'শাস্তি (বিশিষ্টার্থে)'	√ডালা	'শাস্তি দেওয়া'

	ভাও দে	'সামলানো, আয়ত্তে আনা'
	মুমুরি দে	'আক্রমণ করা'
	হামাল্ দে	'আক্রমণ করা'
	তোচা দে	'প্রতারণা করা'
	নজোর্ দে	'তত্ত্বাবধান করা'
	ঢুল্কি দে	'উঁকি দেওয়া'
	ধাম্ দে	'বাধা দেওয়া'
	জবান্ দে	'কথা দেওয়া'
	করার্ দে	'প্রতিশ্রুতি দেওয়া' ইত্যাদি
(গ) √খা ধাতু যোগে–	পাক্ খা	'ঘুরপাক খাওয়া'
	খাবড়াল্ খা	'কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া'
	টাস্ খা	'অবাক হওয়া'
	ঢোদোম্ খা	'শাস্তি ভোগ করা'
	খাওয়া খা	'শাস্তি ভোগ করা'
	দম্ খা	'বিশ্রাম নেওয়া' ইত্যাদি।
(ঘ) √পা ধাতু যোগে–	কষ্টো পা	'কষ্ট পাওয়া'
	সুখ্ পা	'সুখ পাওয়া'
	ধাওয়া পাই	'দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া'
	শান্তি পা	'শান্তি পাওয়া' ইত্যাদি।
(ঙ) √পাড়্ ধাতু যোগে–	গলোমা পাড়্	'প্রশংসা করা'
	চ্যাচ্ পাড়্	'ন্যাকামো করা'
	গাইল্ পাড়্	'গালি দেওয়া'
	কাম্ পাড়্	'কাজে বিরতি দেওয়া'
	হাল্ পাড়্	'চাষের কাজ বন্ধ রাখা' ইত্যাদি।
(চ) √ধর্ ধাতু যোগে –	ভাড়োন্ ধর্	'বায়না বা আবদার করা'
	খাকোম্ ধর্	'বিশেষ কৌশল বা ভঙ্গি অবলম্বন করা'
	আইরি ধর্	'আক্রমণোদ্যত হওয়া'
	পাছ্ ধর্	'অনুসরণ করা'
	কথা ধর্	'কথা রাখা' ইত্যাদি।

(ছ) √মাগ্ ধাতু যোগে-	কাজিয়া মাগ্	'ঝগড়া বাঁধা'
	ঢপরা মাগ্	'ভিতর পর্যন্ত ভিজিয়ে যাওয়া'
	ঠাঁবরা মাগ্	'পর্যুদস্ত বা দুখার্ত হওয়া'
	গ্যান্ গ্যানা মাগ্	'বিগলিত হওয়া'
	দ্যায়্ দ্যায়া মাগ্	'বিষণ্ণ হওয়া'
	থিন্ মাগ্	'ঘৃণায় ঘৃণা বোধ হওয়া'
	ভোক্ মাগ্	'ক্ষুধা বোধ করা'
	তিস্না মাগ্	'তৃষ্ণা বোধ করা'
	বেমুরা মাগ্	'ঝিমিয়ে পড়া' ইত্যাদি।
(জ) √তুল্ ধাতু যোগে-	ফিকারি তুল্	'ঢেঁকুর তোলা'
	ভাত্ তুল্	'মারতে উদ্যত হওয়া'
	মুঠি তুল্	'মুষ্টি উত্তোলন করা'
	ভিক্ষা তুল্	'ভিক্ষা সংগ্রহ করা' ইত্যাদি।
(ঝ) √মার্ ধাতু যোগে-	ঢুলকি মার্	'উঁকি মারা'
	মাপ্টি মার্	'লুকিয়ে থাকা'
	খাটা মার্	'রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া'
	ফুটানি মার্	'উন্নাসিকতা দেখানো'
	টুঙি মার্	'দুই চালের সংযোগস্থলে খড় গোঁজা'
	ভাত্ মার্	'ভাত খাওয়া' ইত্যাদি।
(ঞ) √জোর্ ধাতু যোগে-	হাল্ জোর্	'হাল চালনা শুরু করা'
	ঘর্ জোর্	'ঘরের কাজ শুরু করা'
	বিয়াও জোর্	'বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন করা'
	গান্ জোর্	'গাইতে শুরু করা' ইত্যাদি।
(ট) √পাত্ ধাতু যোগে-	খ্যালা পাত্	'খেলা শুরু করা'
	চ্যাক্ পাত্	'চ্যাঁচানো শুরু করা'
	বিছিনা পাত্	'বিছানা পাতা'
	ঘর্ পাত্	'ঘর তৈরী করা' ইত্যাদি।

(ঙ) √কারা ধাতু যোগে –হাগেনা কারা 'পেটের অসুখ হওয়া'
হোতোনা কারা 'মূত্ররোগ হওয়া'
উকারি কারা 'মাটির উপরে কীট পতঙ্গ ইত্যাদির দ্বারা বাহিত মাটি ফুটে ওঠা' ইত্যাদি।

(চ) √বাট্ ধাতু যোগে – ঘ্যাঙারি বাট্ 'ক্রমাগত কাঁদা'
চ্যাচারি বাট্ 'ক্রমাগত চীৎকার করা' ইত্যাদি।

(ছ) √কর্ ধাতু যোগে – কাজ্ কর্ 'কাজ করা'
খরিদ্ কর্ 'কেনা'
ওয়াশাইত্ কর্ 'দোহানো'
দান্ কর্ 'দান করা'
গান্ কর্ 'গান গাওয়া'
দম্ কর্ 'স্মরণ করা'
পুছ্ কর্ 'জিজ্ঞাসা করা'
ন্যাবা কর্ 'যত্ন করা'
বাও কর্ 'কথা বলা'
দর্শন্ কর্ 'দেখা'
আচেচ্ কর্ 'পছন্দ করা'
উদিশ্ কর্ 'খোঁজ করা'
কামাই কর্ 'উপার্জন করা'
ইলতামি কর্ 'রসিকতা করা'
চিন্তা কর্ 'চিন্তা করা'
হুকুম্ কর্ 'আদেশ দেওয়া'
তৈয়ার্ কর্ 'তৈরী করা'
ভ্যাদের্ ভ্যাদের্ কর 'বক্ বক্ করা'
ভ্যাকের্ ভ্যাকের্ কর্ 'অর্থহীন কথা বলা' ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় √কর্ ধাতু যোগে প্রায় সমস্ত বিশেষ্যপদ এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দকে যৌগিক ধাতুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

ধ্বন্যাত্মক ধাতু ঃ -আ প্রত্যয়ান্ত

সরল ঃ	আউযড়া	'অরুচি হওয়া'
	ঘাউয্‌রা	'ভিজে আর্দ্র হয়ে যাওয়া'
	চিল্‌রা	'চীৎকার করা'
	হাইচা	'হাঁচি দেওয়া'
	ক্যাদেলা	'গর্বিত হওয়া'
	টব্‌রা	'লাফানো'
	চব্‌রা	'চোবানো'
	ঘোকা	'গর্তের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ঘাঁটা'
	ঝ্যাঙা	'আর্ত রব করা'
	ধুমা	'আঘাত করা' ইত্যাদি।
পুনরাবৃত্ত ঃ	ক্যার্‌ক্যারা	'হালকা ধরনের কথা বলা'
	ত্যাল্‌ত্যালা	'চাঞ্চল্য প্রকাশ করা'
	তর্‌তরা	'চাঞ্চল্য প্রকাশ করা'
	তক্‌তকা	'উচ্চস্বরে কথা বলা'
	ত্যার্‌ত্যারা	'অস্থিরতা প্রকাশ করা'
	ঘোট্‌ঘোটা	'কোনো জিনিস খোঁজা বা অপটু হাতে কাজের চেষ্টা করা'
	কর্‌করা	' রাগ প্রকাশ করা'
	ব্যার্‌ব্যারা	'কাঁদা অথবা কাঁদার উপক্রম করা'
	হন্‌হনা	' ক্রোধ প্রকাশ করা'
	থর্‌থরা	'উদ্বেগ বোধ করা'
	গন্‌গনা	' ক্রোধ এবং ব্যস্ততার ভাব প্রকাশ করা'
	খুত্‌খুতা	'অস্বস্তিকর শারীরিক অনুভূতি হওয়া'
	ঘ্যান্‌ঘ্যানা	'অর্থহীন কথা বলা বা রসিকতা করা'
	ভন্‌ভনা	'ক্রোধ প্রকাশ করা'
	গির্‌গিরা	'গর্জন করা'
	বদ্‌বদা	'ক্রোধসূচক উক্তি করা'
	ভশ্‌ভশা	'চাঞ্চল্য প্রকাশ করা'
	হ্যাক্‌হ্যাকা	'বিশেষ পদ্ধতিতে মশা তাড়াই করা'

এই শ্রেণীর ধ্বন্যাত্মক ধাতুর মধ্যে দ্বিতীয় ধাতুটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধ্বনিগতভাবে ঈষৎ ভিন্নতাযুক্ত হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধাতুটি সমভাব প্রকাশক অন্য একটি ধাতুও হয়। যেমন-

কিড়্মিড়া	'ক্রোধ প্রকাশ করা বা রাগে দাঁতে কড় মড় শব্দ করা'
ধড়্ফড়া	'ধড়ফড় করা বা উদ্বেগ বোধ করা'
ধড়্মড়া	'ব্যস্ততা ও উদ্বেগ প্রকাশ করা'
নট্পটা	'আন্দোলিত হওয়া বা করা'
ন্যাট্প্যাটা	'লেপন করা'
ছট্পটা	'ছটপট্ করা'
চট্পটা	'চাঞ্চল্য প্রকাশ করা'
চুলবুলা	'কোনো কিছু করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়া'
হোস্ফোসা	'ক্লান্তিজনিত দীর্ঘশ্বাস মোচন করা'
হ্যাস্ফ্যাসা	'ক্লান্তিজনিত দীর্ঘশ্বাস মোচন করা'
খস্খসা	'খসখস শব্দ করা'
খড়্মড়া	'খড়মড় শব্দ করা বা কিছু করার জন্য ব্যস্ত হওয়া'
ধক্পকা	'ব্যস্ত হওয়া বা ব্যস্ততার ভাব প্রকাশ করা'
টলমলা	'আন্দোলিত হওয়া' ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক ধাতু : যৌগিক বা সংযোগমূলক

ধড়্মড়্ কর্	'ধড়মড় করা বা উদ্বেগ বোধ করা'
ঘ্যান্ঘ্যান্ কর্	'বিরক্তিকর ভাবে কাঁদা'
চন্চন্ কর্	'চাঞ্চল্য প্রকাশ করা'
নট্পট্ কর্	'আন্দোলিত হওয়া'
তক্তক্ কর্	'উচ্চস্বরে কথা বলা'
টন্টন্ কর্	'ব্যথার অনুভূতি হওয়া'
টল্টল্ কর্	'স্বচ্ছতা বা নির্মলতার ভাব প্রকাশ করা'
তড়্তড়্ কর্	'চাঞ্চল্য প্রকাশ করা'
ব্যার্ব্যার্ কর্	'কাঁদা অথবা কাঁদার উপক্রম করা'
হম্হম্ কর্	'ক্রোধ প্রকাশ করা'
ফোন্ফোন্ কর্	'মৃদু শব্দে কাঁদা'

থর্‌থর্‌ কর্‌ 'উদ্বেগ বোধ করা'

পির্‌পির্‌ কর্‌ 'দুরন্তপনা করা'

তপ্‌তপ্‌ কর্‌ 'চাঞ্চল্য প্রকাশ করা'

চর্‌চর্‌ কর্‌ 'শুষ্কতার অনুভূতি হওয়া'

প্যানপ্যান্‌ কর্‌ 'অর্থহীন কথা বলা বা রসিকতা করা'

থলথল্‌ কর্‌ 'আবেগে কম্পিত হওয়া'

চিন্‌চিন্‌ কর্‌ 'চিনচিনে ব্যথা বোধ করা'

গির্‌গির্‌ কর্‌ 'গর্জন করা'

তন্‌তন্‌ কর্‌ 'ক্রোধ প্রকাশ করা'

বদ্‌বদ্‌ কর্‌ 'অপরোক্তি করা'

ভ্যাদ্‌ভ্যাদ্‌ কর্‌ 'ক্ষোভসূচক উক্তি করা'

থক্‌থক্‌ কর্‌ 'চাঞ্চল্য প্রকাশ করা'

চক্‌চক্‌ কর্‌ 'উজ্জ্বলতা প্রকাশ করা'

প্যান্‌প্যান্‌ কর্‌ 'বিলাপ করা'

ন্যাটপ্যাট্‌ কর্‌ 'লেপন করা'

চম্‌চম্‌ কর্‌ 'চাঞ্চল্য বা ব্যস্ততা প্রকাশ করা'

ভ্যানভ্যান্‌ কর্‌ 'আবদার করা'

হ্যাশফ্যাশ্‌ কর্‌ 'ক্লান্তির ভাব প্রকাশ করা' ইত্যাদি।

-আ প্রত্যয়ান্ত ধ্বন্যাত্মক ধাতুকে এইভাবে √কর্‌ ধাতু যোগে যৌগিক ধাতুতে রূপান্তরিত করা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কিছু ধ্বন্যাত্মক ধাতু আছে, যেগুলিতে √কর্‌ এবং [illegible] √লাগ্‌ এই দুটি ধাতুর প্রয়োগ আবশ্যিক। যেমন-

ভকোর্‌ ভকোর্‌ কর্‌ 'অর্থহীন কথা বলা'

বোদোর্‌ বোদোর্‌ কর্‌ 'ক্রোধসূচক দুর্বোধ্য কথা বলা'

ঘোটোর্‌ ঘোটোর্‌ কর্‌ 'বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘোরা ফেরা করা'

ন্যাতের্‌ প্যাতের্‌ কর্‌ 'বিনা শক্তিপ্রয়োগে বেঁকে যাওয়া'

নাটির্‌ পাটির্‌ কর্‌ 'ইতস্ততঃ আন্দোলিত হওয়া'

টাঁকাউ টাঁকাউ কর্‌ 'ব্যথা বোধ করা'

ধুকধুকা লাগ্‌ 'ধনসম্পত্তিবিশিষ্ট হওয়া'
ঘোলোক্‌ পোলোক্‌ কর্‌ 'ঢিলে ভাবে যাতায়াত করা'
ক্যাচের্‌ ম্যাচের্‌ কর্‌ 'গন্ডগোল করা'
কুলকুলি কর্‌ 'কুলকুচা করা'
দ্যাম্‌দ্যামা লাগ্‌ 'ভিজে যাওয়া বা বিবর্ণ হওয়া'
জ্যাপ্‌জ্যাপা লাগ্‌ 'ভিজে নরম হয়ে যাওয়া'
ঢ্যাম্‌ঢ্যামা লাগ্‌ 'গতিহীন বা পরিতৃপ্ত হওয়া'
শ্যাম্‌শ্যামা লাগ্‌ 'ভিজে যাওয়া'
ভ্যাদের্‌ভ্যাদের্‌ কর্‌ 'অর্থহীন কথা বলা'
ভ্যাকের্‌ভ্যাকের্‌ কর্‌ 'অতিরিক্ত কথা বলা'
ব্যাদের্‌ব্যাদের্‌ কর্‌ 'ক্ষোভসূচক উক্তি করা'
ঘোলোক্‌ পেটোলোক্‌ কর্‌ 'দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া'
ধ্যাদের্‌ ম্যাদের্‌ কর্‌ 'শ্রমসাধ্য কাজ করার চেষ্টা করা'
থ্যাক্‌থ্যাকা লাগ্‌ 'নরম হয়ে যাওয়া'
থ্যার্‌থ্যারা লাগ্‌ 'নরম হয়ে পচে যাওয়া'
প্যাক্‌প্যাকা লাগ্‌ 'কর্দমাক্ত হওয়া'
হাকড়াউ হাকড়াউ কর্‌ 'পৌনঃপুনিকভাবে শূন্যতার অনুভূতি হওয়া'
খচোর্‌ মচোর্‌ কর্‌ 'অসাধ্য কাজ করার চেষ্টা করা'
নালড়াউ নালড়াউ কর্‌ 'নক্‌নক্‌ করা'
দুনদ্যা দুনদি কর্‌ 'কলহ করা' ইত্যাদি।

ধাতু সমূহের গণ বা গঠনগত শ্রেণী বিভাগ

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত ক্রিয়াধাতুগুলিকে নিম্নানুরূপ শ্রেণীগুলিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

(১) আদিস্বর /অ/

(১ ক) ব্যঞ্জনান্ত – কর্‌, বইস্‌, চল্‌, পড়্‌, মর্‌ ইত্যাদি

(১ খ) স্বরান্ত – হ, দ, ল, ধ, ন ইত্যাদি।

(২) আদিস্বর /আ/

(২ ক) ব্যঞ্জনান্ত – পাল্‌, খাদ্‌, যাপ্‌, কাট্‌, চাট্‌, বাট্‌ ইত্যাদি।

(২ খ) স্বরান্ত - জা, খা, গা, পা, ইত্যাদি।

(৩) আদিস্বর /ই/

(৩ ক) ব্যঞ্জনান্ত - চিন্, কিন্, জিন্, জিত্, শিখ্, ছিঁড়্ ইত্যাদি।

(৩ খ) স্বরান্ত - পি, দি, ইত্যাদি।

(৪) আদিস্বর /এ/, /অ্যা/

(৪ ক) ব্যঞ্জনান্ত - দেখ্/দ্যাখ্, ফেল্/ফ্যাল্, খ্যাল্ ইত্যাদি।

(৪ খ) স্বরান্ত - দে, নে, ইত্যাদি।

(৫) আদিস্বর /উ/

(৫ ক) ব্যঞ্জনান্ত - শুন্, মুছ্, বুঝ্, খুজ্, তুল্, উঠ্, খুল্, চুষ্ ইত্যাদি।

(৫ খ) স্বরান্ত - শু, ধু, নু ইত্যাদি।

(৬) -আ প্রত্যয়ান্ত নিজন্ত এবং নামধাতু

(৬ ক) মূল ধাতুর স্বর /অ/

(৬ ক।১) মূল ধাতুতে আদিস্বর /অ/+ একটি ব্যঞ্জন - করা, বলা, ধসা, খসা, পড়া, ধরা ইত্যাদি।

(৬ ক।২) মূল ধাতুতে আদিস্বর /অ/+ দুটি ব্যঞ্জন - তরকা, ধমকা, খসড়া ইত্যাদি।

(৬ খ) মূল ধাতুর স্বর /আ/

(৬ খ।১) মূল ধাতুর স্বর /আ/+একটি ব্যঞ্জন -নামা, কাঁপা, ঘামা ইত্যাদি।

(৬ খ।২) মূল ধাতুর আদিস্বর/আ/+একাধিক ব্যঞ্জন - কামড়া, খাবলা, খামচা, হাতড়া, দাবড়া ইত্যাদি।

(৬ গ) মূল ধাতুর স্বর /ই/

(৬ গ।১) মূল ধাতুর আদিস্বর /ই/+একটি ব্যঞ্জন - শিখা, জিতা, ভিজা, ঘিষা, গিলা, ছিঁড়া, ফিরা ইত্যাদি।

(৬ গ।২) মূল ধাতুর আদিস্বর /ই/+একাধিক ব্যঞ্জন- ছিটকা, বিগড়া ইত্যাদি।

(৬ ঘ) মূল ধাতুর স্বর /উ/

(৬ ঘ।১) মূল ধাতুর আদিস্বর/উ/+ একটি ব্যঞ্জন- উঠা, শুধা, ভুলা, ছুলা, ঝুলা, চুনা ইত্যাদি।

(৬ ঘ।২) মূল ধাতুর আদিস্বর /উ/+ একাধিক ব্যঞ্জন -উপড়া, উথলা, গুমরা, ঢুকরা, উল্টা ইত্যাদি।

(৬ ঙ) মূল ধাতুর স্বর /এ/,/অ্যা/ -খ্যাদা, খ্যাপা, ব্যাতড়া, দ্যাখা, ল্যাখা,
ব্যাচা, ইত্যাদি।

(৬ চ) মূল ধাতুর স্বর /ও/

(৬ চ।১) মূল ধাতুর আদিস্বর /ও/+একটি ব্যঞ্জন -ধোয়া, খোয়া, শোনা,
পোছা, বোয়া ইত্যাদি।

(৬ চ।২) মূল ধাতুর স্বর /ও/+ একাধিক ব্যঞ্জন - ভোগদরা, ঘোতরা, খোচরা,
ভোশরা ইত্যাদি।

(৬ ছ) মূল ধাতুর স্বর /ঔ/ - দৌড়া, ঔধা, পৌঁছা ইত্যাদি।

ক্রিয়ার রূপভেদ

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কাল, পুরুষ, বচন এবং ভাব অনুসারে ক্রিয়ার রূপভেদ ঘটে থাকে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রিয়ার রূপভেদের বিষয়টি উপস্থাপিত হ'ল।

রেখাচিত্র - ১ ঃ লিখ্ ধাতু

কাল	পুরুষ	বচন		স্বরান্ত ধাতু	ব্যঞ্জনান্ত ধাতু
সাধারণ বর্তমান	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ঙ্	-অঙ্
			সম্ভ্রমার্থক	-ঙ্	-অঙ্
		বহুবচন	সাধারণ	-ই	-ই
			সম্ভ্রমার্থক	-ই	-ই
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ইস্	-ইস্
			সম্ভ্রমার্থক	-ন্	-এন্
		বহুবচন	সাধারণ	-ন্	-এন্
			সম্ভ্রমার্থক	-ন্	-এন্
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-য়	-এ
			সম্ভ্রমার্থক	-য়	-এ
		বহুবচন	সাধারণ	-য়	-এ
			সম্ভ্রমার্থক	-য়	-এ
ঘটমান বর্তমান	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-বার্ ধচ্ছুঙ্	-ইবার্ ধচ্ছুঙ্
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্ ধচ্ছুঙ্	-ইবার্ ধচ্ছুঙ্
		বহুবচন	সাধারণ	-বার্ ধচ্ছি	-ইবার্ ধচ্ছি
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্ ধচ্ছি	-ইবার্ ধচ্ছি
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-বার্ ধচ্ছিস্	-ইবার্ ধচ্ছিস্
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্ ধইচ্ছেন্	-ইবার্ ধইচ্ছেন্
		বহুবচন	সাধারণ	-বার্ ধইচ্ছেন্	-ইবার্ ধইচ্ছেন্
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্ ধইচ্ছেন্	-ইবার্ ধইচ্ছেন্
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-বার্ ধইচ্ছে	-ইবার্ ধইচ্ছে
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্ ধইচ্ছে	-ইবার্ ধইচ্ছে
		বহুবচন	সাধারণ	-বার্ ধইচ্ছে	-ইবার্ ধইচ্ছে
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্ ধইচ্ছে	-ইবার্ ধইচ্ছে

কাল	পুরুষ	বচন		স্বরান্ত ধাতু	ব্যঞ্জনান্ত ধাতু
পুরাঘটিত বর্তমান	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ছুঙ্	-উছুঙ্
			সম্মানার্থক	-ছুঙ্	-উছুঙ্
		বহুবচন	সাধারণ	-ছি	-ইছি
			সম্মানার্থক	-ছি	-ইছি
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ছিস্	-ইছিস্
			সম্মানার্থক	-ছেন্	-ইছেন্
		বহুবচন	সাধারণ	-ছেন	-ইছেন্
			সম্মানার্থক	-ছেন্	-ইছেন্
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ইছে	-ইছে
			সম্মানার্থক	-ইছে	-ইছে
		বহুবচন	সাধারণ	-ইছে	-ইছে
			সম্মানার্থক	-ইছে	-ইছে
সাধারণ অতীত	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-লুঙ্	-উলুঙ্
			সম্মানার্থক	-লুঙ্	-উলুঙ্
		বহুবচন	সাধারণ	-ইলোঙ্	-ইলোঙ্
			সম্মানার্থক	-ইলোঙ্	-ইলোঙ্
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-লু	-উলু
			সম্মানার্থক	-ইলেন্	-ইলেন্
		বহুবচন	সাধারণ	-ইলেন্	-ইলেন্
			সম্মানার্থক	-ইলেন্	-ইলেন্
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ইল্	-ইল্
			সম্মানার্থক	-ইল্	-ইল্
		বহুবচন	সাধারণ	-ইল্	-ইল্
			সম্মানার্থক	-ইল্	-ইল্

কাল	পুরুষ	বচন		স্বরান্ত ধাতু	ব্যঞ্জনান্ত ধাতু
ঘটমান অতীত	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-রার্‌থক্কুলুঙ্‌	-ইবার্‌থক্কুলুঙ্‌
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্‌থক্কুলুঙ্‌	-ইবার্‌থক্কুলুঙ্‌
		বহুবচন	সাধারণ	-বার্‌থক্কিলোঙ্‌	-ইবার্‌থক্কিলোঙ্‌
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্‌থক্কিলোঙ্‌	-ইবার্‌থক্কিলোঙ্‌
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-বার্‌থক্কুলু	-ইবার্‌থক্কুলু
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্‌থক্কিলেন্‌	-ইবার্‌থক্কিলেন্‌
		বহুবচন	সাধারণ	-বার্‌থক্কিলেন্‌	-ইবার্‌থক্কিলেন্‌
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্‌থক্কিলেন্‌	-ইবার্‌থক্কিলেন্‌
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-বার্‌থইক্কুলো	-ইবার্‌থইক্কেলো
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্‌থইক্কেলো	-ইবার্‌থইক্কেলো
		বহুবচন	সাধারণ	-বার্‌থইক্কেলো	-ইবার্‌থইক্কেলো
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্‌থইক্কেলো	-ইবার্‌থইক্কেলো
পুরাঘটিত অতীত	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ছুলুঙ্‌	-উছুলুঙ্‌
			সম্ভ্রমার্থক	-ছুলুঙ্‌	-উছুলুঙ্‌
		বহুবচন	সাধারণ	-ছিলোঙ্‌	-ইছিলোঙ্‌
			সম্ভ্রমার্থক	-ছিলোঙ্‌	-ইছিলোঙ্‌
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ছুলু	-উছুলু
			সম্ভ্রমার্থক	-ছিলেন্‌	-ইছিলেন্‌
		বহুবচন	সাধারণ	-ছিলেন্‌	-ইছিলেন্‌
			সম্ভ্রমার্থক	-ছিলেন্‌	-ইছিলেন্‌
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ইছেলো	-ইছেলো
			সম্ভ্রমার্থক	-ইছেলো	-ইছেলো
		বহুবচন	সাধারণ	-ইছেলো	-ইছেলো
			সম্ভ্রমার্থক	-ইছেলো	-ইছেলো

কাল	পুরুষ	বচন		স্বরান্ত ধাতু	ব্যঞ্জনান্ত ধাতু
সাধারণ ভবিষ্যত	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ইম্	-ইম্
			সম্ভ্রমার্থক	-ইম্	-ইম্
		বহুবচন	সাধারণ	-মো	-ইমো
			সম্ভ্রমার্থক	-মো	-ইমো
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-বু	-উবু
			সম্ভ্রমার্থক	-বেন্	-ইবেন্
		বহুবচন	সাধারণ	-বেন্	-ইবেন্
			সম্ভ্রমার্থক	-বেন্	-ইবেন্
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-বে	-ইবে
			সম্ভ্রমার্থক	-বে	-ইবে
		বহুবচন	সাধারণ	-বে	-ইবে
			সম্ভ্রমার্থক	-বে	-ইবে
ঘটমান ভবিষ্যত	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-বার্‌থক্কিম্	-ইবার্‌থক্কিম্
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্‌থক্কিম্	-ইবার্‌থক্কিম্
		বহুবচন	সাধারণ	-বার্‌থক্কিমো	-ইবার্‌থক্কিমো
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্‌থক্কিমো	-ইবার্‌থক্কিমো
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-বার্‌থক্কুবু	-ইবার্‌থক্কুবু
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্‌থক্কিবেন্	-ইবার্‌থক্কিবেন্
		বহুবচন	সাধারণ	-বার্‌থক্কিবেন্	-ইবার্‌থক্কিবেন্
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্‌থক্কিবেন্	-ইবার্‌থক্কিবেন্
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-বার্‌থক্কিবে	-ইবার্‌থক্কিবে
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্‌থক্কিবে	-ইবার্‌থক্কিবে
		বহুবচন	সাধারণ	-বার্‌থক্কিবে	-ইবার্‌থক্কিবে
			সম্ভ্রমার্থক	-বার্‌থক্কিবে	-ইবার্‌থক্কিবে

কাল	পুরুষ	বচন		অকারান্ত ধাতু	ব্যঞ্জনান্ত ধাতু
পুরাঘটিত বর্তমান	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ছুঙ্	-
			সম্ভ্রমার্থক	-ছুঙ্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-ছি	-
			সম্ভ্রমার্থক	-ছি	-
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ছিস্	-
			সম্ভ্রমার্থক	-ইছেন্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-ইছেন্	-
			সম্ভ্রমার্থক	-ইছেন্	-
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ইছে	-
			সম্ভ্রমার্থক	-ইছে	-
		বহুবচন	সাধারণ	-ইছে	-
			সম্ভ্রমার্থক	-ইছে	-
সাধারণ অতীত	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-লুঙ্	-
			সম্ভ্রমার্থক	-লুঙ্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-ইলোঙ্	-
			সম্ভ্রমার্থক	-ইলোঙ্	-
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-লু	-
			সম্ভ্রমার্থক	-ইলেন্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-ইলেন্	-
			সম্ভ্রমার্থক	-ইলেন্	-
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ইল্	-
			সম্ভ্রমার্থক	-ইল্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-ইল্	-
			সম্ভ্রমার্থক	-ইল্	-

কাল	পুরুষ	বচন		স্বরান্ত ধাতু	ব্যঞ্জনান্ত ধাতু
বর্তমান অতীত	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-এবার্ থক্ছুলুঙ্	-
			সম্মানার্থক	-এবার্ থক্ছুলুঙ্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-এবার্ থক্ছিনোঙ্	-
			সম্মানার্থক	-এবার্ থক্ছিনোঙ্	-
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-এবার্ থক্ছুলু	-
			সম্মানার্থক	-এবার্ থক্ছিনেন্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-এবার্ থক্ছিনেন্	-
			সম্মানার্থক	-এবার্ থক্ছিনেন্	-
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-এবার্ থইচ্ছেনো	-
			সম্মানার্থক	-এবার্ থইচ্ছেনো	-
		বহুবচন	সাধারণ	-এবার্ থইচ্ছেনো	-
			সম্মানার্থক	-এবার্ থইচ্ছেনো	-
পুরাঘটিত অতীত	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ছুলুঙ্	-
			সম্মানার্থক	-ছুলুঙ্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-ছিনোঙ্	-
			সম্মানার্থক	-ছিনোঙ্	-
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ছুলু	-
			সম্মানার্থক	-ছিনেন্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-ছিনেন্	-
			সম্মানার্থক	-ছিনেন	-
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ইচ্ছেনো	-
			সম্মানার্থক	-ইচ্ছেনো	-
		বহুবচন	সাধারণ	-ইচ্ছেনো	-
			সম্মানার্থক	-ইচ্ছেনো	-

কাল	পুরুষ	বচন		স্বরান্ত ধাতু	ব্যঞ্জনান্ত ধাতু
সাধারণ ভবিষ্যত	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-ইম্	-
			সম্ভ্রমার্থক	-ইম্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-মো	-
			সম্ভ্রমার্থক	-মো	-
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-বু	-
			সম্ভ্রমার্থক	-বেন্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-বেন্	-
			সম্ভ্রমার্থক	-বেন্	-
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-বে	-
			সম্ভ্রমার্থক	-বে	-
		বহুবচন	সাধারণ	-বে	-
			সম্ভ্রমার্থক	-বে	-
ঘটমান ভবিষ্যত	উত্তম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-এবার্ ধরিম্	-
			সম্ভ্রমার্থক	-এবার্ ধরিম্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-এবার্ ধরিমো	-
			সম্ভ্রমার্থক	-এবার্ ধরিমো	-
	মধ্যম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-এবার্ ধরবু	-
			সম্ভ্রমার্থক	-এবার্ ধরিবেন্	-
		বহুবচন	সাধারণ	-এবার্ ধরিবেন্	-
			সম্ভ্রমার্থক	-এবার্ ধরিবেন্	-
	প্রথম পুরুষ	একবচন	সাধারণ	-এবার্ ধরিবে	-
			সম্ভ্রমার্থক	-এবার্ ধরিবে	-
		বহুবচন	সাধারণ	-এবার্ ধরিবে	-
			সম্ভ্রমার্থক	-এবার্ ধরিবে	-

ক্রিয়ার ভাব

প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার ভাবে যে বৈচিত্র্য ছিল নব্যভারতীয় আর্য স্তরের ভাষা আধুনিক বাংলায় তা আর বজায় নেই। আধুনিক বাংলায় ক্রিয়ার ভাব মূলতঃ দুটি। (১) অবধারক বা নির্দেশক ভাব এবং (২) আজ্ঞা দ্যোতক বা নিয়োজক ভাব বা অনুজ্ঞা। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও ক্রিয়ার ভাব দুটি। (১) অবধারক বা নির্দেশক ভাব এবং (২) আজ্ঞা দ্যোতক বা নিয়োজক ভাব বা অনুজ্ঞা।

অবধারক বা নির্দেশক ভাব

ক্রিয়ার এই ভাব বোঝানোর জন্য উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ক্রিয়াপদের রূপে কোনো পরিবর্তন হয় না। ক্রিয়ার উত্তরে এই ভাবের দ্যোতক স্বতন্ত্র কোনো প্রত্যয়ও একেত্রে যুক্ত হয় না। উদাহরণ–

বর্তমান কাল

উদাঃ	একবচন	বহুবচন	
উত্তম পুরুষ	জাঙ্	জাই	'যাই'
মধ্যম পুরুষ	জাইস্	জান্	'যাও'
প্রথম পুরুষ	জায়	জায়	'যায়'

অতীত কাল

উত্তম পুরুষ	গেলুঙ্	গেইলোঙ্	'গেলাম'
মধ্যম পুরুষ	গেলু	গেইলেন্	'গেলে'
প্রথম পুরুষ	গেইল্	গেইল্	'গেল'

ভবিষ্যত কাল

উত্তম পুরুষ	জাইম্	জামো	'যাব'
মধ্যম পুরুষ	জাবু	জাবেন্	'যাবে'
প্রথম পুরুষ	জাবে	জাবে	'যাবে'

আজ্ঞা দ্যোতক বা নিয়োজক ভাব বা অনুজ্ঞা

ক্রিয়ার এই ভাব এই উপভাষায় কেবল মধ্যম এবং প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বর্তমান অনুজ্ঞা কালেই প্রযুক্ত হয়। তবে মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে কখনও কখনও ভবিষ্যত কালেও ক্রিয়ার এই ভাব প্রযুক্ত হয়। ক্রিয়ার এই ভাব নির্দেশে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় নিম্নবর্ণিত ক্রিয়াবিভক্তি সমূহ ব্যবহৃত হয়।

---

(৪) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭৫, ভল্যুম -২, পৃঃ ৮৯৯

ক্রিয়ার এই দুটি প্রধান ভাব ছাড়াও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ক্রিয়ার দুটি অপ্রধান ভাবও লক্ষ্য করা যায়। (১) ইচ্ছাদ্যোতক ভাব এবং (২) ঘটনান্তরাপেক্ষিত বা সংযোজক ভাব ।

ইচ্ছাদ্যোতক ভাব

বাংলায় সর্বনামীয় ক্রিয়াবিশেষণ 'যেন' যোগে ক্রিয়ার এই ভাব প্রকাশ করা হয়। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই সর্বনামীয় ক্রিয়াবিশেষণটি হ'ল 'যোনে'। সাধারণভাবে উত্তম, মধ্যম এবং প্রথম, এই তিনটি পুরুষেই ক্রিয়ার এই ভাব প্রযুক্ত হয়। উদাহরণ-

উত্তম পুরুষ	মুই যোনে দ্যাখোং,	'আমি যেন দেখি'	
মধ্যম পুরুষ	তুই যোনে দেখিস্,	'তুমি যেন দেখ'	
প্রথম পুরুষ	উয়ায় যোনে দ্যাখে	'সে যেন দেখে'	ইত্যাদি।

ঘটনান্তরাপেক্ষিত বা সংযোজক ভাব

সমুচ্চয়ী বা বাক্যান্বয়ী অব্যয় 'জদি' যোগে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ক্রিয়ার এই ভাব প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার অতীত কালের রূপ ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়ার পরে একটি অতিরিক্ত একটি পদ 'হয়' যুক্ত হয়। উদাহরণ-

উত্তম পুরুষ	মুই জদি দেখুলুং, হয়	'আমি যদি দেখতাম'	
মধ্যম পুরুষ	তুই জদি দেখুলু হয়	'তুমি যদি দেখতে'	
প্রথম পুরুষ	উয়ায় জদি দেখিল, হয়	'সে যদি দেখত'	ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া

গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলিকে মোট চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়।

(১) -'ই', -'ইয়া' যুক্ত ক্ত্বার্থ বা পূর্বকালিক অসমাপিকা ক্রিয়া

(২) -'ইলে' যুক্ত ভূতার্থ বা ভাবার্থ অসমাপিকা ক্রিয়া

(৩) -'ইতে' যুক্ত শত্রর্থ অসমাপিকা ক্রিয়া

(৪) -'ইব' এবং 'আর্'-এর সংমিশ্রণে উদ্ভূত -'ইবার্' এবং -'বার্' যুক্ত তুমর্থ বা উদ্দেশ্যক অসমাপিকা ক্রিয়া

ক্ত্বার্থ বা পূর্বকালিক অসমাপিকা ক্রিয়া

ডঃ সুকুমার সেনের মতে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের অপভ্রংশে এবং প্রাচীন বাংলা স্তরেই 'ই' যুক্ত

অসমাপিকা ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটেছিল।[৩] -'ইয়া' প্রত্যয়টি এই -'ই' প্রত্যয়ের সঙ্গে স্বার্থিক 'আ' প্রত্যয়ের যোগফলে উদ্ভূত। বলা যেতে পারে যে -'ইয়া' -'ই'-এর সম্প্রসারণ। প্রাচীন বাংলায় এই প্রত্যয়টিরও ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। মধ্যবাংলায় এই দুটি প্রত্যয়েরই দৌলঃপুণ্য প্রায় সমান। আধুনিক বাংলায় -'ই'-এর ব্যবহার কেবল পদ্যের কাব্যের ভাষাতেই সীমাবদ্ধ। গদ্যের ভাষায় এর প্রচলন নেই। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই দুটি প্রত্যয়েরই ব্যবহার রয়েছে এবং নার্থ অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনে এই দুটি প্রত্যয়ই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

-'ইয়া' যোগে - কর্-ইয়া=করিয়া 'করে'
দ্যাখ্-ইয়া=দেখিয়া 'দেখে'
শুন্-ইয়া=শুনিয়া 'শুনে' ইত্যাদি।

-'ই' যোগে- কর্-ই=করি 'করে'
দ্যাখ্-ই=দেখি 'দেখে'
পর্-ই=পরি 'পরে' ইত্যাদি।

কৃতার্থ বা ভাবার্থ অসমাপিকা ক্রিয়া

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় -'ইলে' প্রত্যয় যোগ করে কৃতার্থ বা ভাবার্থ অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন সম্পূর্ণ হয়। উদাহরণ-

চর্-ইলে=চরিলে 'আরোহণ করলে'
শুন্-ইলে=শুনিলে 'শুনলে'
দাখ্-ইলে=দেখিলে 'দেখলে'
কর্-ইলে=করিলে 'করলে' ইত্যাদি।

মূলধাতু স্বরান্ত হলেও তার উত্তরে -'ইলে' প্রত্যয় যোগ করে এইভাবে অসমাপিকা কৃতার্থ বা ভাবার্থ অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করা হয়। উদাহরণ-

চা-ইলে=চাইলে 'চাইলে'
পা-ইলে=পাইলে 'পেলে'
খা-ইলে=খাইলে 'খেলে' ইত্যাদি।

সত্রর্থ অসমাপিকা ক্রিয়া

প্রাচীন বাংলায় -'ন্তে'-অন্ত সত্রর্থ অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন- 'চিন্তা চিন্তন্তে পোহাই গেলী রাতি' (= চিন্তা করতে করতে রাত পোহাল)। উত্তরবঙ্গের উপভাষায়

---

(৩) সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৩০

-'ইতে' প্রত্যয় যোগ করে সমার্থ অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে একমাত্র ক্রিয়ার দ্বিত্ব ঘটলেই এই উপভাষায় মূলধাতুর উত্তরে -'ইতে' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সমার্থ অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করে। উদাহরণ-

নাচ্-ইতে নাচ্-ইতে=নাচিতে নাচিতে 'নাচতে নাচতে'

কর্-ইতে কর্-ইতে=করিতে করিতে 'করতে করতে'

দ্যাখ্-ইতে দ্যাখ্-ইতে=দেখিতে দেখিতে 'দেখতে দেখতে' ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধাতুর উত্তরে -'ই' প্রত্যয় যোগ করেও সমার্থ অসমাপিকার রূপ গঠন করা হয়। উদাহরণ-

নাচ্-ই নাচ্-ই=নাচি নাচি 'নেচে নেচে'

দ্যাখ্-ই দ্যাখ্-ই=দেখি দেখি 'দেখে দেখে' ইত্যাদি।

তুমর্থ বা উদ্দেশ্যাত্মক অসমাপিকা ক্রিয়া

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ইব +আর থেকে নিষ্পন্ন প্রত্যয় ইবার্ -'ইবার্' এবং তার সংক্ষিপ্ত রূপ -'বার্' যথাক্রমে ব্যঞ্জনান্ত এবং স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে যুক্ত হয়ে তুমর্থ অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করে। উদাহরণ-

-'ইবার্' যোগে- কর্-ইবার্=করিবার্ 'করতে'

ন্যাখ্-ইবার্=নেখিবার্ 'লিখতে'

দ্যাখ্-ইবার্=দেখিবার্ 'দেখতে' ইত্যাদি।

-'বার্' যোগে- চা-বার্=চাবার্ 'চাইতে'

খা-বার্=খাবার 'খেতে'

জা-বার্=জাবার্ 'যেতে' ইত্যাদি।

তুমর্থ অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই উপভাষায় -'ইতে' প্রত্যয়ের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। উদাহরণ-

কর্-ইতে=করিতে 'করার ব্যাপারে'

দ্যাখ্-ইতে=দেখিতে 'দেখার ব্যাপারে'

চা-ইতে=চাইতে 'চাওয়ার ব্যাপারে'

খা-ইতে=খাইতে 'খাওয়ার ব্যাপারে'

পা-ইতে=পাইতে 'পাওয়ার ব্যাপারে' ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়া

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়াটির অর্থই বজায় থাকে, দ্বিতীয় ক্রিয়াটির অর্থ প্রথম ক্রিয়াটির অর্থে পূর্ণতা, সমাপ্তি, নিত্যতা, প্রারম্ভিকতা, অবধারণা, বিশদতা, আকস্মিকতা, অনুমোদন বা অনুমতি ইত্যাদি ভাব যোজনা করে। এক্ষেত্রে যৌগিক বা প্রথম ক্রিয়াটির সহকারী ক্রিয়াতেই বচন, কাল এবং পুরুষজ্ঞাপক বিভক্তি যুক্ত হয় এবং যৌগিক ক্রিয়াটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসমাপিকা হয়। প্রধানতঃ √ধর্, √পড়্, √নে, √দে, √জা, √থু, √থাক্, √ফ্যাল্, √চা, √পা, √পার্, √যাগ্ ইত্যাদি ধাতু (১) -'ইর্', -'ইবার্', -'এর্', -'এবার্', -'বার্' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার সঙ্গে এবং (২) -'ই', -'ইয়া', -'এ', -'এয়া' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠনে সাহায্যকারী ক্রিয়ার ভূমিকা পালন করে থাকে।

(১) -'ইর্', -'ইবার্', -'এর্', -'এবার্', -'বার্' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার সঙ্গে সহায়ক ক্রিয়া যোগে সৃষ্ট যৌগিক ক্রিয়া ঃ

এই জাতীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সহায়ক ক্রিয়া যোগে নিম্নোক্ত প্রকারের যৌগিক ক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

(ক) প্রারম্ভিকতা বোধক (√ধর্ ধাতু যোগে) – সমস্ত প্রকারের সিদ্ধ ধাতু, সাধিত ধাতু, নামধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু এবং বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ যোগে সৃষ্ট যৌগিক ধাতুর উত্তরে -ইর্, -ইবার্, -এর্, -এবার্, -বার্ ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে তার সঙ্গে √ধর্ ধাতু যোগ করলে প্রারম্ভিকতা বোধক যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। উদাহরণ–

খাবার্-ধর্ 'খেতে শুরু করা'
করির্-ধর্ 'করতে শুরু করা'
হ-বার্-ধর্ 'হতে শুরু করা'
জাবার্-ধর্ 'যেতে শুরু করা' ইত্যাদি।

(খ) ইচ্ছাবোধক (√চা ধাতু যোগে) ঃ এক্ষেত্রেও -ইর্, -ইবার্, -এর্, -এবার্, -বার্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার উত্তরে √চা ধাতু যোগ করলে ইচ্ছা বোধক যৌগিক ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়।

উদাহরণ– দেখির্-চা 'দেখতে চাওয়া'
করিবার্-চা 'করতে চাওয়া'
দ্যাখেবার্-চা 'দেখাতে চাওয়া'
উদিশ্ করিবার্-চা 'খোঁজ করতে চাওয়া' ইত্যাদি।

(গ) অনুমতি জ্ঞাপক বা অনুমোদনাত্মক (√দে ধাতু যোগে) ঃ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত যে কোনো ধাতুর উত্তরে পূর্বে উল্লিখিত প্রত্যয়গুলি যোগ করে তার সঙ্গে √দে ধাতু যোগ করে

অনুমতি জ্ঞাপক বা অনুমোদনাত্মক যৌগিক ক্রিয়া সৃষ্টি হয়।করা হয়। উদাহরণ-

করির্-দে 'করতে দেওয়া'

বলিবার্-দে 'বলতে দেওয়া'

করেবার্-দে 'করাতে দেওয়া ইত্যাদি।

(ঘ) শক্যতা বোধক (√পা এবং √পার্ ধাতু যোগে) ঃ উদাহরণ-

করির্-পা/পার্ 'করতে পারা'

করিবার্-পা /পার্ 'করতে পারা'

নাচিবার্-পা/পার্ 'নাচতে পারা'

নাচেবার্-পা/পার্ 'নাচাতে পারা' ইত্যাদি।

(ঙ) সামর্থ্য বোধক (√পা ধাতু যোগে) ঃ উদাহরণ-

দেখির্-পা 'দেখতে পাওয়া'

খাবার্-পা 'খেতে পাওয়া'

বুঝিবার্-পা 'বুঝতে পারা' ইত্যাদি।

(চ) নিরন্তরতা বোধক (√থাক্ ধাতু যোগে) ঃ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় √থাক্ ধাতু যোগে নিরন্তরতা বোধক যৌগিক ক্রিয়া গঠন করতে হলে ধাতুর উত্তরে -ইতে প্রত্যয় যুক্ত হয়। উদাহরণ-

করিতে থাক্ 'করতে থাকা'

করাইতে থাক্ 'করাতে থাকা'

দেখিতে থাক্ 'দেখতে থাকা' ইত্যাদি।

(২) -'ই', -'ইয়া', -'এ', -'এয়া' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার সঙ্গে সহায়ক ক্রিয়া যোগে সৃষ্ট যৌগিক ক্রিয়া ঃ

এই জাতীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সহায়ক ক্রিয়ার যোগে নিম্নোক্ত প্রকারের যৌগিক ক্রিয়া গঠন করা হয়।

(ক) পূর্ণতা বোধকঃ √ফ্যাল্, √দে এবং √দে ধাতু যোগে এই শ্রেণীর যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। উদাহরণ-

√ফ্যাল্ যোগে- ভাঙি-ফ্যাল্ 'ভাঙাক্রিয়া সম্পন্ন করা'

করি-ফ্যাল্ 'করা ক্রিয়া সম্পন্ন করা'

দেখি-ফ্যাল্ 'দেখা ক্রিয়া সম্পন্ন করা' ইত্যাদি।

√দে যোগে দেখি-দে 'দেখা ক্রিয়া সম্পন্ন করা'

করি-দে 'করা ক্রিয়া সম্পন্ন করা' ইত্যাদি।

√দে যোগে- ক্যাচে-দে 'কেনা ক্রিয়া সম্পন্ন করা'

তাড়ি-দে 'তাড়া ক্রিয়া সম্পন্ন করা'

মাইচি-দে 'মাচির মতো দেখানো ক্রিয়া সম্পন্ন করা' ইত্যাদি।

(খ) প্রারম্ভিকতা বোধক : √উঠ্, √জা, এবং √পড়্ যোগে এই জাতীয় যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। উদাহরণ-

√উঠ্ যোগে- হাসি-উঠ্ 'হেসে ওঠা'

কান্দি-উঠ্ 'কেঁদে ওঠা'

নাচি-উঠ 'নেচে ওঠা' ইত্যাদি।

√জা যোগে- লাগি-জা 'লেগে যাওয়া'

আসি-জা 'আসতে শুরু করা'

বসি-জা 'বসতে শুরু করা' ইত্যাদি।

√পড়্ যোগে- লাগি-পড়্ 'লেগে পড়া'

লাফ্ফি-পড়্ 'লাফিয়ে পড়া'

উঠি-পড়্ 'উঠে পড়া' ইত্যাদি।

(গ) স্থায়িত্ব বা নিত্যতা বোধক : √থাক্ ধাতু যোগে এই শ্রেণীর যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। উদাহরণ -

বসি-থাক্ 'বসে থাকা'

জাগি-থাক্ 'জেগে থাকা'

লাগি-থাক্ 'লেগে থাকা'

চায়া-থাক্ 'চেয়ে থাকা' ইত্যাদি।

(ঘ) নিরন্তরতা বোধক : √জা ধাতু যোগে এই জাতীয় যৌগিক ক্রিয়ার গঠন সম্পূর্ণ হয়। উদাহরণ-

করি-জা 'করে যাওয়া'

বকি-জা 'বকে যাওয়া'

ব্যাকব্যাক্ ব্যাকে-জা 'অর্থহীন কথা বলে যাওয়া' ইত্যাদি।

(ঙ) অবধারণ, বিশদতা বা নিষ্ক্রিয়তা বোধক : √দে, √নে, √জা, √আস্ এবং √পড়্ ধাতু যোগে এই শ্রেণীর যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। উদাহরণ-

√দে যোগে- বুঝি-দে 'বুঝিয়ে দেওয়া'

দিয়া-দে 'দিয়ে দেওয়া' ইত্যাদি।

√নে যোগে-	বুঝি-নে	'বুঝিয়ে নেওয়া'
	দেখি-নে	'দেখে নেওয়া' ইত্যাদি।
√জা যোগে-	চলি-জা	'চলে যাওয়া'
	ফিরি-জা	'ফিরে যাওয়া' ইত্যাদি।
√আশ্ যোগে-	চলি-আশ্	'চলে আসা'
	ঘুরি-আশ্	'ফিরে আসা' ইত্যাদি।
√পর্ যোগে	লাফ্‌পি-পর্	'লাফিয়ে পড়া'
	ঝুকি নাগি-পর্	'ঝুকে পড়া' ইত্যাদি।

(চ) অভ্যাস বোধক : √থাক্ ধাতু যোগে এই শ্রেণীর যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। উদাহরণ-

কয়া-থাক্	'বলে থাকা'
করি-থাক্	'করে থাকা' ইত্যাদি।

(ছ) পরীক্ষা বা অনুমোদন বোধক : √দ্যাখ্ এবং √বুঝ্ ধাতু যোগে এই জাতীয় যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। উদাহরণ-

√দ্যাখ্ যোগে-	করি-দ্যাখ্	'করে দেখা'
	বুঝি-দ্যাখ্	'বুঝে দেখা' ইত্যাদি।
√বুঝ্ যোগে-	করি-বুঝ্	'করে বোঝা'
	চায়া-বুঝ্	'চেয়ে বোঝা' ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত প্রকারের যৌগিক ক্রিয়া ছাড়াও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় আর এক ধরণের যৌগিক ক্রিয়া আছে যেখানে একটি ক্রিয়া অন্যটির সহায়ক নয় এবং দুটি ক্রিয়ার অর্থই স্বাধীন এবং তুল্যমূল্য। এই জাতীয় যৌগিক ক্রিয়ার কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

দ্যাখা-শুনা-কর্	'দেখা-শুনা করা'
ধরা-বান্ধা-কর্	'ধরা-বাঁধা করা'
দ্যাখ্-ভাল্-কর্	'তত্ত্বাবধান করা'
খায়্দায়্-কর্	'খাওয়া-দাওয়া করা'
দাওয়া-ধোওয়া-কর্	'দেওয়া-থোওয়া করা' ইত্যাদি।

অব্যয়

সমুচ্চয়ী বা বাক্যানুগী

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত সমুচ্চয়ী বা বাক্যানুগী অব্যয়গুলিকে নিম্নোক্ত শ্রেণীগুলিতে বিন্যস্ত করা যায়।

(১) সংযোজক : মাত্র একটি সংযোজক অব্যয় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। এই অব্যয়টি হ'ল 'আর্'। উদাহরণ-

মুই আর্ তুই জামো — 'আমি এবং তুমি যাব'
ভাইল্ আর্ ভাত্ খা — 'ডাল এবং ভাত খাও' ইত্যাদি।

(২) বিয়োজক বা বৈকল্পিক : 'নাহয়','নাহেন্' ,'নাহইলে' এবং 'বা' , এই চারটি বিয়োজক অব্যয়ের ব্যবহার উত্তরবঙ্গের উপভাষায় লক্ষ্য করা গিয়েছে। উদাহরণ-

তুই নাহয় মুই — 'তুমি অথবা আমি'
তুই আসুবু, নাহেন্ মুই জাইম্ — 'তুমি আসবে, নাহলে আমি যাব'
তুই বা মুই গেইলে চলিবে — 'তুমি অথবা আমি গেলে চলবে' ইত্যাদি।

(৩) সংকোচক :'তবু','তাও','তাও্','কিন্তুক্' ,'বুলুক' ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের উপভাষার সংকোচক অব্যয়। উদাহরণ-

ভাঙিবে তবু মচ্‌কিবে না — 'ভাঙবে তবু মচকাবে না'
দেখিবে কিন্তুক কিছু কবে না — 'দেখবে কিন্তু কিছু বলবে না'
মুই বুলুক্ বাড়ি জাও্ — 'আমি বরং বাড়িতে যাই' ইত্যাদি।

(৪) প্রশ্নসূচক :'কি', 'বোলে','নাকি','ক্যামোন্' ইত্যাদি প্রশ্নসূচক অব্যয় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত। উদাহরণ-

তুই কি জাবু — 'তুমি কি যাবে'
উয়ায় বোলে বাড়ি গেইছে — 'সে নাকি বাড়িতে গিয়েছে'
তুই নাকি জাবার্ চাইস্ — 'তুমি নাকি যেতে চাও' ইত্যাদি।

(৫) কারণাত্মক : উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ব্যবহৃত কারণাত্মক অব্যয়গুলি হ'ল 'বলি','বুলি', 'কারন্' ,'কাজে','কাজে-কাজে','ক্যানেনা' ইত্যাদি। উদাহরণ-

খাইম্ বলি হাত্ ধুছুও্ — 'খাব বলে হাত ধুয়েছি'
উয়ায় খাটে, কাজে-কাজে ফল্ পাবে — 'সে পরিশ্রম করে, কাজে ফল পাবে'
পালাও, ক্যানেনা বন্দুকান্ আসিবে — 'পালাও, কেননা বন্দুক আসবে' ইত্যাদি।
মুই জাইম, কারণ মোর জাওয়া খায় — 'আমি যাব, কারণ আমাকে যেতে হয়।' ইত্যাদি।

(৬) সিদ্ধান্তসূচক ঃ 'কাজে-কাজে', 'এইবাদে', 'এইজইন্যে', 'এই ভাবে' ইত্যাদি সিদ্ধান্ত-সূচক অব্যয় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত। উদাহরণ-

উমার্ পাইসা নাই, কাজে কাজে গরিব্ ভাবে চলির্ নাগে — 'ওর পয়সা নেই, কাজেই ওকে গরিব ভাবে চলতে হয়'

তুই আসুন্ না, ঐবাদে মুইও যেনুও্ না — 'তুমি এলেনা বলে আমিও গেলাম না' ইত্যাদি।

(৭) সংশয়সূচক ঃ 'বুঝি', 'পাছে', 'তবে', 'নাকি', 'বোধায়', এই পাঁচটি সংশয়সূচক অব্যয় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সমধিক প্রচলিত। উদাহরণ-

বান্ বুঝি আসিল্ — 'বন্যা বুঝি এল'

পাছে তুই মোর্ কথা ভুলি যাইস্ — 'পাছে তুমি আমার কথা ভুলে যাও'

বান্ জদি আইসে তবে কি করিমো — 'বন্যা যদি আসে তবে কি করব'

উয়ায় গেইল নাকি কায় জানে — 'সে গেল কিনা কে জানে'

এবার্ মঙ্গা হবে বোধায় — 'এবার দুর্ভিক্ষ হবে বোধ হয়'

মুই প্যাকোব্ পাগেলায় হয়া জাইম — 'আমি বোধ হয় পাগলই হয়ে যাব' ইত্যাদি।

(৮) নিত্য সম্বন্ধীয় বা সাপেক্ষ ঃ 'জদি-তাহইলে', 'জ্যামোন্-ত্যামোন্', 'বুরুক্-তাহো' ইত্যাদি নিত্যসম্বন্ধীয় বা সাপেক্ষ অব্যয় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ব্যবহৃত হয়।

তুই জদি মোক্ দেখিস্, তাহইলে মুইও তোক দেখিম্ — 'তুমি যদি আমাকে দেখ, তাহলে আমিও তোমাকে দেখব'

জ্যামোন্ গছ্ ত্যামোন্ ফল্ — 'যেমন্ গাছ তেমন ফল'

মুই বুরুক্ নাখায়া থাকিম্ তাহো চাকরি করিম্ না — 'আমি বরং না খেয়ে থাকব তবু চাকরি করব না' ইত্যাদি।

ভাববোধক বা অনন্বয়ী অব্যয়

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত অনন্বয়ী বা ভাববোধক অব্যয়গুলিকে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

(১) আহ্বানসূচক বা সম্বোধনাত্মক ঃ 'হায়', 'হৌর্', 'বারে', 'ও', 'এই', 'গে', 'হাগে', ইত্যাদি আহ্বানসূচক অব্যয় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত। উল্লেখ্য যে 'হায়', 'হৌর্', 'গে' এবং 'হাগে' শুধু মহিলাদের ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

হায়- তুই কোটে জাবু হায় — 'তুমি কোথায় যাবে গো'

ও- ও ললিত্ তুমি জা 'ও ললিত তুমি যাও'

বাহে- বাহে, তোমরা কোটে জান্ 'বাবারে, তোমরা কোথায় যাচ্ছো'

হাগে- হাগে, তুই কি মোর্ মাও 'ওগো, তুমি কি আমার মা' ইত্যাদি।

(২) ভয় বা দুঃখসূচক ঃ 'বাপেরে', 'মাউয়ো', 'মিমাবুন্', 'উঃ', 'আঃ', 'ওহো', প্রধানতঃ এই কটি ভয় এবং দুঃখসূচক অব্যয় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় লক্ষ করা গিয়েছে। উদাহরণ-

বাপেরে- বাপেরে, ভচ্কুরি বাঘ্ আসিল্ 'বাবারে, সত্য সত্যই বাঘ এল'

মাউয়ো- মাউয়ো, অ্যানা কি করোছ্ 'মাগো, এমন কি করি'

ওহো- ওহো, মান্ষিটা মরি গেইল্ 'আহা, লোকটা মারাই গেল' ইত্যাদি।

(৩) প্রশংসাসূচক ঃ 'সাবাস্', 'বেইস্', 'চমোতকার্' ইত্যাদি প্রশংসাসূচক অব্যয় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় পাওয়া গিয়েছে। উদাহরণ-

সাবাস্ ব্যাটা, কামের্ কাম্ করিস্ 'সাবাশ বেটা, কাজের মত কাজ করেছ'

তোর গান্ খান্ চমোতকার্ হইছে 'তোমার গানখানি সুন্দর হয়েছে'

বেইস্ কথা কলু 'বেশ কথা বলেছ' ইত্যাদি।

(৪) বিস্ময়সূচক ঃ 'আইয়ো', 'বাঃ', 'ওরে' ইত্যাদি বিস্ময়সূচক অব্যয় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সর্বাধিক প্রচলিত। উদাহরণ-

আইয়ো, কি সুন্দোর্ বারি 'বাঃ কি সুন্দর বাড়ি'

বাঃ পখিটা কি সুন্দোর্ 'বা পাখিটা কি সুন্দর' ইত্যাদি।

(৫) ঘৃণা বা বিরক্তিসূচক ঃ 'ছিঃ', 'দেই', 'দেই-দেই', 'ছিকো', 'দেইত্', 'দেইতভারি', 'ধোর্' ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সর্বাধিক বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত ঘৃণা এবং বিরক্তিসূচক অব্যয়। উদাহরণ-

ছিঃ তুই ভাল্ মান্ষি নোহাইস্ 'ছিঃ, তুমি ভাল মানুষ নও'

দেইত্, মুই যাজাইমুরে 'দুর্ আমি যাব না রে' ইত্যাদি।

(৬) অনুমোদনাত্মক ঃ 'আচ্ছা', 'হ্যা', 'বেইস-বেইস্', এই কটি অনুমোদনাত্মক অব্যয় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় পাওয়া গিয়েছে। উদাহরণ-

আচ্ছা, তোর জিত্তি মন্ জা 'আচ্ছা, তোমার যেখানে খুশি যা'

হ্যা, ঠিক্ কথা কহিস্ 'হ্যা, ঠিক কথা বলেছ' ইত্যাদি

(৭) সম্মতিসূচক : 'আচ্ছা', 'ঠিক্‌আছে', 'হ্যাঁ', 'হয় হয়' ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সর্বাধিক প্রচলিত সম্মতিসূচক অব্যয়। উদাহরণ–

আচ্ছা, জা তাহইলে — 'আচ্ছা, যাও তাহলে'

ঠিক্‌আছে, তোরে কথা মতো কাজ হবে — 'ঠিক আছে তোমার কথামত কাজ হবে'

হয় হয়, ঐটা কথায় ঠিক্‌ — 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ কথাই ঠিক' ইত্যাদি।

(৮) অসম্মতিসূচক : 'নোহায়', 'হবার্‌নয়', 'নোমায়', 'না', 'না না', উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই চারটি অসম্মতিসূচক অব্যয়ের ব্যবহার প্রচলিত। উদাহরণ–

নোহায়, হোটা কথা ঠিক্‌নোহায় — 'না, ওকথা ঠিক নয়'

হোটা কাম্‌হবার্‌নয় — 'ও কাজ হবে না'

না না, তুমি না জাইস্‌ — 'না-না, ওদিকে যেওনা' ইত্যাদি।

(৯) শোক বা খেদসূচক : শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় 'হায়', 'হায় হায়, 'হায়রে', 'আহা', 'ওহো' ইত্যাদি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ–

হায় মোর্‌পোড়া কপালরে — 'হায় আমার পোড়া কপাল'

হায় হায়, মোর্‌সউক্‌গেইল্‌ — 'হায় হায়, আমার সব গেল'

হায়রে, মোর্‌দুখের কথা কাক্‌কইম্‌ — 'হায়রে, আমার দুঃখের কথা কাকে বলব' ইত্যাদি।

(১০) করুণাসূচক : উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ব্যবহৃত করুণাসূচক অব্যয়গুলির মধ্যে 'ওহোরে', 'ব্যাচেরা', 'হায় মোর্‌কপাল্‌' ইত্যাদি [illegible] সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ–

ওহোরে, মানষিটার্‌দুখোতে দিন্‌গ্যালো — 'আহারে, মানুষটার দুঃখেই দিন কাটল'

ব্যাচেরা অপোঘাতটা মরোন্‌মরিল্‌ — 'বেচারা অপঘাতে মারা গেল'

হায় মোর্‌কপাল্‌, তুই অ্যালাও খাইস্‌ নাই — 'আহা, তুমি এখনও খাওনি' ইত্যাদি।

(১১) অনুকারাত্মক : উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত অনুকারাত্মক অব্যয়গুলির অধিকাংশই ক্রিয়া বিশেষণস্থানীয়। এই জাতীয় কয়েকটি অব্যয় এবং তাদের বাক্যে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল।

'ঢোক্‌-ঢোক্‌' — ঢোক্‌-ঢোক্‌করি জল্‌খালুক্‌ — 'ঢক-ঢক করে জল খেলাম'

'ডোক্‌-ডোক্‌' — ডোক্‌-ডোক্‌করি দ্যাখান্‌ — 'স্পষ্টভাবে দেখালে'

'ভুচুর্‌-ভুচুর্‌' — ভুচুর্‌-ভুচুর্‌করি বিরায় — 'হঠাৎ-হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে'

'খাপাউ-খাপাউ' — খাপাউ-খাপাউ করি খায় — 'গপ্‌-গপ্‌করে খায়' ইত্যাদি।

অনুসর্গ

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় অনুসর্গ বা পদানুগী অব্যয়ের সংখ্যা শিষ্ট বাংলার তুলনায় কম। নিম্নলিখিত অনুসর্গগুলি এই উপভাষায় ব্যবহৃত হয়।

(১) আগ্+ত(অধিকরণের)=আগোত্ : বিশেষ্য বা সর্বনামের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে অধিকরণ কারক নির্দেশ করে বা অবস্থিতি বোঝায়। উদাহরণ-

তোর্ আগোত্ — 'তোমার সম্মুখে'
মোর্ আগোত্ — 'আমার সম্মুখে' ইত্যাদি।

(২) করি, করিয়া : বিশেষ্যের অথবা বিশেষণের কর্তৃ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়া-বিশেষণের কাজ করে। উদাহরণ-

ভাল্ করি — 'ভাল করে'
জত্নোব্ করি — 'যত্ন করে'
জোর্ করি — 'জোরের সঙ্গে' ইত্যাদি।

(৩) কাইনট্+ত(অধিকরণের)=কাইনটাত্ : বিশেষ্য বিশেষণ এবং সর্বনামের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকরণ কারক নির্দেশ করে বা অবস্থিতি বোঝায়। উদাহরণ-

বারির্ কাইনটাত্ — 'বাড়ির কাছে'
মোর্ কাইনটাত্ — 'আমার কাছে' ইত্যাদি।

(৪) কারনে 'কারণে' : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হেতু এবং তাদর্থ্যের ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

তোর্ কারনে এইলা হইল্ — 'তোমার জন্য এগুলি হ'ল' (হেতু)
তোর্ কারনে আসিলুং — 'তোমার জন্য এলাম' (তাদর্থ্য) ইত্যাদি।

(৫) চাইতে 'চেয়ে' : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুলনার ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

তোর্ চাইতে ভাল্ — 'তোমার চেয়ে ভাল'
গছের্ চাইতে উচা — 'গাছের চেয়ে উঁচু' ইত্যাদি।

(৬) চায়া, চাই 'অপেক্ষা' : চাইতে-এর মতই সমার্থক এই অনুসর্গ দুটি বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামপদের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুলনার ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

পাহারের্ চায়া/চাই বরো — 'পাহাড়ের চেয়ে বড়'
তোর্ চায়া/চাই চালাক্ — 'তোমার চেয়ে চালাক' ইত্যাদি।

(৭) ছাড়া 'ব্যতীত' ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ বা সর্বনামের কর্তৃ এবং কর্ম কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'ব্যতীত' বা বিযুক্তির ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

মুই ছাড়া	'আমি ব্যতীত'
মোক্ ছাড়া	'আমাকে ছাড়া'
কাপোর্ ছাড়া	'কাপড় ছাড়া' ইত্যাদি।

(৮) জইনহুনে 'জন্য' ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদর্থ্য প্রকাশ করে। উদাহরণ-

গরুর্ জইনহুনে জল্	'গরুর জন্য জল'
তোমার্ জইনহুনে মুই	'তোমাদের জন্য আমি' ইত্যাদি।

(৯) ঠে 'স্থানে' ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামপদের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকরণ কারক নির্দেশ করে। উদাহরণ-

মানশির্ঠে	'মানুষের কাছে'
তোর্ঠে	তোমার কাছে' ইত্যাদি।

(১০) তানে 'জন্য' ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদর্থ্য প্রকাশ করে। উদাহরণ-

কার্ তানে	'কার জন্য'
তোর্ তানে	'তোমার জন্য' ইত্যাদি।

(১১) তোকোন্ 'জন্য': এই অনুসর্গটিও বিশেষ্য, বিশেষণ বা সর্বনামের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদর্থ্যের ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

তোর্ তোকোন্	'তোমার জন্য'
তোর্ ভালের তোকোন্	'তোমার ভালোর জন্যই' ইত্যাদি।

(১২) থাকি 'থেকে' ঃ বিশেষ্য এবং সর্বনামপদের কর্তৃ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপাদান কারকের ভাব এবং সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুলনার ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

গছ্ হাতে	'গাছ থেকে'
তোর্ থাকি	'তোমার চেয়ে'
সগারে থাকি	'সকলের চেয়ে' ইত্যাদি।

(১৩) থান্+ত(অধিকরণের)=থানোত্ 'স্থানে' : বিশেষ্য এবং সর্বনামপদের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকরণ কারক নির্দেশ করে। উদাহরণ-

ঠাকুরের্ থানোত্ 'ঠাকুরের স্থানে বা কাছে'

মোর্ থানোত্ 'আমার কাছে' ইত্যাদি।

(১৪) দিয়া 'দিয়ে' : প্রাণিবাচক বিশেষ্য এবং সর্বনামের কর্ম কারকের রূপের সঙ্গে এবং অপ্রাণিবাচক বিশেষ্য এবং বস্তুবাচক সর্বনামের কর্তৃ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে করণ কারকের ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

নরেনোক্ দিয়া 'নরেনকে দিয়ে'

তোক্ দিয়া 'তোমাকে দিয়ে'

কুরাল্ দিয়া 'কুড়াল দিয়ে'

জা দিয়া 'যা দিয়ে' ইত্যাদি।

(১৫) দারা 'দ্বারা' : বিশেষ্য,বিশেষণ এবং সর্বনামের কর্তৃ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে করণ এবং অনুক্ত কর্তা নির্দেশ করে। উদাহরণ-

গরুর্ দারা চাশ্ করে 'গরু দিয়ে চাষ করে'

ভালের্ দারা ভাল্ কাজ্ হয় 'ভালোকে দিয়ে ভাল কাজ হয়' ইত্যাদি।

(১৬) নিমিত্তে 'নিমিত্ত' : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনাম কারকের পদের সম্বন্ধ কারকের রূপে যুক্ত হয়ে তাদর্থ্য নির্দেশ করে। উদাহরণ-

গরুর্ নিমিত্তে ঘাশ্ 'গরুর জন্য ঘাস'

তোর্ নিমিত্তে কায় 'তোমার জন্য কে' ইত্যাদি।

(১৭) নাগি, নাগিয়া 'জন্য' : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামের সম্প্রদান এবং সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমার্থক নাগি এবং নাগিয়া হেতু এবং তাদর্থ্য প্রকাশ করে। উদাহরণ-

তোক্ নাগি/নাগিয়া 'তোমার জন্য' (হেতু)

ভালোক্ নাগি/নাগিয়া 'ভালোর জন্য' (তাদর্থ্য)

(১৮) তল্+ত(অধিকরণের)=তলোত্ 'নীচে' : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকরণ কারক নির্দেশ করে। উদাহরণ-

শামিয়ানার্ তলোত্ 'শামিয়ানার নীচে'

মোর্ তলোত্ 'আমার অধীনে' ইত্যাদি।

(১৯) নিচা+ত(অধিকরণের)=নিচাত্ 'নীচে' বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামপদের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তলোত্-এর মতই অধিকরণ কারকের ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

পয়ের্ নিচাত্ 'পায়ের নীচে'

মোর্ নিচাত্ 'আমার নীচে, নিম্নপদে' ইত্যাদি।

(২০) উপোর্ 'উপর' : বিশেষ্য এবং সর্বনামপদের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকরণ কারকের ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

চালের্ উপোর্ 'চালের উপরে'

পয়ের্ উপোর্ 'পায়ের উপরে' ইত্যাদি।

(২১) পাখ্+এ(অধিকরণের)=পাখে 'দিকে': বিশেষ্যের কর্তৃ এবং সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে এবং সর্বনামের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকরণ কারক এবং অভিমুখীনতা নির্দেশ করে। উদাহরণ-

ডাইন্ পাখে 'ডান দিকে'

উয়ার্ পাখে 'তার দিকে'

দখিন্ পাখে 'দক্ষিণ দিকে' ইত্যাদি।

(২২) পাছ্+ত(অধিকরণের)=পাছোত্ 'পরে', 'পিছনে', 'সঙ্গে' : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামপদের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রম, সহিতত্ব এবং অধিকরণ কারক নির্দেশ করে। উদাহরণ-

তোর্ পাছোত্ কায় 'তোমার পরে কে'

তোর্ পাছোত্ সগায় আছে 'তোমার সঙ্গে সকলেই আছে'

মোর্ পাছোত্ উয়ায় 'আমার পিছনে সে' ইত্যাদি।

(২৩) লগ্ > নগ্+ত্ (অধিকরণের) = নগোত্ 'সঙ্গে' : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামপদের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহিতত্বের ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

তোর্ নগোত্ কায় আছে 'তোমার সঙ্গে কে আছে'

মোর্ নগোত্ মান্সি আছে 'আমার সঙ্গে মানুষ আছে' ইত্যাদি।

(২৪) দি 'দিয়ে' : দি দিয়ারই সংক্ষিপ্ত রূপ। এর ব্যবহারবিধি এবং তাৎপর্যও দিয়ার মত। উদাহরণ-

শাক্ দি মাছ্ ঢাকা 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'

কি দি ভাত্ খালু 'কি দিয়ে ভাত খেলে' ইত্যাদি।

(২৫) পাশ্+ত(অধিকরণের)=পাশোত্ 'কাছে' : [illegible] কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকরণ কারক নির্দেশ করে। উদাহরণ-

(৩২) ভিত্তি 'দিকে','কাছে' : পদের কর্তৃ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিমুখিতা এবং সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকরণ কারকের ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

কোন্ ভিত্তি 'কোন দিকে'

বাড়ির্ ভিত্তি 'বাড়ির দিকে,কাছে' ইত্যাদি।

(৩৩) মাঝ্+ত(অধিকরণের)=মাঝোত্ 'মধ্যে' : পদের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকরণ কারকের ভাব নির্দেশ করে। উদাহরণ-

ঘরের্ মাঝোত্ 'ঘরের মধ্যে'

দোলার্ মাঝোত্ 'মাঠের মধ্যে' ইত্যাদি।

(৩৪) মইদ্ধ্যা+ত(অধিকরণের)=মইদ্ধ্যাত্ 'মধ্যে' : পদের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকরণ কারক নির্দেশ করে। উদাহরণ-

ইয়ার্ মইদ্ধ্যাত্ 'এর মধ্যে'

ঘরের্ মইদ্ধ্যাত্ 'ঘরের মধ্যে' ইত্যাদি।

(৩৫) সতে 'সঙ্গে' : পদের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহিতত্বের ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

তোর্ সতে 'তোমার সঙ্গে'

ভাতের্ সতে দুধ্ 'ভাতের সঙ্গে দুধ' ইত্যাদি।

(৩৬) সুদায় 'সঙ্গে' : পদের সম্বন্ধ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহিতত্বের ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

তোর্ সুদায় মুই হাট যাইম্ 'তোমার সঙ্গে আমি হাটে যাব'

মোর্ সুদায় আয় 'আমার সঙ্গে এসো' ইত্যাদি।

(৩৭) সুদায় 'সুদ্ধ' : কর্ম-সম্প্রদান এবং কর্তৃ কারকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্তর্ভুক্তির ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

মোক্ সুদায় 'আমাকেও'

মুই সুদায় 'আমিও'

(৩৮)ভায় 'সঙ্গে' : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহিতত্বের ভাব নির্দেশ করে। উদাহরণ-

মুই ভায় চল্ 'আমার সঙ্গে চল'

তুই ভায় না যাইম্ 'তোমার সঙ্গে যাব না' ইত্যাদি।

(৩৯) ভাদে 'সঙ্গে' ঃ সহিতত্বের ভাব বোঝাতে বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামপদের সঙ্গে যুক্ত হয়। উদাহরণ-

মুই ভাদে জাবে না	'আমার সঙ্গে যাবে না'
অতিন্ ভাদে জাউক্	'অতীনের সঙ্গে যাক' ইত্যাদি।

(৪০) হাতে 'থেকে' ঃ অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যের কর্তৃ কারকের রূপে এবং প্রাণিবাচক বিশেষ্য এবং পুরুষবাচক সর্বনামপদের অধিকরণ কারকের রূপে প্রযুক্ত হয়ে অপাদান কারকের ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ-

গছ্ হাতে ফল্ পড়ে	'গাছ থেকে ফল পড়ে'
তোরঠে হাতে আসিল্	'তোমার কাছ থেকে এল' ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অনুসর্গটি সর্বনামপদের কর্তৃ কারকের রূপে প্রযুক্ত হয়ে হেতু প্রকাশ করে থাকে। উদাহরণ-

তুই হাতে অ্যাতোলা হইল	'তোমার কারণেই এতকিছু হ'ল'
মুই হাতে সউক্ হইল্	'আমি হতে সমস্ত হ'ল' ইত্যাদি।

নির্দেশক

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় নির্দেশক শব্দের প্রয়োগ মূলতঃ নির্ভর করে শব্দের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ বা বিষয়ের আকৃতি, প্রকৃতি এবং পরিমাণের উপর। নিম্নলিখিত নির্দেশকগুলি এই উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতানুসারে এগুলিকে সংখ্যাসূচক শব্দও বলা যেতে পারে।

'টা'

'টা' বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনাম (পুরুষবাচক সর্বনাম বাদে)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য যে জড় পদার্থের ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট পদার্থ যদি ত্রিমাত্রিক হয় তাহলেই সেখানে 'টা'-এর ব্যবহার সম্ভব। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় 'টা' একবচনসূচক। উদাহরণ-

মান্ষিটা	'মানুষটি'
গরুটা	'গরুটি'
পথ্টা	'রাস্তাটি'
কোন্টা	'কোনটি' ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম ঃ 'দাগ' দ্বিমাত্রিক হলেও এক্ষেত্রে 'টা'-এর প্রয়োগ প্রচলিত। কিন্তু পাহার্'পাহাড়',

চাল্'চালা', খাল্'খালা', দাও 'দা', কাটারি 'কাটারি', কোদাল্'কোদাল', কুড়াল্ 'কুড়াল' ইত্যাদি ত্রিমাত্রিক হওয়া সত্ত্বেও 'টা'-এর প্রয়োগ এদের ক্ষেত্রে প্রচলিত নয়। এগুলির নির্দেশক হ'ল 'খান্'। বিশিষ্ট প্রয়োগে অনেক সময় বাড়ি 'বাড়ি'-তেও 'খান্' ব্যবহৃত হয়।

'খান্'

নিষ্প্রাণ, দ্বিমাত্রিক, বস্তুবাচক বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনাম (পুরুষবাচক সর্বনাম বাদে)-এর ক্ষেত্রে 'খান্'-এর ব্যবহার প্রচলিত। উদাহরণ-

কাপোর্ খান্	'কাপড় খানি'
আগিনা খান	'আঙিনাটি'
বিছিনা খান্	'বিছানাটি'
কিচড়া খান্	'গজাটি'
হ্যাট্ খান্	'নীচের দিকটি'
উপোর্ খান্	'উপরের দিকটি'
গান্ খান	'গানটি'
এই খান্	'এইখানা'
ওইখান্	'ঐ খানা'
রাতি খান্	'রাত্রিটি' ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম ঃ 'বদ্দুনান্' 'বৃষ্টি কিংবা বৃষ্টির ফোঁটা' ত্রিমাত্রিক হলেও এখানে 'খান্' চলবে। অবশ্য 'খান্' ব্যবহার করলে এক্ষেত্রে বৃষ্টির স্থায়িত্বের কাল অথবা ব্যাপ্তিকে বোঝাবে। জঙোল্ 'জঙ্গল' সপ্রাণ এবং ত্রিমাত্রিক হলেও 'বদ্দুনান্ খান্'-এর মত 'জঙোল্ খান্' হবে। বিশিষ্ট [illegible] প্রয়োগে 'খানৃগি'-ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'খানৃগি খান্' হয়ে যায়। তবে 'খানৃগি খান্' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুবচনসূচক। সমানভাবে চ্যাঙ্‌রা 'ছেলে' 'চ্যাঙ্‌রাখান্' এবং চ্যাঙ্‌ড়িও 'চ্যাঙ্‌ড়িখান্'। কিন্তু এরা বহুবচনসূচক নয়। ত্রিমাত্রিক পদার্থের অন্যতম উদাহরণ (জ্যামিতি শাস্ত্রে ব্যবহৃত) ডাইটটা 'ইট' পর্যন্ত এই উপভাষায় মাঝে মাঝে 'ডাইচটা খান্' হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো অঞ্চলের (জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম-দিনাজপুর এবং মালদা) বাকরীতিতে তরল এবং অর্ধতরল পদার্থের নির্দেশকও 'খান'। যেমন-

পানি খান্	'জলটা'
দুধ্ খান্	'দুধটা'
শাক্ খান্	'তরকারীটা'
দই খান্	'দইটা' ইত্যাদি।

তবে কালবাচক শব্দ এবং পরনাপর সমস্ত অঞ্চলে সর্বদাই 'খান' দিয়ে নির্দেশিত হয়। উদাহরণ-

শাকাল্ খান্	' সকালবেলাটা'
দুপোর্ খান্	'দুপুর বেলাটা'
শাঝ্ খান্	'সন্ধ্যাবেলাটা'
থালা খান্	'থালাখানি'
হাতু খান্	'হাতের থালাটি' ইত্যাদি।

'লা','গিলা','গুলা'

'লা','গিলা' এবং 'গুলা' সমার্থক। সাধারণভাবে বহুবচনে প্রাণী, অপ্রাণী, দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক সমস্ত রকমের নামপদে, সর্বনামপদে এবং বিশেষভাবে তরল, অর্ধতরল বা কঠিন ও তরলে মিশ্রিত পদার্থ এবং গণনীয় অগণনীয় সমস্ত প্রকার বিষয়, বস্তু এবং পদার্থের ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবে 'লা', 'গিলা', এবং 'গুলা' প্রযুক্ত হয়। উদাহরণ-

প্রাণিবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে -

মানশি লা/গিলা/গুলা	'মানুষগুলি'
গরু লা/গিলা/গুলা	'গরুগুলি'
পখি লা/গিলা/গুলা	'পাখিগুলি' ইত্যাদি।

অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে-

ধানলা/গিলা/গুলা	'ধানগুলি' ধানগুলি'
টাকা লা/গিলা/গুলা	'টাকাগুলি'
কথা লা/গিলা/গুলা	'কথাগুলি' ইত্যাদি।

বিশেষণ পদের ক্ষেত্রে -

ভাল্ লা/গিলা/গুলা	'ভালগুলি'
বয়ালা/গিলা/গুলা	'খারাপগুলি'
কাচা লা/গিলা/গুলা	'কাঁচাগুলি'
বড়ো লা/গিলা/গুলা	'বড়গুলি' ইত্যাদি

পুরুষবাচক সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে-

হামরা লা/গিলা/গুলা	'আমরা'
তোমরা লা/গিলা/গুলা	'তোমরা'
উমরা লা/গিলা/গুলা	'তারা' ইত্যাদি।

বস্তুবাচক সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে -

কোন্‌গিলা　　'কোনগুলি'

জে গিলা　　'যেগুলি'

এই গিলা　　'এইগুলি'

সেই গিলা　　'সেগুলি'　ইত্যাদি।

তরল, অর্ধতরল বা কঠিন ও তরলের সংমিশ্রিত পদার্থের ক্ষেত্রে -

তাত্‌না/গিলা/গুলা　　'ভাতগুলি'

ডাইল্‌না/গিলা/গুলা　　'ডালগুলি'

জল্‌না/গিলা/গুলা　　'জলগুলি'

নুন্‌না/গিলা/গুলা　　'লবনগুলি'　ইত্যাদি।

'কনা'

কোনো পদার্থের অল্প পরিমাণ বা স্বল্পায়তনবিশিষ্ট প্রাণিবাচক এবং অপ্রাণিবাচক বিশেষ্য, বিশেষণ এবং পুরুষবাচক সর্বনাম বাদে বাকী সমস্ত সর্বনামপদে 'কনা' ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'কনা' আদর অর্থেও প্রযুক্ত হয়। এই ধরণের প্রয়োগের ক্ষেত্রে পদার্থের আকার বা পরিমাণের বিধিনিষেধ মানা হয় না। অর্থাৎ ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণী যে কোনো আকারের বা পরিমাণের হোক না কেন আদর অর্থে ও তাতে 'কনা' প্রত্যয় প্রয়োগে কোনো বাধা নেই। উদাহরণ-

প্রাণিবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে -

মান্‌হি কনা　　'মানুষটি' (ছোট আকারের)

চ্যাংরা কনা　　'ছেলেটি' (আদর অর্থে)

মাই কনা　　'মেয়েটি' (আদর অর্থে)　ইত্যাদি।

অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে -

মাটি কনা　　'মাটি টুকু বা জমি টুকু'

শিশি কনা　　'শিশিটি'

দই কনা　　'দই টুকু'　ইত্যাদি।

আদর অর্থে-　গাও কনা　　'আদরের গা'

মাই কনা　　'আদরের মেয়েটি'

বাপোই কনা　　'আদরের ছেলেটি'

গান্‌ কনা　　'প্রিয় গানটি'　ইত্যাদি।

সর্বনামপদের ক্ষেত্রে -

ঐ কনা 'ঐ টুকু'
এই কনা 'এই টুকু'
সেই কনা 'সেই টুকু' ইত্যাদি।

বিশেষণপদের ক্ষেত্রে -

ভাল্ কনা 'ভাল টুকু'
বড়া কনা 'খারাপ টুকু'
কাল্ কনা 'কাল টুকু' ইত্যাদি।

'কিনা'

'কনা'-এর মত 'কিনা'-ও কোনো জিনিসের অল্প পরিমাণ বা অল্প আয়তনবিশিষ্ট প্রাণী এবং অপ্রাণিবাচক বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম (পুরুষ বাচক সর্বনাম বাদে)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আদর অর্থেও কিনা প্রযুক্ত হয়। এক্ষেত্রেও ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর আকার, আয়তন এবং পরিমাণের বিধি নিষেধ মানা হয় না। উদাহরণ-

প্রাণিবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে -

মানুশি কিনা 'মানুষটি'
ছাওয়া কিনা 'ছেলেটি'
মাই কিনা 'মেয়েটি' ইত্যাদি।

অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে -

মাটি কিনা 'মাটি টুকু বা জমি টুকু'
পিন্ কিনা 'ছোট পাথরটি'
দড়ি কিনা 'দড়ির টুকরাটি' ইত্যাদি।

আদর অর্থে -

মাও কিনা 'আদরের মা'
মাই কিনা 'আদরের কন্যা'
পান্ কিনা 'প্রিয় পানটি' ইত্যাদি।

সর্বনামপদের ক্ষেত্রে-

এই কিনা 'এই টুকু'
যেই কিনা 'যে টুকু'
সেই কিনা 'সেই টুকু' ইত্যাদি।

বিশেষণপদের ক্ষেত্রে -

ভাল্ কিনা	'ভাল টুকু'
বয়া কিনা	'খারাপ টুকু'
ধওলা কিনা	'সাদা টুকু বা সাদা রঙের টি'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে সাধারণভাবে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ, উভয়ক্ষেত্রেই 'কিনা' ব্যবহার করা হলেও এই নির্দেশকটি বিশেষভাবে স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রেই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

'কিন্‌রা'

'কিন্‌রা' 'কিনা'-রই বিকল্প রূপ। অধিকতর নির্দিষ্ট করে বলার জন্য এই নির্দেশকটি ব্যবহৃত হয়। এর প্রয়োগরীতিও 'কিনা'-র মত। তবে 'কিনা'-র মত এটি উভয়বচনমূলক নয়, বহুবচনমূলক।

উদাহরণ-

মান্‌সি কিন্‌রা	'মানুষগুলি'
পহ্ কিন্‌রা	'পাহগুলি'
এই কিন্‌রা	'এই গুলি'
ভাল্ কিন্‌রা	'ভাল গুলি' ইত্যাদি।

'কুন্‌রা'

'কুন্‌রা' 'কিন্‌রা'-র মতই বহুবচনমূলক। এর প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং বিধিও 'কিন্‌রা'-রই মত।

উদাহরণ-

মান্‌সি কুন্‌রা	'মানুষগুলি'
ছাওয়া কুন্‌রা	'শিশুগুলি'
এই কুন্‌রা	'এই গুলি'
সেই কুন্‌রা	'সেই গুলি' ইত্যাদি।

'কিন্‌রা' এবং 'কুন্‌রা' যেহেতু বহুবচনমূলক তাই যেসব পদার্থের বহুবচন পৃথকভাবে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না সেই সব পদার্থের ক্ষেত্রে এই দুটি নির্দেশকের ব্যবহার উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত নয়।

'চাইটটা'

'চাইটটা' পরিমাণনির্দেশক। আনুমানিক সংখ্যাও 'চাইটটা' দিয়ে নির্দেশিত হয়। তবে এই নির্দেশকটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে এটি শব্দের আগেও প্রযুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এটি আর নির্দেশক থাকে না, সংখ্যা বা পরিমাণবাচক শব্দে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ-

মান্‌সি চাইটটা	'মানুষগুলি'

তাত্ চাইটট্টা	'তাতগুলি'
এই চাইটট্টা	'এই গুলি'
ঐ চাইটট্টা	'ঐ গুলি' ইত্যাদি।

'টুকা'

শিষ্ট বাংলায় প্রচলিত নির্দেশক 'টুকু' বা 'টুক' এর পরিবর্তিত রূপ 'টুকা'-র প্রয়োগক্ষেত্র এবং বিধি শিষ্ট বাংলারই অনুরূপ। উদাহরণ-

জল্ টুকা	'জল টুকু'
কথা টুকা	'কথা টুকু'
এই টুকা	'এই টুকু' ইত্যাদি।

'জোন্' (জন)

একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে সংখ্যা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'জোন্' মানুষের সংখ্যা নির্দেশ করে। উদাহরণ-

অ্যাক্ জোন্ মান্ষি	'একজন মানুষ'
জতো জোন্ মান্ষি	'যত জন মানুষ'
চাইর্ জোন্ মান্ষি	'চার জন মানুষ' ইত্যাদি।

'খিলি'

'খিলি' একমাত্র পানের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এটি সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পানের সংখ্যা নির্দেশ করে। উদাহরণ-

অ্যাক্ খিলি পান্	'একখিলি পান'
কয় খিলি পান্	'কত খিলি পান'
জয় খিলি পান্	'যত খিলি পান' ইত্যাদি।

'ফাকি'

'ফাকি' কোনো ফলের কাটা অংশকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

আমের্ ফাকি	'আমের খণ্ড'
শাশাদের্ ফাকি	'শশার খণ্ড' ইত্যাদি।

'টুখা'

মাছ, মাংস, তরকারী ইত্যাদির খণ্ডকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

অ্যাক্ টুখা মাছ্	'এক টুকরা মাছ'

অ্যাক্ টুখা মগোস্ 'এক টুকরা মাংস'

দুই টুখা আলু 'দুই টুকরা আলু' ইত্যাদি।

'ফালা'

লম্বা এবং চ্যাপ্টা কোনো কিছুকে মাঝামাঝি ভাবে চিরলে তার প্রত্যেকটি অংশকে 'ফালা' বলা হয়। গোল কোনো বস্তুকে মাঝামাঝি কাটলেও তার প্রত্যেকটি অংশকে 'ফালা' বলা হয়। উদাহরণ-

বাঁশের্ ফালা 'চেরা বাঁশ'

খুঁটার্ ফালা 'মাঝামাঝি ভাবে চেরা কাঠের অংশ'

আলুর্ ফালা 'মাঝামাঝি ভাবে কাটা আলু' ইত্যাদি।

'ফাড়ি'

'ফাড়ি' লম্বালম্বি ভাবে কাটা তরকারী বা ফলের অংশ নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

দুই ফাড়ি আলু 'দুই চিলতে আলু'

অ্যাক্ ফাড়ি প্যাপাস্ 'এক ফালি পেপা' ইত্যাদি।

'ফাইকট্টা'

কাপড় বা চট জাতীয় কোনো কিছুর টুকরা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

অ্যাক্ ফাইকট্টা কাপোর্ 'এক ফালি কাপড়'

দুই ফাইকট্টা চটি 'দুই টুকরা চট' ইত্যাদি।

'ফাইলট্টা'

এর প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং রীতি 'ফাইকট্টা'-র মত। উদাহরণ-

অ্যাক্ ফাইলট্টা ন্যাকেরা 'এক ফালি ন্যাকড়া'

দুই ফাইলট্টা কাপোর্ 'দুই টুকরা কাপড়' ইত্যাদি।

'চির্'

কোনো জিনিসকে লম্বালম্বি ভাবে কাটলে বা ছিঁড়লে তার প্রত্যেকটি অংশকে 'চির্' বলে।

উদাহরণ-

বাঁশের্ চির্ 'চার ভাগে কাটানো বাঁশের টুকরা'

কাপোরের্ চির্ 'লম্বা লম্বিভাবে চেরা কাপড়'

আলুর্ চির্ 'চার ভাগে কাটা আলুর অংশবিশেষ' ইত্যাদি।

'চাকা'

কোনো জিনিসকে লম্বা দিক থেকে ছোট ছোট টুকরা করে কাটলে তার প্রত্যেকটি অংশকে 'চাকা' বলা হয়। উদাহরণ-

শ্যাখাদের্ চাকা	'শশার টুকরা'
মুলার্ চাকা	'মূলার টুকরা' ইত্যাদি।

'আওয়া'

ফলের কোষ বোঝাতে 'আওয়া' ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

কাটোলের্ আওয়া	'কাঁঠালের কোয়া'
ডালিমের্ আওয়া'	'ডালিমের কোয়া' ইত্যাদি।

'ভুম্'

জিমাজিক লম্বা কোনো কিছুকে লম্বার দিক থেকে কাটলে তার প্রত্যেকটি অংশকে 'ভুম' বলা হয়। উদাহরণ-

বাঁশের্ ভুম্	'বাঁশের টুকরা'
খুটির্ ভুম্	'কাঠের টুকরা' ইত্যাদি।

'খট্টু'

আল দ্বারা যে জমির সীমা নির্দিষ্ট সেই ধরনের জমিকে 'খট্টু' বলা হয়ে থাকে। উদাহরণ-

অ্যাক্ খট্টু ভুঁইক্	'এক টুকরা জমি'
ভুঁইয়ের্ খট্টুটা	'জমির টুকরাটি' ইত্যাদি।

এই সমস্ত ছাড়াও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কিছু শব্দের সাথে সাহায্যে সমষ্টি বোঝানো হয়ে থাকে। সমষ্টিবাচক এই শব্দগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবেও কাজ করে। নিম্নে এই জাতীয় কিছু শব্দ দেওয়া হ'ল।

আটি-	ধানের্ আটি	'ধানের বোঝা'
	শাকের্ আটি	'শাকের বোঝা' ইত্যাদি।
বোঝা-	পাটার্ বোঝা	'পাটের বোঝা'
	খড়ির্ বোঝা	'জ্বালানী কাঠের বোঝা' ইত্যাদি।
গোছা-	চুলের্ গোছা	'কয়েক গাছা চুল'
	ধানের্ গোছা	'কয়েক গাছি ধান'
	পাটার্ গোছা	'কয়েক গাছি পাট' ইত্যাদি।

বন্দি- অ্যাক্‌ বন্দি পাটা 'পাটের একটি ছোট বোঝা'

পাটার্‌ বন্দি 'পাটের ছোট বোঝা' ইত্যাদি।

জোরা- দুটি জিনিসকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ-

জুতা জোরা 'জুতা জোড়াটি'

মান্‌ষি জোরা 'মানুষ দুটি' ইত্যাদি

তাও- একমাত্র কাগজের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

কাগোজের তাও 'কাগজের খণ্ডটি'

থান্‌- একমাত্র কাপড়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- কাপোড়ের্‌ থান

কাপোড়ের্‌ থান্‌ 'কাপড়ের থান'

ঝোপ্‌- ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের সমষ্টিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

বাঁশের্‌ ঝোপ্‌ 'ঘনসন্নিবিষ্ট কিছু বাঁশগাছ'

কলার্‌ ঝোপ্‌ 'ঘনসন্নিবিষ্ট কিছু কলাগাছ' ইত্যাদি।

ঝাক্‌- সমষ্টি বোঝাতে গণনীয় প্রাণী ও অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

ঝাক্‌ টাকা 'কিছু টাকা'

মান্‌ষির্‌ ঝাক্‌ মানুষের সমষ্টি' ইত্যাদি।

পির্‌- কলার ছড়ি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

অ্যাক্‌ পির্‌ কলা 'এক কাঁদি কলা'

কলার্‌ পির্‌ 'কলার কাঁদি' ইত্যাদি।

ঝুকি- কলার কাঁদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

কলার্‌ ঝুকি 'কলার ছড়ি'

অ্যাক্‌ ঝুকিকলা এক ছড়ি কলা' ইত্যাদি।

থাদা - নারকেল, সুপারি এবং খেজুরের গুচ্ছ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

নাইরকোল্‌ থাদা 'নারিকেলের গুচ্ছ'

গুয়ার্‌ থাদা 'সুপারির গুচ্ছ' ইত্যাদি।

হাপাল্‌- কাঁচা এবং শুকনো পাটের ছোট ছোট বোঝাকে হাপাল বলা হয়। উদাহরণ-

অ্যাক্‌ হাপাল্‌ পাটা 'পাটের একটি ছোট বোঝা'

পাটার্‌ হাপাল্‌ 'পাটের ছোট বোঝা' ইত্যাদি।

অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক শব্দ

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক শব্দের সংখ্যা সীমিত। এই উপভাষায় প্রচলিত প্রধান প্রধান অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক শব্দ এবং তাদের প্রয়োগ নিম্নে বর্ণিত হ'ল।

'কোনেক্'

'কোনেক্' শব্দের আগে বসে অনির্দিষ্টতার ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ–

কোনেক্ জল্	'কিছুটা জল'
কোনেক্ কথা	'একটু কথা'
কোনেক্ দয়া	'একটু দয়া' ইত্যাদি।

'কিছু'

'কিছু' শব্দের আগে বসে সেই শব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা বা পরিমাণ সম্পর্কে অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে। উদাহরণ–

কিছু মান্ষি	'কিছু সংখ্যক মানুষ'
কিছু পাইসা	'কিছু পয়সা'
কিছু জল্	'কিছু পরিমাণ জল' ইত্যাদি।

'গোটেক্'

'কোনেক্'–এর মত 'গোটেক্'–ও শব্দের আগে বসে সংখ্যা বা পরিমাণ সম্পর্কে অনির্দিষ্টতার ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ–

গোটেক্ মান্ষি	'কিছু সংখ্যক মানুষ'
গোটেক্ ধান্	'কিছু ধান'
গোটেক্ টাকা	'কিছু টাকা' ইত্যাদি।

'চাইট্টা'

'চাইট্টা' আসলে একটি নির্দেশক। কিন্তু এটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দের আগে বসে অনির্দিষ্টতার ভাবও প্রকাশ করে থাকে। উদাহরণ–

চাইট্টা ভাত্	'কিছু ভাত'
চাইট্টা পাইসা	'কিছু পয়সা'
চাইট্টা মান্ষি	'কিছু সংখ্যক মানুষ'
চাইট্টা চাউল্	'কিছু পরিমাণ চাল' ইত্যাদি।

'গোটা'

সংখ্যাসূচক শব্দের আগে বসে 'গোটা' সংখ্যা সম্পর্কিত অনির্দিষ্টতার ভাব জ্ঞাপন করে। উদাহরণ-

গোটা চাইর্ 'আনুমানিক চারটি'

গোটা দুই 'আনুমানিক দুইটি'

গোটা তিন্ 'আনুমানিক তিনটি' ইত্যাদি।

এছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'টা', 'খান্' ইত্যাদি নির্দেশকের পূর্বে সংখ্যা শব্দ বসিয়ে তাকে শব্দের আগে স্থাপন করলে তার দ্বারা অনির্দিষ্টতার ভাব প্রকাশিত হয়। উদাহরণ-

দুইটা মান্শি 'দুটি মানুষ'

তিন্ খান্ কাপোর্ 'তিন খানা কাপড়' ইত্যাদি।

সংখ্যাসূচক বা পরিমাণসূচক শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট শব্দের সঙ্গে 'জোকোন্', 'যোতোন্', 'চক্', 'নাখান্' ইত্যাদি শব্দ যোগ করেও অনেক সময় অনির্দিষ্টতার ভাব প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ-

দুই জোনের্ চক্ মান্শি 'দুজনের মত মানুষ'

অ্যাক্ প্যার্ জোকোন্ দুধ্ 'এক সের মত দুধ'

দুই হালা যোতোন্ তিমা 'দুই গন্ডার মত ডিম'

অ্যাক্ শর্ নাখান্ টাকা 'একশোর মত টাকা' ইত্যাদি।

শব্দের আগে দুটি পৃথক সংখ্যা বসিয়েও অনেক ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টতা বোঝানো হয়। উদাহরণ-

দুই তিন্ জোন্ মান্শি 'দু তিন জন মানুষ'

দশ্ বিশ্ টাকা 'দশ বিশ বা কিছু টাকা' ইত্যাদি।

সময়ের অনির্দিষ্টতা বোঝাতে 'নাগাত্' শব্দটি শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

দুপোর্ নাগাত্ 'দুপুরের কাছাকাছি সময়ে অথবা দুপুরে'

ব্যালা ভাটি নাগাত্ 'বিকেলে অথবা বিকেলের কাছা কাছি সময়ে'

শাকাল্ নাগাত্ 'সকালে বা সকালের কাছাকাছি সময়ে' ইত্যাদি।

স্থানের অনির্দিষ্টতা বোঝাতে 'এত্তি' এবং 'অত্তি', এই দুটি স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ-

বাড়ির্ অত্তি 'বাড়িতে বা বাড়ির কাছাকাছি স্থানে'

হামার্ এত্তি 'আমাদের বা আমাদের নিকটবর্তীদের কাছে'

ঘরের্ এত্তি 'ঘরে অথবা ঘরের কাছে' ইত্যাদি।

শব্দদ্বৈত

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ইত্যাদি সমস্ত পদেরই দ্বিত্ব ঘটে। এই উপভাষায় মূলতঃ তিন প্রকারের শব্দদ্বৈতের প্রচলন রয়েছে।

(১) একই শব্দের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে কৃত শব্দদ্বৈত, যেমন- ভালে-ভালে 'ভালোয়-ভালোয়', হাড়ি-হাড়ি 'হাড়ি-হাড়ি', ঘরা-ঘরা 'কলসী-কলসী', বাড়ি-বাড়ি 'বাড়ি-বাড়ি', ঘর্-ঘর্ 'ঘর-ঘর', ভাল্-ভাল্ 'ভালো ভালো' ইত্যাদি।

(২) একটি শব্দের সঙ্গে আকৃতি এবং অর্থের দিক থেকে নিকট সম্পর্কযুক্ত আর একটি শব্দের সংযোগে সৃষ্ট শব্দদ্বৈত, যেমন- আন্দা-বারা 'রাঁধা-বাড়া', হাট্-বাজার্ 'হাট-বাজার', খান্-দান্ 'খাওয়া-দাওয়া', বাড়ি-ঘর্ 'বাড়ি-ঘর', কলা-কদুলি 'কলা-কদলী' ইত্যাদি।

(৩) অনুকার শব্দ বা বিকারজাত শব্দযোগে গঠিত শব্দদ্বৈত, যেমন- ভাত্-টাত্ 'ভাত-টাত', নদি-নালোর্ 'নদী-নালা', জোগোত্-জাগাত্ 'তাড়া তাড়ি' ইত্যাদি।

এই তিনপ্রকারের শব্দদ্বৈত বা দ্বিরুক্ত শব্দ নিম্নানুরূপ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়।

(১) পুনরাবৃত্তি, সম্পূর্ণতা, প্রকর্ষ এবং সংযোগের ভাব প্রকাশের জন্য, যেমন - বাড়ি-বাড়ি 'বাড়ি-বাড়ি', টাড়ি-টাড়ি 'পাড়ায়-পাড়ায়', পর্-পর্ 'পর-পর', বছোর্-বছোর্ 'প্রতি বৎসর', মুঠি-মুঠি 'মুঠো-মুঠো', মুনি-মুনি 'মুনে-মুনে', চোখে-চোখে 'চোখে-চোখে', মানষি-মানষি 'মানুষে-মানুষে', দিনে-দিনে 'দিনে-দিনে', আইতে-আইতে 'রাতে-রাতে' ইত্যাদি।

(২) সম্পূর্ণতার ভাব প্রকাশের জন্য, যেমন- ভাবিয়া-চিন্তিয়া 'ভেবে-চিন্তে', পুছি-গছি 'জিজ্ঞাসা এবং চিন্তা করে', আন্দি-বাড়ি 'রেঁধে-বেড়ে', খায়া-দায়া 'খেয়ে-দেয়ে', ঘর্-গেরাস্থি 'ঘর-গৃহস্থালী', নোক্-নষ্কোর 'লোক-লস্কর', হিসাব্-কিতাব্ 'হিসাব-কিতাব', লইজ্জা-সরোম্ 'লজ্জা-সরম', বন্ধু-বান্ধোব্ 'বন্ধু-বান্ধব', কাগোজ্-পাতি 'কাগজ-পত্র' ইত্যাদি।

(৩) সাদৃশ্যের ভাব প্রকাশের জন্য, যেমন- জর্-জর্ ভাব্ 'জ্বর-জ্বর ভাব', ঠান্ডা-ঠান্ডা বাতাস্ 'ঠান্ডা-ঠান্ডা বাতাস', হাসি-খুসি মুখ্ 'হাসি খুসী মুখ', চোর্-চোর্ খ্যালা 'চোর-চোর খেলা' ইত্যাদি।

(৪) ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা বোঝানোর জন্য, যেমন - হাসিতে-হাসিতে 'হাসতে হাসতে', করিতে-করিতে 'করতে-করতে', দেখিতে-দেখিতে 'দেখতে-দেখতে', নাচি-নাচি 'নেচে-নেচে', কান্দিতে-কান্দিতে 'কাঁদতে-কাঁদতে', কইতে-কইতে 'বলতে-বলতে' ইত্যাদি।

(৫) ব্যতিহার বা পারস্পরিকতার ভাব প্রকাশের জন্য, যেমন - মারা-মারি 'মারা-মারি',

ভুকা-ভুকি 'ঝিলা-ঝিলি', হাতা-হাতি 'হাতা-হাতি', কোলা-কুলি 'কোলা-কুলি', হাটা-হাটি 'হাটা-হাটি', ধরা-ধরি 'ধরা-ধরি', দ্যাখা-দেখি 'দেখা-দেখি', খোজা-খুজি 'খোজা-খুজি', মারা-মারি 'মারা-মারি' ইত্যাদি।

(৬) ইত্যাদির ভাব প্রকাশ করার জন্য, এই উদ্দেশ্যে মূলতঃ সহচর, অনুচর, প্রতিচর এবং বিকারজাত - এই চার প্রকার শব্দের সংযোগে শব্দদ্বৈত সৃষ্টি করা হয়।

(ক) সহচর শব্দযোগে সৃষ্ট শব্দদ্বৈত, যেমন- কাজ্-কামাই 'কাজ-কর্ম', বাড়ি-ঘর্ 'বাড়ি-ঘর', ঢাক্-ঢোল্ 'ঢাক-ঢোল', চড়্-চাপোড়্ 'চড়-চাপড়', জিব্-জন্তু 'জীব-জন্তু', নদি-নালা 'নদী-নালা' ইত্যাদি।

(খ) অনুচর শব্দযোগে সৃষ্ট শব্দদ্বৈত, যেমন- কাপোড়্-চোপোড়্ 'কাপড়-চোপড়', মাল্-মশোলা 'মাল-মশলা', দোকান্-পাটি 'দোকান-পাট', ঘর্-পাট্ 'ঘর-পাট', দয়া-ময়া 'দয়া-মায়া' ইত্যাদি।

(গ) প্রতিচর শব্দযোগে সৃষ্ট শব্দদ্বৈত, যেমন- দিন্-রাতি 'দিন-রাত্রি', মাইয়া-মরোদ্ 'স্ত্রী-পুরুষ', চ্যাঙ্‌রা-চেংড়ি 'ছেলে-মেয়ে', হেন্দু-মোছোলমান্ 'হিন্দু-মুসলমান', ব্যাচা-কিনা 'বেচা-কেনা' ইত্যাদি।

(ঘ) বিকারজাত শব্দযোগে সৃষ্ট শব্দদ্বৈত, ঠাকুর্-ঠুকুর 'ঠাকুর-টাকুর', তাড়া-তাড়ি 'তাড়া-তাড়ি', মিট্-মাট্ 'মীমাংসা', অদোল্-বদোল্ 'অদল-বদল', ইত্যাদি। অনুকার [illegible] বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেসব শব্দদ্বৈত গঠিত হয় সেগুলিকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। যেমন- বাসোন্-কোসোন্ 'বাসন-পত্র', চাকিরাকার্-বাকিরাকার্ 'চাকর-বাকর', কাজ্-টাজ্ 'কাজ-টাজ' ইত্যাদি।

(৭) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবের বিশেষত্ব নির্দেশের জন্য, এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ ঘটে থাকে তার অধিকাংশই মূল শব্দের সঙ্গে অনুকার শব্দযোগে সৃষ্ট। এই জাতীয় শব্দদ্বৈতকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবের প্রকাশক, যেমন- কন্-কন্, টন্-টন্, ত্যাপ্-ত্যাপ্, চিন্-চিন্, চন্-চন্, বন্-বন্ ইত্যাদি।

(খ) বস্তুর আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক গুণ নির্দেশক, যেমন- ধু-ধু 'ধু-ধু', খাঙ্-খাঙ্ 'খাঁ-খাঁ', ফাঙ্-ফাঙ্ 'ফাঁকা-ফাঁকা', ফাও্-ফাও্ 'ফাঁকা-ফাঁকা', ধপ্-ধপা 'ধব-ধবে', ঝিক্-ঝিক্ 'ঝিকি-ঝিকি', ফক্-ফকা 'ধব-ধবে' ইত্যাদি।

(গ) বিরক্তি বা প্রত্যুত্তরের ভাব প্রকাশক, যথা - ঘান্-ঘান্ 'ঘান-ঘান', ঠন্-ঠন্ 'ঠন-ঠন', চন্-চন্ 'চন-চন', টপা-টপ্ 'টপা-টপ', রপা-রপ্ 'রপা-রপ', পপা-পপ্ 'পপা-পপ' ইত্যাদি।

(ঘ) ক্রিয়ার মাত্রা নির্দেশক, যথা - ধম্-ধমে 'দ্রুত', চন্-চনে 'দ্রুত', প্যান্-প্যানে 'স্থবভাবে', তর্-তরে 'বিরতিহীন ভাবে', মর্-মরে 'মর্ম সহকারে' ইত্যাদি।

অনুকার শব্দসমূহের গঠনগত শ্রেণীবিন্যাস

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত অনুকার শব্দগুলিকে গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) মূল শব্দের স্বরধ্বনিকে দ্বিতীয় শব্দে পরিবর্তিত করে গঠিত অনুকার শব্দ, যেমন- কাটা-কুটি, টুপ্-টাপ্, ধুপ্-ধাপ্, দুপ্-দাপ্, ধুপ্-ধাপ্ ইত্যাদি। এই শ্রেণীর অনুকার শব্দ মূলতঃ দুটি পদ্ধতিতে গঠিত হয়ে থাকে।

(ক) প্রথম শব্দের আদ্যস্বর পরিবর্তন করে, যেমন- কাটা-কুটি, ধুপ্-ধাপ্, দুপ্-দাপ্, ধুপ্-ধাপ্, চাপ্-চুপ্, চুপ্-চাপ্ ইত্যাদি।

(খ) দ্বিতীয় শব্দে প্রথম শব্দের অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত করে, যেমন - খাঁটা-খাটি, চুলা-চুলি, ধুলা-ধুলি, বালা-বেলি, নাগা-নাগি, ভাগা-ভাগি, বুঝা-বুঝি ইত্যাদি।

(২) মূল শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট অনুকার শব্দ, যেমন-ভাত্-টাত্, জল্-টল্, কাজ্-টাজ্ ইত্যাদি। এই শ্রেণীর অনুকার শব্দ গঠনেরও দুটি পদ্ধতি উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত।

(ক) দ্বিতীয় পদে একই শব্দের আদ্যব্যঞ্জন ধ্বনি পরিবর্তন করে। যেমন-চাকোর্-বাকোর্, ভাত্-টাত্, মাছ্-টাছ্, হাবুরা-জাবুরা 'আবর্জনা' ইত্যাদি।

(খ) দ্বিতীয় পদে মূল শব্দের আদ্যস্বর এবং আদ্যব্যঞ্জন ধ্বনি পরিবর্তন করে। যেমন- কাপোর্-চোপোর্, ছুতা-নাতা, তাড়া-হুড়া 'তাড়া-হুড়া', ধান্দা-গুন্দা 'ভাবনা-চিন্তা' বাসোন্-কোসোন্ 'বাসন-পত্র' ইত্যাদি।

সমাস

সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত সমাসগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) সংযোগমূলক বা দ্বন্দ্ব সমাস

(২) ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস

(৩) বর্ণনামূলক সমাস

(১) সংযোগমূলক বা দ্বন্দ্ব সমাস

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সংযোগমূলক বা দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণীবিভাজন নিম্নরূপ।

(ক) দ্বন্দ্ব সমাস : এই উপভাষায় দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে যে পদটি উচ্চারণের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব সেটি প্রথমে বসে সমস্তপদ গঠন করে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রযুক্ত পদ দুটির অবস্থানের এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটে থাকে। দেখা গিয়েছে যে দুটি পদের মধ্যে যেটির অর্থ অপেক্ষাকৃত প্রধান বা গৌরববোধক সেই পদটি উচ্চারণের দিক থেকে দীর্ঘ হলেও আগে বসে। উদাহরণ-

বাপ্-মাও 'বাবা-মা' (বাবা ও মা)

বেটি-জামাই 'কন্যা-জামাতা' (কন্যা ও জামাতা)

হাত্-পাও, 'হাত-পা' (হাত ও পা) ইত্যাদি।

(খ) অলুক দ্বন্দ্ব সমাস : এই জাতীয় সমাসের প্রচলন উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সীমাবদ্ধ। দেখা গিয়েছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উপভাষায় পূর্বপদে বিভক্তি যুক্ত না হয়ে একমাত্র উত্তরপদেই যুক্ত হয়। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ দুটি পদই যেখানে সর্বনাম সেখানে পূর্ব এবং উত্তর-উভয় পদেই বিভক্তি যুক্ত হয়। উদাহরণ-

তোক্-মোক্, 'তোমাকে-আমাকে' (তোমাকে এবং আমাকে)

তোত্-মোত্, 'তোমাতে-আমাতে' (তোমাতে এবং আমাতে)

পথে-ঘাটে 'পথে-ঘাটে' (পথে এবং ঘাটে) ইত্যাদি।

(গ) ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস : প্রধানতঃ সহচর, অনুচর, প্রতিচর, বিকারজাত এবং অনুকার শব্দের সঙ্গে এই শ্রেণীর সমাস হয়ে থাকে। উদাহরণ-

(গ ১) সহচর শব্দের সঙ্গে – জন্‌-মানষি 'জন-মানুষ' (জন এবং মানুষ)

ভয়-ডর্‌ 'ভয়-ডর' (ভয় এবং ডর)

ঢাক্‌-ঢোল্‌ 'ঢাক-ঢোল' (ঢাক এবং ঢোল) ইত্যাদি।

(গ ২) অনুচর শব্দের সঙ্গে – দয়া-ময়া 'দয়া-মায়া' (দয়া এবং মায়া)

নদি-নালা 'নদী-নালা' (নদী এবং নালা)

জামা-জুতা 'জামা-জুতা' (জামা এবং জুতা) ইত্যাদি।

(গ ৩) প্রতিচর শব্দের সঙ্গে – রাইত্‌-দিন্‌ 'রাত-দিন' (রাত্রি এবং দিন)

ভাল্‌-মন্দো 'ভাল-মন্দ' (ভালো এবং মন্দ)

লাভ্‌-ক্ষতি 'লাভ-ক্ষতি' (লাভ এবং ক্ষতি) ইত্যাদি।

(গ ৪) বিকারজাত শব্দের সঙ্গে –

ঠাকুর্‌-ঠুকুর্‌ 'ঠাকুর-ঠুকুর' (ঠাকুর ইত্যাদি)

ভাজা-ভুজা 'ভাজা-ভুজা' (ভাজা ইত্যাদি) ইত্যাদি।

(গ ৫) অনুকার শব্দের সঙ্গে – ভাগি-দাগি 'ভাগি-দাগি' (অংশীদার ইত্যাদি)

ভাত্‌-টাত্‌ 'ভাত্‌-টাত' (ভাত ইত্যাদি)

চাকোর্‌-বাকোর্‌ 'চাকর-বাকর' (চাকর ইত্যাদি) ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে দুটি ধ্বন্যাত্মক দুটি শব্দের মধ্যেও সমাস এই উপভাষায় দেখা যায়। উদাহরণ–

হাকুর্‌-পাকুর 'ব্যস্ততা বা আগ্রহ'

ফুড়্‌-কাড়্‌ 'চালাকি বা দুষ্টবুদ্ধি' ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে এই ধরনের সমাসে প্রযুক্ত পদ দুটির মধ্যে একক ভাবে কোনোটিই অর্থযুক্ত নয়। কিন্তু সমাসবদ্ধ হলেই দুটি পদে মিলে একটি নির্দিষ্ট অর্থের দ্যোতনা দেয়।

(২) ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তিন প্রকারের ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস প্রচলিত। (ক) তৎপুরুষ, (খ) কর্মধারয় এবং (গ) দ্বিগু।

(ক) তৎপুরুষ সমাস

এই উপভাষায় প্রচলিত তৎপুরুষ সমাসকে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিম্নানুরূপ শ্রেণীগুলিতে বিন্যস্ত করা যায়।

(ক ১) কর্মবাচক দ্বিতীয়া তৎপুরুষ – ছাওয়া ভুলকা 'ছেলেকে ভুলানো'

মজোর্‌ খাটা 'মজুরকে খাটানো'

পখি খ্যাদা 'পাখিকে তাড়ানো' ইত্যাদি।

(ক ২) করণবাচক তৃতীয়া তৎপুরুষ - মদ্গরা 'মদের দ্বারা গরা'

ঢামকুটা 'উদুখল দ্বারা কোটা'

বগদুলচোষা 'বাদুর দ্বারা শোষিত' ইত্যাদি।

(ক ৩) উদ্দেশ্যবাচক চতুর্থী তৎপুরুষ - বিয়াও পাগলা 'বিয়ের জন্য পাগল'

ভাকখাগুল্ 'ভাতের জন্য খাগুল' ইত্যাদি।

(ক ৪)অপাদানবাচক পঞ্চমী তৎপুরুষ - গছ্পারা 'গাছ থেকে পারা'

বাড়িছাড়া 'বাড়ি থেকে ছাড়া'

দলছুট্ 'দল থেকে ছুট' ইত্যাদি।

(ক ৫) সম্বন্ধবাচক ষষ্ঠী তৎপুরুষ - ধান্বারি 'ধানের খেত'

গছ্তলা 'গাছের তলা'

আমগছ্ 'আমের গাছ' ইত্যাদি।

(ক ৬) স্থান,কালবাচক সপ্তমী তৎপুরুষ -

বানভাসা 'বানে ভাসা'

গছ্পাকা 'গাছে পাকা'

বাটিভরা 'বাটায় ভরা' ইত্যাদি।

(খ) কর্মধারয় সমাস

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত কর্মধারয় সমাসকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে।

(খ ১) সাধারণ কর্মধারয় : এই শ্রেণির কর্মধারয় সমাসে সমাসবদ্ধ পদের প্রকৃতি নিম্নানুগ।

(খ ১।ক) বিশেষণ পূর্বপদ , যেমন-

লাল্পাগড়ি 'লাল যে পাগড়ি'

ধওলা কইতোর্ 'সাদা পায়রা'

বড়ো বাবু 'বাবুদের মধ্যে বড় যিনি' ইত্যাদি।

(খ ১।খ) বিশেষণোভয়পদ - , যেমন-

টিপ্টিপা লাল্ 'টুক টুকে যে লাল'

কিচ্কিচা কালা 'কুচ কুচে যে কালো'

চালাক চতুর্ 'যে চালাক সেই চতুর'

ত্যাল্ কালা 'তৈলাক্ত যে কালো'

খসা খাস্তা 'যা খসা তাই খাস্তা' ইত্যাদি।

(খ ১।গ) পূর্ব নিপাতযুক্ত , যেমন -

তালপরা — 'পড়া তেল বা মন্ত্রপুত তেল'
জলফুপা — 'মন্ত্রপুত জল'
হলদিবাটা — 'বাঁটা হলুদ' ইত্যাদি।

(খ ২) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় , যেমন-

দুধভাত্ — 'দুধ মাখা ভাত'
ঘিউভাত্ — 'ঘী মাখা ভাত'
দইচুরা — 'দই মাখা চিড়ে' ইত্যাদি।

(খ ৩) উপমান কর্মধারয় , যেমন-

দুধ শাদা — 'দুধের মত শাদা'
ধাপুর্ শাম্ — 'ধাপুর মাছের মত শ্যামবর্ণ'
মিশ্ কালা — 'মিশির মত কালো' ইত্যাদি।

(খ ৪) উপমিত কর্মধারয় , যেমন-

হাসগলা — 'গলা হাঁসের মত'
মুখচান্ — 'মুখ চাঁদের মত' ইত্যাদি।

(খ ৫) রূপক কর্মধারয় , যেমন-

মনপঙ্খি — 'মন রূপ পাখি'
দেহা পিনজিরা — 'দেহ রূপ পিঞ্জর'
ভবোনদি — 'ভব রূপ নদী' ইত্যাদি।

(গ) দ্বিগু

দ্বিগু সমাসের ব্যবহার উত্তরবঙ্গের ভাষায় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

তিরভুবোন্ — 'তিন ভুবনের সমাহার'
দশোচকরোরো — 'দশ অদের চক্র'
ষপড়া — 'সপ্ত অহের সমাহার'
চৌপদি — 'চারটি পদের সমাহার'
পাচট্যাকি — 'পাঁচ টাকার সমাহার'
দোতোরা — 'দুই তার দ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্র'
অশট্টা ধাতু — 'আট ধাতুর সমাহার' ইত্যাদি।

(ঙ) বর্ণনামূলক সমাস : বহুব্রীহি

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত বহুব্রীহি সমাসকে গঠন প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে নিম্নোক্ত শ্রেণীগুলিতে বিন্যস্ত করা যায়।

(ক) ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি, যেমন -

মাইয়ামুখা	'স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত যে'
ন্যাকেরা পিন্দা	'ন্যাকড়া পরে যে'
বিলাইমুখা	'বিড়ালের মত মুখ বা স্বভাব যার'
বান্‌জিমুখা	'বান্‌জি বা কচি পাতার মত নমনীয় স্বভাব যার' ইত্যাদি।

(খ) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, যেমন-

ফ্যান্‌চোখা	'বিস্ফারিত চোখ যার'
ডাঙ্গা বাবা	'বাবা বড় যার'
পিতিরা হাত্‌	'যার হাত লম্বা বা যে মারা' ইত্যাদি।

(গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি, যেমন-

চাখাচাখি	'পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময়'
চুলাচুলি	'পরস্পরের চুল ধরে টানাটানি'
টানাটানি	'পরস্পরকে ধরে টানা'
কোলাকুলি	'পরস্পরকে আলিঙ্গন করা'
দলাদলি	'দলে দলে বিভক্ত হওয়া' ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অব্যয়ীভাব সমাসের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। এই শ্রেণীর সমাসের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল।

জনা-মাইন্‌ষ্যা	'মানুষকে অতিক্রম না করে'
জনা-শক্‌তি	'শক্তিকে অতিক্রম না করে'
জনম্যাবধি	'জন্ম অবধি'
দিনভর্‌	'সারাদিনব্যাপী' ইত্যাদি।

রূপতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার উপসংহারে উত্তরবঙ্গের উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বর্গীকরণের প্রশ্নটি অতঃপর অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। এক্ষেত্রে ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গঠনগত বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করে তিনি পৃথিবীর সমস্ত ভাষাকে দুটি প্রধান বর্গে বিভক্ত করেছেন। এই বর্গদুটি হ'ল -

(১) অসমবায়ী (Isolating)

(২) সমবায়ী (Non-isolating)

আবার সমবায়ী বর্গের অন্তর্গত ভাষাগুলিকে তিনি -

(ক) সর্বসমবায়ী (polysynthetic, holophrastic বা incorporating)

(খ) যৌগিক (agglutinating) এবং

(গ) সমন্বয়ী (inflexional, amalgamating বা synthetic) - এই

তিনটি উপগুচ্ছে বিভক্ত করেছেন।[৬]

এর মধ্যে প্রথম বর্গের অন্তর্গত ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এই ভাষাগুলিতে শব্দরূপ এবং ধাতুরূপ বলে কিছু নেই। শব্দ এবং পদের মধ্যে পার্থক্যও এই ভাষাগুলিতে স্পষ্ট নয়। বাক্যের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হলে বাক্যের অর্থ বা উপসর্গ ও অনুসর্গস্থানীয় বিশেষ বিশেষ শব্দ সহযোগে এই সব ভাষায় পদের কারক, বিভক্তি, বচন এবং ক্রিয়ার কাল, ভাব, বাচ্য ইত্যাদি উপলব্ধ হয়।[৭] অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে সুনির্দিষ্ট অবস্থান থেকেই এই বর্গের অন্তর্গত ভাষাগুলিতে পদের ব্যাকরণগত বোঝা যায়।

তাঁর মতে দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে এই বর্গের অন্তর্গত ভাষাগুলিতে বাক্যে নির্দিষ্ট অবস্থানের বাইরেও পদের সঙ্গে যুক্ত বিভক্তি থেকেই তার ব্যাকরণগত জানা যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পদের ব্যাকরণগত জানার জন্য পদকে বাক্যে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনের প্রয়োজন হয় না।[৮] এই কারণেই এই বর্গের ভাষায় বাক্যের গঠনে পদবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়মের গুরুত্ব ততটা নেই। পক্ষান্তরে প্রথম বর্গের অন্তর্গত ভাষাগুলিতে বাক্যের গঠন পদবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে, পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গের উপভাষাকে একক ভাবে কোনো বর্গের অন্তর্গত নয়, মিশ্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। কারণ এই উপভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি যুক্ত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বর্জায় আছে এবং এর বাক্যের গঠন পদবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও কোথাও কোথাও এই নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটে থাকে। পরবর্তী অধ্যায়ে পদবিন্যাসরীতির আলোচনায় এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য উদাহরণ সহযোগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

---

(৬) সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ৭৩ -৭৪

(৭) তদেব, পৃঃ ৭৩

(৮) তদেব, পৃঃ ৭৩-৭৪

পঞ্চম অধ্যায়

পদবিন্যাসরীতি

নব্যভারতীয় আর্যভাষাসমূহের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে যে মূল ভাষার জন্মবিবর্তিত রূপ এই ভাষাগুলি, সেই জননী ভাষা প্রাচীনভারতীয় আর্যে পদবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়মের প্রয়োজন ততটা ছিল না। কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্য স্তরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভক্তি লুপ্ত হওয়ার ফলে বাক্যে পদসংস্থানরীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, এবং নব্য ভারতীয় আর্য স্তরে পদসংস্থানরীতি নব্যভারতীয় আর্য-ভাষাগুলির একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য পরিগণিত হয়।[১] ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের বিবর্তনের এই সাধারণ সূত্র উত্তরবঙ্গের উপভাষার ক্ষেত্রেও কার্যকরী হয়েছে। এই উপভাষার প্রাচীন বৈশিষ্ট্য যা-ই হোক না কেন, বর্তমানে এর বাক্যবন্ধ মোটামুটিভাবে পদবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বিষয়ে অপরাপর নব্যভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে এই উপভাষার এক ধরনের সাযুজ্য রয়েছে। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই উপভাষায় বাক্যগঠনের নিয়ম যে বিপর্যস্ত হয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ের উপসংহারে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় ২৯ সংখ্যক সূত্রে এই বিষয় প্রমাণসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের কার্যকারিতা এবং ভূমিকার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভিক্টোরিয়া ফ্রমকিন এবং রবার্ট রডম্যান বাক্যের এই দুটি মুখ্য উপাদানকে যথাক্রমে 'Referring Expression' এবং 'Relating Expression' বলে চিহ্নিত করেছেন।[২] উদ্দেশ্য এবং বিধেয়কে এই জাতীয় অভিধা প্রদানের পিছনে ফ্রমকিন এবং রডম্যান-এর প্রদর্শিত যুক্তির মূল কথা হ'ল এই যে যাকে 'সাবজেক্ট' বা 'রেফারিং এক্সপ্রেশান' বলা হচ্ছে তা বাক্যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের অস্তিত্বকে নির্দেশ করে, আর 'প্রেডিকেট' বা 'রিলেটিং এক্সপ্রেশান'-এর কাজ হ'ল নির্দেশিত ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের সঙ্গে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, ভাব, ক্রিয়া বা সাধারণ ধর্মের সংযোগসাধন। এই যুক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্য উত্তরবঙ্গের উপভাষা থেকে একটি বাক্যের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। যেমন-

রেফারিং এক্সপ্রেশান	রিলেটিং এক্সপ্রেশান	
গরু	ঘাস খায়	'গরু ঘাস খায়'

---

(১) সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ১০৭-১০৯

(২) ফ্রমকিন ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড রডম্যান রবার্ট, অ্যান ইনট্রোডাকশন টু ল্যাঙ্গুয়েজ, হল্ট, রাইনহার্ট অ্যান্ড উইনস্টন ইনক, ১৯৭৮, পৃঃ ১৩৮

উদ্ধৃত বাক্যটিতে ব্যবহৃত বিশেষ্যপদ 'গরু' ভারতীয় বৈয়াকরণদের কাছে 'উদ্দেশ্য' এবং ফ্রমকিন ও রডম্যান প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য বৈয়াকরণদের কাছে 'সাবজেক্ট' বা 'রেফারিং এক্সপ্রেশন' ইত্যাদি। বাক্যটিতে এই অংশটুকুর ভূমিকা হ'ল 'গরু' নামক একটি প্রাণীর অস্তিত্ব নির্দেশ করা এবং 'প্রিডেটিং এক্সপ্রেশন' 'ঘাস্ খায়' অংশটুকুর ভূমিকা হ'ল উদ্দেশ্য 'গরু'-র সঙ্গে ঘাস খাওয়া ক্রিয়ার সম্পর্ক স্থাপন করা।

আবার যেহেতু বাক্যের যে অংশটি উদ্দেশ্য বা 'রেফারিং এক্সপ্রেশন' তাতে মূলতঃ একটি বিশেষ্য বা একটি সর্বনাম, এবং যে অংশটি বিধেয় বা 'প্রিডেটিং এক্সপ্রেশন' তাতে মূলতঃ একটি ক্রিয়ার উপস্থিতি অপরিহার্য তাই উল্লিখিত ভাষাতাত্ত্বিকরা এই দুটি অংশকে যথাক্রমে 'Noun Phrase' এবং 'Verb Phrase' অভিধা দিয়েছেন।[৩] উল্লেখ্য যে বাক্যের প্রথম অংশের বিশেষ্য বা সর্বনাম এবং দ্বিতীয় অংশের ক্রিয়া বাক্যের গঠনে অনুপস্থিত থাকতে পারে। কিন্তু বাক্যের ভাবে এরা সর্বদাই উপস্থিত। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে উত্তরবঙ্গের উপভাষা থেকে একাধিক বাক্যের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেমন-

	নাউন ফ্রেজ	ভার্ব ফ্রেজ	
(১)	নরেন্	গাও ধুবার্ ধরিছে	'নরেন স্নান করছে'
(২)	(আমরা)[৪]	যাবাই তোমার্ বারি	'(আমরা) যাইবো তোমাদের বাড়ি'
(৩)	তোমরা	মোর্ বাপ্ (হন্)	'আপনি আমার বাবা (হন)'

১ সংখ্যক বাক্যে 'নাউন ফ্রেজ' এবং 'ভার্ব ফ্রেজ' এই দুটি অংশই যথাযথভাবে উপস্থাপিত। কিন্তু ২ এবং ৩ সংখ্যক বাক্যে যথাক্রমে 'নাউন ফ্রেজ'-এর বিশেষ্য বা সর্বনাম এবং 'ভার্ব ফ্রেজ'-এর ক্রিয়া শারীরিকভাবে অনুপস্থিত। অথচ বাক্যদুটির অর্থে এই দুটি উপাদানই উপস্থিত। আবার এই অনুপস্থিতি বাক্যদুটির ব্যাকরণগত শুদ্ধিরও বাধা হয়ে ওঠেনি। তাহলে অতঃপর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কোনো বাধা নেই যে যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অংশের বিশেষ্য বা সর্বনাম এবং বিধেয় অংশের ক্রিয়া বাক্যের শরীরে অনুপস্থিত থাকে তবুও বাক্যের এই দুটি মুখ্য অংশের আবশ্যিক উপাদান যথাক্রমে অন্ততঃ একটি বিশেষ্য বা সর্বনাম এবং অন্ততঃ একটি ক্রিয়া।

(১) ফ্রমকিন এবং রডম্যান-এর সিদ্ধান্তের সমর্থনে উপস্থাপিত উত্তরবঙ্গের উপভাষা থেকে গৃহীত বাক্যগুলির বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে -

(ক) মিশ্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যের মুখ্য উপাদান দুটি-(১) উদ্দেশ্য (২) বিধেয়।

---

(৩) তদেব, পৃঃ ১৪০

(৪) বাক্যের প্রকাশভঙ্গিতে অনুক্ত উপাদানগুলিকে প্রথমবন্ধনীভুক্ত করা হয়েছে।

(খ) নব্যভারতীয় অন্যান্য ভাষার মত এই উপভাষাতেও উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের ভূমিকা যথাক্রমে বাক্যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের অস্তিত্ব নির্দেশক এবং নির্দেশিত অস্তিত্বের সঙ্গে কোনো ক্রিয়া, বস্তু, ব্যক্তি, ভাব বা সাধারণ ধর্মের যোজক-এর।

(গ) উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের আবশ্যিক উপাদান যথাক্রমে অন্ততঃ একটি বিশেষ্য বা সর্বনাম এবং অন্ততঃ একটি ক্রিয়া।

(ঘ) উল্লিখিত উপাদান দুটির যে কোনো একটি বাক্যে অনুপস্থিত থাকলেও বাক্যের ব্যাকরণগত শুদ্ধতা বিঘ্নিত হয় না এবং বাক্যের অর্থোদ্ধারের সময়ে এদের উপস্থিতি অপরিহার্য।

(২) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সম্বন্ধপদ, বিশেষণ ইত্যাদির সংযোগে পূর্ণতর একটি উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ করলে ১ সংখ্যক সূত্রে উল্লিখিত উপাদানগুলি ছাড়া আরও দুটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই উপাদান দুটি হ'ল - (ক) উদ্দেশ্যের প্রসারক এবং (খ) উদ্দেশ্যের সম্পূরক। উদাহরণ- তোমার্ কালা গরুটা খুব্ তেজি 'তোমাদের কালো গরুটি খুব তেজী'। উদ্ধৃত বাক্যটিতে সম্বন্ধপদ 'তোমার্' এবং বিশেষণ 'কালা' উদ্দেশ্য 'গরুটা'-র প্রসারক এবং 'খুব্ তেজি' এই বিশেষণটি উদ্দেশ্যের সম্পূরক। উল্লেখ্য যে যোজক বা সত্তাবাচক ক্রিয়া 'হয়' বাক্যটিতে অনুপস্থিত।

(৩) উদ্দেশ্যের মত কর্ম, সম্প্রদান বা অন্য কারকে প্রযুক্ত বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম বা অব্যয় সহযোগে পূর্ণতর একটি বিধেয়কে বিশ্লেষণ করলে ১ সংখ্যক সূত্রে উল্লিখিত উপাদানগুলি ছাড়া বিধেয়েরও আরও দুটি উপাদান পাওয়া যেতে পারে। উপাদান দুটি হ'ল-(ক) বিধেয়ের প্রসারক এবং (খ) বিধেয়ের সম্পূরক। উদাহরণ- মাস্টার্ হাতদুটোরোক্ পাপাউ পাপাউ করি তাঙেবার্ ধরিয়ে '[illegible] 'শিক্ষক ছাত্রকে সপাং সপাং করে মারছেন'। উদ্ধৃত বাক্যটিতে 'তাঙেবার্ ধরিছে' বিধেয়, 'হাতদুটোরোক্' বিধেয়ের সম্পূরক এবং 'পাপাউ পাপাউ করি' ক্রিয়া বিশেষণধর্মী এই বাক্যাংশটি বিধেয়ের প্রসারক।

২ এবং ৩ সংখ্যক সূত্রের আলোচনা থেকে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যে উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান সম্পর্কে একটি সাধারণ সূত্র স্থির করা যেতে পারে -

(ক) এই উপভাষায় বাক্যে উদ্দেশ্যের আবশ্যিক উপাদান হ'ল অন্ততঃ একটি বিশেষ্য বা একটি সর্বনাম।

(খ) বিধেয়ের আবশ্যিক উপাদান হ'ল অন্ততঃ একটি ক্রিয়া।

(গ) এই দুটি উপাদানের যে কোনো একটি বাক্যের প্রকাশভঙ্গায় অনুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু বাক্যের অর্থবোধের সময় এদের অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং এদের অনুপস্থিতিতে বাক্যের কায়া নির্মাণে ব্যাকরণগত ত্রুটির সম্ভাবনা নেই।

(খ) আবশ্যিক উপাদান ছাড়াও উদ্দেশ্যের উপাদান আরও দুটি হতে পারে –

(১) উদ্দেশ্যের প্রসারক

(২) উদ্দেশ্যের সম্পূরক

(গ) সমানভাবে আবশ্যিক উপাদান ছাড়া বিধেয়ের উপাদানও আরও দুটি হতে পারে –

(১) বিধেয়ের প্রসারক

(২) বিধেয়ের সম্পূরক

বাক্যে পদের ক্রম

(৪) (ক) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যে প্রথমে উদ্দেশ্য এবং পরে বিধেয় বসে। অর্থাৎ এই উপভাষায় বাক্য = উদ্দেশ্য, বিধেয়। উদাহরণ –

উদ্দেশ্য — বিধেয়

মহেন্ — হাট্ জায় — 'মহেন হাটে যায়'

(খ) সাধারণভাবে বাক্যে পদের ক্রম এই রকমের হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিধেয়ের উপরে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বিধেয়কে বাক্যের শুরুতে, অর্থাৎ উদ্দেশ্যের আগে বসিয়ে বাক্য গঠনের দৃষ্টান্তও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ–

ঘন্ বনে হাটি জাবার্ পইছে মান্ষিলা — দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে মানুষগুলি'

(৫) নব্যভারতীয় অপরাপর ভাষার মত উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও বাক্য হ'ল উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যের প্রসারক, সম্পূরক, বিধেয়, বিধেয়ের সম্পূরক, প্রসারক ইত্যাদির সমবায়ে গঠিত 'বৃহত্তর ব্যাকরণিক একক' বিশেষ। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলে তা গঠনের সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিধেয় বাক্যের অঙ্গসজ্জা থেকে বাদ যেতে পারে। প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ধরণের বাক্যে উদ্দেশ্য উহ্য থাকে –

(ক) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য

উদাহরণ– (তুই) কাম্ খান কর্ — '(তুমি) কাজটি কর'

(খ) জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য

উদাহরণ – (মুই) কোটে জাইম্ — '(আমি) কোথায় যাব'

(গ) সন্দেহসূচক বাক্য

উদাহরণ – (উয়ায়) আইসে কি না আইসে কায় জানে '(সে) আসে কি না কে জানে'

(ঘ) সাধারণ বর্ণনামূলক বাক্য –

উদাহরণ – (তুই) আক্বারও হামার বারি আসিস্ নাই '(তুমি) একবারও আমাদের বাড়িতে আসোনি'

এই উপভাষায় সাধারণতঃ প্রশ্নোত্তরমূলক বাক্যে বিধেয় উহ্য থাকে। যেমন- যদি প্রশ্ন করা হয় যে 'এই কাম্ খান্ কায় করিছে' -'এই কাজটি কে করেছে' তাহলে তার উত্তর একাধিক হতে পারে। যথা- উয়ায় 'সে', উমুরা 'তারা', মুই 'আমি', হামরা 'আমরা' ইত্যাদি। এই উত্তরসূচক একপদময় বাক্যগুলির সমস্তই এক একটি সর্বনাম। এই ধরনের একপদময় বাক্য যেমন বাক্য, তেমনি উয়ায় করিছে 'সে করেছে', উমুরা করিছে 'তারা করেছে', মুই করছুং 'আমি করেছি', হামরা করিছি 'আমরা করেছি' ইত্যাদি একাধিক পদযুক্ত বাক্যও বাক্য। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রশ্নোত্তরমূলক বাক্য হিসেবে এই দুধরনের বাক্যের প্রচলন থাকলেও একপদময় (যাতে বিধেয় উহ্য থাকে) বাক্যের প্রচলনই সর্বাধিক।

(৬) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যে উদ্দেশ্যের প্রসারক এবং সম্পূরকের অবস্থানক্রম নিম্নরূপ।

(ক) উদ্দেশ্যের প্রসারক

(খ) উদ্দেশ্য

(গ) উদ্দেশ্যের সম্পূরক

উদাহরণ- তোমার লাল্ বাছুরটা খিব্ মোটা 'তোমাদের লাল বাছুরটি খুব মোটা'

উদ্ধৃত বাক্যটিতে সম্বন্ধপদ 'তোমার্' এবং বিশেষণ 'লাল্' উদ্দেশ্যের এই প্রসারক দুটি বসেছে বাক্যের প্রথমে, উদ্দেশ্য 'বাছুর্' বসেছে তার পরে এবং উদ্দেশ্যের সম্পূরক 'খিব্ মোটা' এই বিশেষণটি বসেছে সবশেষে।

(৭) বিধেয়ের সম্পূরক এবং প্রসারকের অবস্থানক্রম এই উপভাষায় নিম্নানুরূপ -

(ক) বিধেয়ের প্রসারক, সম্পূরক/সম্পূরক, প্রসারক

(খ) বিধেয়

((গ) ক্রিয়া

প্রসারক এবং সম্পূরক বিধেয়ের আগে বসলেও এ দুয়ের অবস্থানের পারস্পরিক পূর্বাপরতা সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। এদের অবস্থানের পূর্বাপরতা বাক্যের অভিপ্রায় বা ঝোঁক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রসারকের প্রতি ঝোঁক থাকলে প্রসারক আগে, সম্পূরকটি পরে এবং সম্পূরকের উপর ঝোঁক থাকলে সম্পূরক আগে ও প্রসারক পরে বসে। উদাহরণ-

(ক) মুই আজি দৌড়ি দৌড়ি অনেক্ দূর্ গেছুং 'আজ আমি দৌড়ে দৌড়ে অনেক দূর গিয়েছি'

(খ) মুই আজি অনেক্ দূর্ দৌড়ি দৌড়ি গেছুং 'আজ আমি অনেক দূর দৌড়ে দৌড়ে গিয়েছি'

ক সংখ্যক বাক্যটিতে প্রসারকের উপরে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে প্রসারক 'দৌড়ি দৌড়ি' সম্পূরক 'অনেক্ দূর্'-এর আগে বসেছে। খ সংখ্যক বাক্যটিতে সম্পূরকের উপরে গুরুত্ব দেওয়ায় সম্পূরক 'অনেক্ দূর্'

প্রসারক 'দৌড়ি দৌড়ি'-এর আগে বসেছে এবং দুটি বাক্যেই বিধেয় ক্রিয়া 'গেছুং' বর্ণিত ক্রমসজ্জা অনুসারে বসেছে বাক্যের শেষে।

(৮) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যে ক্রিয়ার অবস্থান সাধারণভাবে প্রান্তিক হলেও প্রসারক এবং সম্পূরক এ দুয়ের যে কোনো একটির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা যখন বাক্যের উদ্দেশ্য হয় তখন ক্রিয়া উল্লিখিত উপাদানদুটির আগে চলে যায়। উদাহরণ- উয়ায় কাজ্ করে ভাল্, কিন্তুক কথা কয় বেশি' সে কাজ করে ভাল, কিন্তু কথা বলে বেশী'।

(৯) উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের প্রসারক এবং সম্পূরকের পারস্পরিক অবস্থানক্রম -

সাধারণতঃ বিধেয়ের প্রসারক উদ্দেশ্যের পরে বসে। যেমন- মানষিটা ঘন্ ঘনে হাটি যায়" মানুষটি দ্রুত হেঁটে যায়'। বাক্যটিতে বিধেয়ের প্রসারক 'ঘন্ ঘনে' উদ্দেশ্য 'মানষিটা'-র পরে বসেছে। কিন্তু বিধেয়ের প্রসারকের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হলে, অথবা বিধেয়ের প্রসারক বাক্যের মধ্যে কোনো বিশেষ অভিপ্রায়ের দ্যোতক হিসেবে উপস্থিত হলে তা উদ্দেশ্যের আগে বসতে পারে। যেমন- ভক্কোরায় ভাল্ মানষি হোছইস্ তুই 'সত্য সত্যই ভাল মানুষ হও তুমি'।

বিধেয়ের সম্পূরক উদ্দেশ্যের পরে বসে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা উদ্দেশ্যের আগেও বসে। উদাহরণ -

(ক) মুই অনেক্গিলা ভাত্ খাবার্ পাঙ্ 'আমি অনেকগুলি ভাত খেতে পারি'

(খ) অনেক্গিলা ভাত্ খাবার্ পাঙ্ মুই 'অনেকগুলি ভাত খেতে পারি আমি'

ক সংখ্যক বাক্যটিতে বিধেয়ের সম্পূরক 'অনেক্গিলা' উদ্দেশ্য 'মুই'-এর পরে বসেছে। কিন্তু খ সংখ্যক বাক্যটিতে তা উদ্দেশ্যের আগে বসেছে।

(১০) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যের গঠন নিম্নরূপ হলে বাক্যে অস্তিত্ববাচক বা যোজক বা সমতাবাচক ক্রিয়া উহ্য থাকে।

(ক) বাক্য = পুরুষবাচক [illegible] সর্বনাম, বিশেষ্য

উদাহরণ- মোর্ বই 'আমার বই'
তোর্ বই 'তোর্ বই' ইত্যাদি।

(খ) বাক্য = নির্দেশক সর্বনাম, বিশেষ্য

উদাহরণ- এইটা গরুএ (হয়) 'এটি গরুই (হয়)'
হোটা মানষিএ (হয়) 'ওটা মানুষই (হয়)' [illegible]
ঐলা কথায় (হয়) 'ঐ কথাগুলিই (হয়)' ইত্যাদি।

(গ) বাক্য = পুরুষবাচক, নির্দেশক ও অন্যান্য সর্বনাম, বিশেষণ

উদাহরণ – তুই(হইস্) ভাল্ 'তুমি(হও) ভাল'

ঠেনরা(হয়) বয়া 'উনারা(হয়) খারাপ' ইত্যাদি।

(ঘ) বাক্য = নির্দেশক সর্বনাম, সম্বন্ধপদ, বিশেষ্য

উদাহরণ – হেটা(হয়) কার্ বাড়ি 'এটা(হয়) কার বাড়ি' ইত্যাদি।

হেটা(হয়) মোর্ বাড়ি 'এটা(হয়) আমার বাড়ি' ইত্যাদি।

(ঙ) বাক্য = সম্বন্ধপদ, বিশেষ্য, প্রশ্নসূচক সর্বনাম

উদাহরণ – তোর্ নাম্ কি(হয়) 'তোমার নাম কী(হয়)'

তোর্ দাদা কায়(হয়) 'তোমার দাদা কে(হয়)' ইত্যাদি।

(চ) বাক্য = সম্বন্ধপদ, বিশেষ্য, বিশেষ্য

উদাহরণ – মোর্ নাম(হয়) নগেন্ 'আমার নাম(হয়) নগেন'

তোর্ নাম(হয়) নগেন্ 'তোমার নাম(হয়) নগেন' ইত্যাদি।

(ছ) বাক্য = সম্বন্ধপদ, বিশেষ্য, স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

উদাহরণ – তোর্ বাড়ি(হয়) কোটে 'তোমার বাড়ি(হয়) কোথায়'

মোর্ বাড়ি(হয়) এইটে 'আমার বাড়ি(হয়) এখানে' ইত্যাদি।

(জ) বাক্য = বিশেষ্য/সর্বনাম, সম্বন্ধপদ, বিশেষ্য

উদাহরণ – উয়ায়(হয়) মোর্ ভাই 'সে(হয়) আমার ভাই'

নগেন(হয়) তোর্ ভাই 'নগেন(হয়) তোমার ভাই' ইত্যাদি।

(১১) স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ সাধারণভাবে উদ্দেশ্যের পরে বসে। যেমন – তুই এইটে বসি থাকিস্ 'তুমি এখানে বসে থেকো'। কিন্তু যখন স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণের উপরে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় তখন তা স্বাভাবিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে উদ্দেশ্যের আগে চলে যায়। যেমন – এইটেকনায় তুই বসি থাকুবু 'এখানেই তুমি বসে থাকবে'। অনুরূপভাবে ক্রিয়া বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত বাক্যাংশও উদ্দেশ্যের আগে বা পরে যে কোনো জায়গায় বসতে পারে। উদাহরণ–

(ক) খাম্ খাম্ করি হেটে বসি না থাকোস্ তুই 'নিষ্কর্ম হয়ে এখানে বসে থাকিস না'

(খ) তুই হেটে খাম্ খাম্ করি বসি না থাকোস্ 'তুমি এখানে নিষ্কর্ম হয়ে বসে থাকি না'

ক সংখ্যক বাক্যটিতে 'খাম্ খাম্ করি' ক্রিয়া বিশেষণ ধর্মী এই বাক্যাংশটি উদ্দেশ্যের আগে বসেছে এবং খ সংখ্যক বাক্যটিতে উদ্দেশ্যের পরে বসেছে। ক্রিয়া বিশেষণ ধর্মী বাক্যাংশের অবস্থানের এই জাতীয় স্বাধীনতা উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যের ব্যাকরণগত অশুদ্ধি ঘটায় না।

(১২) (ক) এই উপভাষায় বাক্যে কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ সাধারণতঃ স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণের আগে বসে। যেমন – তুই সমবারর্‌ দিনা এইটে আসুবু 'তুমি সোমবারে এখানে আসবে'। উদ্ধৃত বাক্যটিতে কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ 'সমবারর্‌ দিনা' স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ 'এইটে'–এর আগে বসেছে।

সাধারণভাবে বাক্যগঠনে এই দুটি উপাদানের অবস্থানক্রম এই রকম হলেও প্রায় সর্বত্রই গুরুত্বভেদে এরা যথেচ্ছভাবে পরস্পরের আগে বা পরে বসতে পারে। উদাহরণ–

(১) তুই কালি হামার্‌ এতড়ি আসুবু 'তুমি কাল আমাদের এদিকে আসবে'

(২) তুই হামার্‌ এতড়ি কালি আসুবু 'তুমি আমাদের এদিকে কাল আসবে'

১ সংখ্যক বাক্যটি স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণের উপরে গুরুত্ব দিয়ে এবং ২ সংখ্যক বাক্যটি কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণের উপরে গুরুত্ব দিয়ে রচিত। দুটি বাক্যে পদের অবস্থান দেখে বোঝা যাচ্ছে যে স্থানবাচক এবং কালবাচক এই দুটি ক্রিয়া বিশেষণের মধ্যে যেটির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেটি অপরটির পরে বসে।

(খ) অতীত কালের কোনো ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার সময়ে স্থানবাচক এবং কালবাচক, উভয় প্রকারের ক্রিয়া বিশেষণই উদ্দেশ্যেরও আগে, বাক্যের আরম্ভে বসতে পারে। উদাহরণ–

আর্‌ বছোর্‌ জলপাইগুড়িত্‌ বানা হইছেলো 'গত বছর জলপাইগুড়িতে বন্যা হয়েছিল'

এক্ষেত্রেও স্থানবাচক এবং কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণের অবস্থানের পূর্বাপরতা বাক্যের অভিপ্রায় বা গুরুত্বের উপরে নির্ভর করে।

(গ) পদ্ধতিসূচক ক্রিয়া বিশেষণ (adverb of manners) বাক্যে ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন– মুই কাদোর্‌ উপোর্‌ দিয়া পাও্‌ টিপি টিপি হাটোঁছ্‌ ' আমি কাদার উপর দিয়ে পা টিপে টিপে হাটি '। কিন্তু ক্রিয়া বিশেষণের উপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হলে তা ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন– চোরের্‌ ঘর্‌ চোর্‌ করে চুপে চুপে 'চোরেরা চুরি করে চুপি চুপি '।

(১৩) বাক্যে অনুসর্গ সর্বদাই বিশেষ্য, বিশেষণ বা সর্বনামের পরে বসে। উদাহরণ–

সগায় তোর্‌ ভিতি চায়া আছে 'সকলেই তোমার দিকে চেয়ে আছে'

মোর্‌ মইধ্যোত্‌ লুকু ছাপা কিছু নাই 'আমার মধ্যে গোপন কিছু নেই'

ভাল্‌ হতে ভাল্‌ আছে 'ভালোর চেয়ে ভাল আছে' ইত্যাদি।

(১৪) বিশেষণ সাধারণতঃ বিশেষ্য বা সর্বনামের আগে বসে থাকে। উদাহরণ–

লাল্‌ গরুটা ধান্‌ খাইছে 'লাল গরুটি ধান খেয়েছে'

পখি পাকা ফল্‌ খায় 'পাখি পাকা ফল খায়' ইত্যাদি।

কিন্তু বিশেষণ যখন বিশেষ্যের বিধেয় রূপে প্রযুক্ত হয়, অথবা বাক্যের প্রকৃতি যখন বর্ণনাত্মক হয়,

অর্থাৎ কোনো বস্তু বা বিষয়ের সাধারণ বর্ণনা বা গুণাবলীর বর্ণনা যখন বাক্যের উদ্দেশ্য হয় তখন বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে। উদাহরণ-

হামার্ বারিটা(হয়) ভাঙা — 'আমাদের বাড়িটি(হয়) ভাঙা'

গছ্টার্ পাত্গিলা(হয়) বাইগুনিয়া — 'গাছটার পাতাগুলি(হয়) সবুজ' ইত্যাদি।

বাক্যে নিষেধাত্মক ভাব আরোপিত হলেও বিশেষণ বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে বসে। উদাহরণ-

আলাকার্ মান্গিলা সরোল্ নোহায় — 'এমনকার মানুষগুলি সরল নয়'

তোমরা মান্ষি ভাল্ নোহান্ — 'আপনি মানুষ ভাল নন' ইত্যাদি।

(১৫) বাক্যে সম্বন্ধপদ সাধারণতঃ বিশেষ্যপদের আগে বসে। উদাহরণ-

হেখান্ মোর্ বই — 'এখানা আমার বই'

হোটা তোমার্ বারি — 'ওটি তোমাদের বাড়ি' ইত্যাদির।

কিন্তু নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলিতে সম্বন্ধপদ তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়। উদাহরণ-

(ক) প্রশ্নে - হেখান্ বই কার্ — 'এই বইখানা কার'

(খ) নিশ্চয়তায় - হোখান্ বই মোরে — 'ঐ বইখানা আমারই'

(গ) ভাবে -বাছা নিমাইরে মোর্ — 'বাছা নিমাইরে আমার' ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে যে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে সম্বন্ধপদ বিশেষ্যপদের পরে বসেছে। তবে এই সব ক্ষেত্রে সম্বন্ধপদের এই জাতীয় অবস্থান আবশ্যিক নয়। তা বিশেষ্যের আগেও বসতে পারে।

(১৬) (ক) শিষ্ট বাংলায় বাক্যে কর্তা এবং ক্রিয়ার মধ্যে পুরুষ বিষয়ক এবং লঘু-গুরু বিষয়ক সঙ্গতি মেনে চলা হয়। অর্থাৎ বাক্যের কর্তা যে পুরুষের অন্তর্গত ক্রিয়ার রূপ সেই পুরুষের উপযোগী হয়। কর্তা মধ্যম পুরুষ তুচ্ছতাবোধক বা মধ্যম পুরুষ সম্ভ্রমবোধক হলে বাক্যে তদনুসারী ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়। শিষ্ট বাংলায় প্রচলিত এই নিয়মগুলি উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও বাক্যে ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। অধিকন্তু এই উপভাষায় বচনভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ ঘটে বলে বাক্যে ক্রিয়ার বচন বিষয়ক সঙ্গতিকেও মেনে চলা হয়। আর শিষ্ট বাংলায় যেহেতু বচনভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ ঘটে না তাই এক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ ব্যবহারে বচন বিষয়ক সঙ্গতির প্রশ্ন নিরর্থক। উদাহরণ-

(১) মুই বারি জাও্ — 'আমি বাড়ি যাই'

(২) হামরা বারি জাই — 'আমরা বাড়ি যাই'

(৩) তুই বারি জাইস্ — 'তুমি বাড়ি যাও'

(৪) তোমরা বারি জান্ — 'তোমরা বাড়ি যাও'

(৫) উয়ায় বারি জায় 'সে বাড়ি যায়'

(৬) উমুরা বারি জায় 'তারা বাড়ি যায়'

(৭) তোমরা বারি জান্ 'আপনি বাড়ি যান'

(৮) উমুরা বারি জায় 'তিনি বাড়ি যান' ইত্যাদি।

উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যে ক্রিয়াপদ ব্যবহারে বচন, পুরুষ এবং লঘু-গুরু বিষয়ক সঙ্গতির প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং পাশাপাশি বাক্যগুলির অর্থস্বরূপ প্রদত্ত বাংলা বাক্যগুলি থেকে এ বিষয়ে শিষ্ট বাংলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য বোঝা যাচ্ছে। লক্ষণীয় যে এই উপভাষায় মধ্যম পুরুষের বহুবচন, মধ্যম পুরুষ সম্ভ্রমবাচক একবচন এবং বহুবচন, এই তিনটি ক্ষেত্রেই ক্রিয়ার রূপ এক। প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে বচন এবং লঘু-গুরু ভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ঘটে না।

(খ) বাক্যে যদি বিভিন্ন পুরুষবাচক কর্তা থাকে এবং তার মধ্যে উত্তম পুরুষবাচক কর্তা থাকে তাহলে ক্রিয়া উত্তম পুরুষের অনুগামী হয়। এক্ষেত্রে উত্তম পুরুষের কর্তা যদি একবচনেরও হয়, তবুও যেহেতু বাক্যের কর্তা একাধিক, তাই ক্রিয়া উত্তম পুরুষের একবচনের অনুসারী হলেও তার রূপ বহুবচনের উপযোগী হয়। উদাহরণ-

মুই, তুই আর্ উয়ায় মিলি জামো 'তুমি, সে এবং আমি মিলে যাব'।

(গ) বাক্যের কর্তা যদি মধ্যম এবং প্রথম পুরুষবাচক হয় তাহলে ক্রিয়াপদ মধ্যম পুরুষবাচক কর্তার অনুসারী হয়। এক্ষেত্রে মধ্যম পুরুষের কর্তা একবচনের হলেও বাক্যে যেহেতু একাধিক কর্তা রয়েছে, তাই ক্রিয়ার রূপ মধ্যম পুরুষের বহুবচনের উপযোগী হয়। উদাহরণ-

দোমাসু আর্ তুই মিলি জাবেন্ 'দোমাসু এবং তুমি মিলে যাবে'

উমুরা আর্ তোমরা মিলি জাবেন্ 'তারা এবং তোমরা মিলে যাবে' ইত্যাদি।

(ঘ) বাক্যের কর্তা উত্তম এবং মধ্যম পুরুষবাচক হলে ক্রিয়া উত্তম পুরুষবাচক কর্তার অনুগামী হয় এবং তার রূপ বহুবচনের উপযোগী হয়। উদাহরণ-

তুই আর্ মুই মিলি করি 'তুমি এবং আমি মিলে করি'

তোমরা আর্ হামরা মিলি দেখি 'তোমরা এবং আমরা মিলে দেখি' ইত্যাদি।

(ঙ) বাক্যের কর্তা প্রথম এবং উত্তম পুরুষবাচক হলে ক্রিয়া উত্তম পুরুষবাচক কর্তার অনুসারী, এবং তার রূপ বহুবচনের উপযোগী হয়। উদাহরণ-

উয়ায় আর্ মুই মিলি হাট্ করি 'সে এবং আমি মিলে বাজার করি'

উমুরা আর্ হামরা কাম্ করি 'তারা এবং আমরা কাজ করি' ইত্যাদি।

(১৬) বাক্যে একাধিক কর্তার মধ্যে যদি মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমবাচক কর্তা থাকে এবং বাকী সমস্ত কর্তা যদি ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ এবং বচনের অন্তর্গত হয় এবং তুচ্ছতা বোধক হয় তাহলেও ক্রিয়ার রূপ মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমবাচক বহুবচনের উপযোগী হয়। উদাহরণ–

নগেন্ আর্ তোমরা আইলেন্ 'নগেন এবং আপনি এলেন'

দ্যাবনাথ্ আর্ তোমরা জাও 'দেবনাথ এবং আপনি যান' ইত্যাদি।

আলোচিত সূত্রাবলী এবং প্রদত্ত উদাহরণমালা থেকে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যে ক্রিয়াপদ প্রয়োগের রীতি সম্পর্কে অতঃপর এই সাধারণ সূত্র স্থির করা যেতে পারে যে এই উপভাষায় বাক্যে একাধিক কর্তার মধ্যে উত্তম পুরুষবাচক কর্তা থাকলে ক্রিয়া উত্তম পুরুষের অনুগামী হয় এবং বাক্যের কর্তা একাধিক হলে ক্রিয়া যে কর্তার অনুগামী তা একবচনের হলেও ক্রিয়ার রূপ বহুবচনের উপযোগী হয়। আবার বাক্যের কর্তা প্রথম ও মধ্যম পুরুষবাচক হলে ক্রিয়া মধ্যম পুরুষের অনুসারী হয় এবং একাধিক কর্তা থাকার জন্য এক্ষেত্রেও তার রূপ বহুবচনের উপযোগী হয়।

(১৭) বাক্যের একাধিক কর্তার মধ্যে ক্রিয়াপদ যে কর্তার অনুসারী হয় তা সাধারণতঃ শেষে বসে এবং একাধিক কর্তাকে যুক্ত করার জন্য সংযোজক অব্যয় 'আর্' সেই কর্তার আগে স্থাপিত হয়। উদাহরণ–

নগেন, শচিন্, তুই আর্ মুই মিলি অ্যাকসতে হাট্ জামো 'নগেন, শচীন, তুমি এবং আমি মিলে একসঙ্গে হাটে যাব'।

(১৮) বাক্য যখন একাধিক অপ্রধান আশ্রিত বা খণ্ডবাক্যের সমবায়ে গঠিত হয় তখন আশ্রিত উপবাক্যটি মূল বাক্যের আগে বসে এবং 'জদি', 'তাহইলে', 'বাদে', 'তানে', 'বাদি', 'জইন্নে' ইত্যাদি সমুচ্চয়ী এবং অসমাপিকা ক্রিয়া 'বুলি', 'বুলিয়া' সমুচ্চয়ী অব্যয়রূপে কারণসূচক উপবাক্যটির পরে বসে মূল বাক্যের সঙ্গে উপবাক্যের সংযোগ স্থাপন করে। উদাহরণ–

মুই জদি না জাও, তাহইলে কাম্ হবে না 'আমি যদি না যাই তাহলে কাজ হবে না'

তোমরা আসিবেন্ বাদে মুই বাড়িত্ আছুও্ 'আপনি আসবেন বলে আমি বাড়িতে আছি'

মুই জাইম্ ঐতানে উমুরাও জাবে 'আমি যাব, ঐজন্য তারাও যাবে'

খারাপ্ কাজ্ কচ্চিশ্ বুলি এই চক্ দশা হইচে 'খারাপ কাজ করেছ বলে এই দশা হয়েছে'

বসুনাম্ আসিবে, এইজইন্নে ছাতি নিলুও্ 'বৃষ্টি আসবে, এইজন্য ছাতা নিলাম'

ভাত্ আন্ধিবু, ঐবাদি গাও ধুলু 'ভাত রাঁধবে, এইজন্য স্নান করলে' ইত্যাদি।

(১৯) (ক) বাক্যে একাধিক উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যের একাধিক প্রসারক থাকলে সমুচ্চয়ী অব্যয় 'আর্' এবং বৈকল্পিক অব্যয় 'বা', 'নাহয়', 'কিবা' ইত্যাদি সর্বশেষ উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যের প্রসারকটির আগে

স্থাপিত হয়। উদাহরণ-

কালু, বালু আর্ নরেন্ আজি হাট জাবে 'কালু, বালু এবং নরেন আজ হাটে যাবে'

আজি বা কালি জেদিন্ তুমি আসিন্ 'আজ বা কাল যেদিন খুশী এসো'

উয়ায়, মুই নাহয় তুই কইলে হবে 'সে, আমি অথবা তুমি বললেই হবে'

নদি কিবা নালা সগুলতে জল্ বাড়িচে 'নদী কিংবা নালা সর্বত্রই জল বেড়েছে' ইত্যাদি।

(খ) একভাবে বাক্যে একাধিক উদ্দেশ্য কিংবা উদ্দেশ্যের একাধিক প্রসারকের সমাবেশ ঘটলে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সেগুলিকে একাধিক উপবাক্যে বিভক্ত করা হয় এবং এই বিভাগগুলিকে একাধিক যোজকের সাহায্যে যুক্ত করে প্রথম বাক্যটি গঠিত হয়। উদাহরণ-

উয়ার্ গরু আর্ বাছুর্, উয়ার্ টাকা আর্ পাইসা, উয়ার্ বাড়ি আর্ ঘর্, কিন্তুর্ কোনোয় দাম্ নাই, জদি দেহাত্ সুখ্ না থাকে -'তার গরু আর বাছুর, তার টাকা আর পয়সা, তার বাড়ি আর ঘর, এদের কোনোই দাম নেই, যদি দেহে সুখ না থাকে'।

লক্ষণীয় যে উদ্ধৃত বাক্যটিতে সম্বন্ধপদ 'উয়ার্' প্রভৃতি সম্বন্ধী বা বাক্যের অপ্রাংশে পৌনঃপুনিক-ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এই ধরনের বাক্যে সম্বন্ধপদের এই পৌনঃপুনিক ব্যবহারের রীতি অবশ্যপালনীয় না হলেও সাধারণভাবে এই জাতীয় প্রয়োগ এই উপভাষায় ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে তা বাক্যের ব্যাকরণগত বিশুদ্ধিকেও বিঘ্নিত করে না।

(২০) (ক) বাক্যে সংস্থাপিত একাধিক কর্তার সবগুলিই যদি বিশেষ্যপদবাচ্য হয় তাহলে সেগুলির মধ্যে যে পদটি সবশেষে স্থাপিত হয়, একমাত্র সেই পদটির সঙ্গেই বিভক্তি যুক্ত হয়। বাকী পদগুলিতে বিভক্তি চিহ্ন প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন হয় না। সর্বশেষ পদটিতে প্রযুক্ত বিভক্তিই সেই পদগুলির উপরে বর্তায়। বহুবচনসূচক প্রত্যয় প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নিয়ম একই রকমের। অর্থাৎ বহুবচনসূচক প্রত্যয়ও একমাত্র সর্বশেষ পদটির সঙ্গেই যুক্ত হয়। উদাহরণ-

নরেন্ আর্ জতিনোক্ টাকা দিম্ 'নরেন এবং যতীনকে টাকা দেব'

দাহেন্ আর্ সিরিনের্ টাকা আছে 'দেবেন এবং শিরেনের টাকা আছে'

আষার্ আর্ সন্ মাসোত্ বশ্শোন্ হয় 'আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হয়'

চ্যাংড়া আর্ চেংড়ির্ ঘর্ ইস্কুল্ জায় 'ছেলে এবং মেয়েরা স্কুলে যায়' ইত্যাদি।

(খ) কয়েকটি ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। বাক্যের কর্তা যদি একাধিক সর্বনাম হয়, অথবা একটি বা একাধিক বিশেষ্য এবং একটি বা একাধিক সর্বনাম হয় তাহলে প্রতিটি কর্তার সঙ্গেই বিভক্তি এবং বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয় যুক্ত হয়। উদাহরণ-

তোক্ আর্ মোক্ আকে চোখে দ্যাখে 'তোমাকে এবং আমাকে একই চোখে দেখে'

কানুর্ আর্ তোর্ কথালা ভাল্ নোহায় 'কানুর এবং তোমার কথাগুলি ভাল নয়'

বালুর্ আর্ উয়ার্ কথার্ দাম্ নাই 'বালুর এবং তার কথার দাম নেই' ইত্যাদি।

(গ) এছাড়াও যেখানে বাক্যে উপস্থাপিত পদসমূহের মধ্যে পারস্পরিক পৃথকত্ব বা প্রকৃতিগত বৈষম্য থাকে এবং এই পৃথকত্ব বা বৈষম্য নির্দেশ করা বাক্যের উদ্দেশ্য হয় সেখানে বাক্যের সমস্ত কর্তা সর্বনাম না হলেও সেগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে বিভক্তিচিহ্ন এবং বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয় যুক্ত হয়। উদাহরণ -

আজার্ আর্ পজ্জার্ সামান্ অবেস্থা 'রাজা এবং প্রজার সমান অবস্থা'।

(২১) (ক) বাক্যে একাধিক পদকে যখন সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত করা হয় না অথবা যুক্ত করা হলেও যখন পদগুলির মধ্যে বস্তুগত, ভাবগত বা প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকে তখন সেগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে বিভক্তিচিহ্ন এবং বহুবচনসূচক প্রত্যয় যুক্ত হয়। উদাহরণ-

চ্যাঙ্রার্ আর্ চেঙ্রির্ মত নিবার্ নাগে 'ছেলের এবং মেয়ের মত নিতে হয়'

চৌখোত্ আর্ কানোত্ ত্যাল্ দ্যাও 'চোখে এবং কানে তেল দাও'

ডাইল্ দিয়া ঝোল্ দিয়া ভাত্ খাবো 'ডাল দিয়ে এবং ঝোল দিয়ে ভাত খাব' ইত্যাদি।

(খ) কিন্তু একাধিক পদ মিলিত হয়ে সমাসবদ্ধ পদে পরিণত হলে প্রত্যেকটি পদের জন্য পৃথক পৃথক বিভক্তিচিহ্ন এবং বহুবচনসূচক প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে বিভক্তি এবং প্রত্যয় কেবল উত্তরপদেই যুক্ত হয়। উদাহরণ-

হাত্-ঠ্যাঙোত্ জল্ দিয়া আইসো 'হাত-পায়ে জল দিয়ে এসো'

নাউয়া-বামোনোক্ বিদায় করো 'নাপিত-ব্রাহ্মণকে বিদায় দাও'

চ্যাঙ্রা-চেঙ্রিরা কোটে যায় 'ছেলে-মেয়েরা কোথায় যায়' ইত্যাদি।

(২২) বাক্যে একাধিক অপ্রধান আশ্রিত বাক্য থাকলে এবং অপ্রধান আশ্রিত বাক্যের ক্রিয়া সহ বাক্যে একাধিক ক্রিয়ার সমাবেশ ঘটলে মূল বাক্যের ক্রিয়া এবং অপ্রধান বাক্যের ক্রিয়ার মধ্যে কালগত সঙ্গতি উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বজায় থাকে না। অর্থাৎ অপ্রধান বাক্যের ক্রিয়ার কাল এক্ষেত্রে মূল বাক্যের ক্রিয়ার কালের অনুসারী হয় না। এই অবস্থায় বাক্যস্থিত ক্রিয়ার সর্বশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে ক্রিয়ার কাল নির্ধারিত হয়। উদাহরণ-

তুই যে খোটে আছিস্ তাক্ মুই সন্দেহ করোও নাই - 'তুমি যে এখানে আছো তা আমি সন্দেহ করিনি'।

মনির্ বাড়োত্ উয়ার্ সঙে দ্যাখা হইল্, উয়ায় কইল্ যে খালাও উয়ার খানা-দানা হয় নাই, রাতি আবে তার্ বাড়োত্ খানা-দানা করিবে - 'মণির বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা হ'ল, সে বলল যে এখনও তার খাওয়া দাওয়া হয়নি, রাত্রিতে যাবে তার পরে খাওয়া দাওয়া করবে'। ইত্যাদি।

(২৩) বাক্যে দূরস্থিত বক্তার উক্তি উত্তম পুরুষের স্বকীয় উক্তি (direct speech) রূপে বা প্রথম পুরুষের পরোক্ষ উক্তি(indirect speech) রূপে, যেভাবেই প্রতিবেদিত হোক না কেন উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এক্ষেত্রে প্রতিবেদকের উক্তি এবং অনুপস্থিত বক্তার উক্তিতে ব্যবহৃত ক্রিয়ায় কালগত সঙ্গতি থাকে না। উদাহরণ-

প্রত্যক্ষ - উঁয়ায় কইল্, 'মুই জাইম্ না' 'সে বলল, 'আমি যাব না'

পরোক্ষ - উঁয়ায় কইল্ জে উঁয়ায় জাবে না 'সে বলল যে সে যাবে না'

প্রত্যক্ষ - নরেন্ কইছেলো, 'মুই বারি জাইম্' 'নরেন বলেছিল, 'আমি বাড়ি যাব'

পরোক্ষ - নরেন কইছেলো জে উঁয়ায় বারি জাবে 'নরেন বলেছিল যে সে বাড়ি যাবে' ইত্যাদি।

(২৪) অনুপস্থিত বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিণত করার সময় প্রত্যক্ষবাচনের ভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে পরোক্ষবাচনে পরিণত হয় এবং বক্তার বক্তব্য প্রথম পুরুষের বচনে প্রতিবেদিত হয়। উদাহরণ-

প্রত্যক্ষ - উঁয়ায় কইছে, 'মোক্ দিয়া কাম্ হবে না' 'সে বলেছে, 'আমাকে দিয়ে কাজ হবে না'

পরোক্ষ - উঁয়ায় কইছে যে উঁয়াক্ দিয়া কাম্ হবে না' 'সে বলেছে যে তাকে দিয়ে কাজ হবে না' ইত্যাদি।

(২৫) বাক্যে একই উদ্দেশ্যের একাধিক বিধেয় এবং সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক ক্রিয়া থাকলে, অথবা মূল বাক্যের সঙ্গে সংযোজক বা প্রতিবেধক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত একাধিক উপবাক্যে একাধিক ক্রিয়া থাকলে বিধেয় সংশ্লিষ্ট এবং উপবাক্যস্থিত সেই সব ক্রিয়ার প্রত্যেকটি সমাপিকা হয় না। অর্থাৎ একই উদ্দেশ্যের একাধিক বিধেয়ের প্রত্যেকটিতে বা মূল বাক্যের সঙ্গে যুক্ত উপবাক্যসমূহের প্রত্যেকটিতে সমাপিকা ক্রিয়া প্রযুক্ত হয় না। কেবলমাত্র মূল বাক্যস্থিত ক্রিয়াটিই হয় সমাপিকা, এবং আশ্রিত বাক্যে বা তদন্তর্গত বিধেয় গুলিতে '-ই', -'ইয়া', -'এ', -'এয়া'-অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। অনেক সময় এই অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি তাদের নিজস্ব ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হয়ে উপবাক্যের সঙ্গে উপবাক্যের, উপবাক্যসমূহের সঙ্গে মূল বাক্যের যোজকের কাজ করে। সাধারণভাবে এই জাতীয় ক্রিয়ার প্রয়োগরীতি উল্লিখিত প্রকারের হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক্যের গঠনসৌকর্যের প্রয়োজনে মূল বাক্য ছাড়াও উপবাক্যগুলির যে কোনো একটিতে সমাপিকা ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। উদাহরণ-

উঁমার্ বারির্ আগদুয়োরোত্ খারা হয়া, ডাকে ডাকে কারো ওবাশ্ না পায়া, দুয়োর্ ঠেলি বারির্ ভিতোর্ গেলেকো দ্যাখোত্ যে অ্যাকেনা বাচ্চা ছাওয়া কান্দি-কাটি ঘুমাত্ পরি নিস্ গেইছে -

'তাদের বাড়ির সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে, ডেকে ডেকে কারো সাড়া না পেয়ে, দরজা ঠেলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখি যে একটি ছোট শিশু কেঁদে-কেটে ঘুমায় ঘুরে ঘুমিয়ে পড়েছে'।

যদি নাই দেখিতে ন্যাকোট্ হয়া ভাল্ না খয়া করলু তোমেক ভাবি দেখুবু -

'নদী না দেখতেই উনকা চেয়ে ভাল না খারাপ করলে একটু ভেবে দেখবে' । ইত্যাদি।

(২৬) বাক্যে যৌগিক ক্রিয়া থাকলে এবং সেই যৌগিক ক্রিয়া দুটি ক্রিয়ার সমন্বয়ে সৃষ্ট হলে সমন্বিত ক্রিয়ার দ্বিতীয়টিতে বচন এবং কালজ্ঞাপক প্রত্যয় যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে প্রথম ক্রিয়াটি সর্বদাই অসমাপিকা হয়। উদাহরণ-

আগিনার্ তুল্সি গছটা তুক্তি গেইছে   'উঠানের তুলসী গাছটি নির্মূল হয়েছে'

মুই তোক্ ন্যাখা-পড়া শাখে দ্যাও্   'আমি তোমাকে লেখা-পড়া শেখিয়ে দিই'

মালা খান্ হারে ফ্যালাছুঙ্   'মালাটি হারিয়ে ফেলেছি' ইত্যাদি।

(২৭) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় নঞর্থক অব্যয় 'না' এবং 'নাই' সাধারণতঃ ক্রিয়ার আগে বসে। এই বিষয়ে অসমীয়া, ভোজপুরী এবং হিন্দীর সঙ্গে এই উপভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। উদাহরণ-

মুই হাট্ না জাঙ্   'আমি হাটে যাই না'

তুই বারি না জাবু   'তুমি বাড়ি যাবে না'

মুই গাও নাই ধোঙ্   'আমি স্নান করিনি' ইত্যাদি।

তবে ক্রিয়ায় কর্তার অক্ষমতা বোঝাতে নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পরে বসে। উদাহরণ-

মুই অনেক্ দিন্ তোমার্ বারি জাঙ্ না   'আমি অনেক দিন তোমাদের বাড়ি যাই না'

উঁয়ুরা ভাইল্ খায় না   'তিনি ভাল খান না' ইত্যাদি।

(২৮) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় পরস্পরের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত কতকগুলি পদ( ) থাকে। বাক্যে সেই সব পদযুগলের একটির প্রয়োগ ঘটলে অন্যটির প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অন্যথায় বাক্য অসমাপ্ত থাকে। এই যুগ্মকগুলি হ'ল -

(ক) সর্বনামজাত - 'জায়-তায়', 'জতো-ততো', 'জিনরা-সিনরা', 'জার্-তার্', 'জাক্-তাক্' ইত্যাদি।

(খ) সর্বনামীয় ক্রিয়া বিশেষণজাত - 'জেইটে-সেইটে', 'জামোন্-তামোন্', 'জ্যালা-ত্যালা', 'জিত্তি-সিত্তি', 'জেইটে-সেইটে', 'জিদি-সিদি' ইত্যাদি।

(গ) অব্যয়জাত - 'যোলন্-কিন্তুক্', 'জদি-তবে/তাহইলে', 'বোলন্-বুলুক', 'জেহেতু-কাজে' ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগের উদাহরণ-

জায় জায় পড়া তায় না জায় কয়া   'যে পড়ায় যায় সে বলে যায় না'

জেইটে বাঘের্ ডর্, সেইটে সাজ্ হয়   'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়'

উঁয়ায় যোলন্ জাবে, কিন্তুক থাকিবে না   'সে যাবে, কিন্তু থাকবে না' ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই যুগ্মকগুলির একটির সঙ্গে অন্যটির প্রয়োগ ঐচ্ছিক হয়। বিশেষতঃ

বাক্য যেখানে অনুজ্ঞা ভাবের দ্যোতক সেখানে সাধারণতঃ যুগ্মকের অন্তর্গত একটি পদ অন্যটির সঙ্গে থাকে না। এক্ষেত্রে যুগ্মকের প্রথম পদটিকেই ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ-

জিত্তি খুশি তোর্জা — 'যেখানে খুশী তোমার যাও'

জদি জাবার্চাইশ্জা — 'যদি যেতে চাও যাও'

গরুটা আন্, জেটা পাথারোত্আছে — 'গরুটা আন, যেটা মাঠে আছে' ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত যুগ্মকসমূহের প্রত্যেকটির অন্তর্গত দ্বিতীয় পদটি বাক্যের অঙ্গসজ্জায় অনুক্ত থাকলেও বাক্যের ভাবে উপস্থিত।

(২৯) প্রথমে কর্তা, তারপরে কর্ম এবং সবশেষে ক্রিয়া, বাক্যে পদবিন্যাসের এই রীতি উত্তরবঙ্গের উপভাষায় মোটামুটিভাবে অনুসৃত হলেও বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপরে ঝোঁক দেওয়ার জন্য এবং বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্য একমাত্র কর্মপ্রবচনীয় বা অনুসর্গ ছাড়া বাক্যের অন্যান্য উপাদানের বিন্যাসে এই রীতির হের-ফের ঘটে থাকে। এর ফলে -

(ক) বাক্যের কর্তা বাক্যের শেষে চলে আসতে পারে। উদাহরণ-

তোমার্বারি যাজাঙ্মুই — 'তোমাদের বাড়ি যাইনা আমি'।

(খ) বাক্যের ক্রিয়া কর্তার আগে, বাক্যের গোড়ায় চলে যেতে পারে। উদাহরণ-

যাজাঙ্মুই তোমার্বারি — 'যাইনা আমি তোমাদের বাড়ি'।

(গ) ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার পরে চলে যেতে পারে। উদাহরণ-

কাহেনা ভাল্হবে ক্যারমে ক্যারমে — 'রোগী ভাল হবে ক্রমে ক্রমে'।

(৩০) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় স্বল্পদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বাক্যের প্রচলনই সর্বাধিক। তবে অনেক সময় বর্ণিতব্য বিষয় জটিল হলে, বা বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করতে হলে অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সংযোজকের সাহায্যে একাধিক বাক্যকে যুক্ত করে একটি বাক্যে পরিণত করা হয়। উদাহরণ -

মুই উমার্বারি জায়া জদি দ্যাখোঙ্জে মোক্বসির্কয় তাহইলে বসিম্, আর্জদি বসির্না কয় তা হইলে চলি আসিম্- 'আমি ওদের বাড়িতে গিয়ে যদি দেখি যে আমাকে বসতে বলছে তাহলে বসব, আর যদি বসতে না বলে তাহলে চলে আসব'।

উদ্ধৃত বাক্যটি নিম্নলিখিত বাক্যগুলির সমাহার।

(ক) মুই উমার্বারি জাইম্ — 'আমি ওদের বাড়িতে যাব'।

(খ) জায়া দেখিম্ — 'গিয়ে দেখব'।

(গ) জদি বসির্কয় তাহইলে বসিম্ — 'যদি বসতে বলে তাহলে বসব'।

(ঘ) জদি বসির্না কয় তাহইলে চলি আসিম্ — 'যদি বসতে না বলে তাহলে চলে আসব'।

(৩১) বাক্যে অবস্থান থেকেই যেহেতু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় পদের বাক্যরূপমূল্য পরিজ্ঞাত হয় তাই বাক্যে পদের বিন্যাসরীতিতে দূর অন্বয় বস্তুর সঙ্কট বর্জন করাই এই উপভাষার পদবিন্যাসরীতির মূল কথা। কর্তা, ক্রিয়া এবং কর্মের স্থান পরিবর্তনশীলতাকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বীকার করে নেওয়া হলেও এই উপভাষার বাচকগোষ্ঠীর স্বাভাবিক প্রবণতা হ'ল বাক্যে প্রথমে কর্তা, তারপরে কর্ম এবং সবশেষে ক্রিয়াকে স্থাপন করা।

(৩২) গঠনগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়।

(ক) সরল বাক্য

(খ) মিশ্র বা জটিল বাক্য

(গ) যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য

এই তিন শ্রেণীর বাক্যের গঠনগত বৈশিষ্ট্য নিম্নানুরূপ-

(ক) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সরল বাক্যে সাধারণতঃ একটি মাত্র উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র বিধেয় থাকে। যেমন- কিষাণে ধান্ কাটে -'কৃষাণ ধান কাটে'। তবে সরল বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়কে কিছু উপাদানের সাহায্যে প্রসারিত এবং সম্পূরিত করা যেতে পারে। সম্বন্ধপদ, বিশেষণ, সংখ্যা বা পরিমাণবাচক বিশেষণ এবং বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত ক্রিয়ারহিত বাক্যাংশ দিয়ে উদ্দেশ্যকে এবং ক্রিয়া বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত বাক্যাংশ দ্বারা বিধেয়কে প্রসারিত করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কিছু উপাদানের সাহায্যে কি উদ্দেশ্য এবং বিধেয়কে সম্পূরিত করে সরলবাক্যকে গঠনের দিক থেকে পূর্ণতর করার দৃষ্টান্তও এই উপভাষায় দেখা যায়। যেমন-

ঘরপোড়া গরু মেউরা পাকা ধোঁয়া দেখি হাকচাউ করি চমকি গেইল -'ঘর পোড়া গরু কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া দেখে হঠাৎ চমকে গেল'।

(খ) অপরাপর নব্যভারতীয় আর্যভাষার মতই উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও মিশ্র বাক্যে বাক্যের মূল অংশ ছাড়াও ক্রিয়ারহিত অথবা অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত এক বা একাধিক অপ্রধান বা আশ্রিত বাক্যাংশ থাকে। এই অপ্রধান বাক্যাংশগুলি কিছু সমুচ্চয়ী অব্যয় এবং অব্যয়রূপে ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়া 'বুলি', 'বুলিয়া', এবং 'যালা-স্যালা', 'যায়-তায়', 'যাক্-তাক্', 'যামোন্-ত্যামোন্' ইত্যাদি শব্দযুগ্মক এবং 'যদি', 'এই চক্' ইত্যাদি অব্যয়ের সাহায্যে মূল বাক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই অপ্রধান বাক্যাংশগুলি বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পূরকের কাজ করে। মূল বাক্যটি এক্ষেত্রে সাধারণতঃ সবশেষে বসে। উদাহরণ-

তুই যে মোর্ সরোসি সেটা কথা ক্যামোন্ করি বুঝিম্, 'তুমি যে আমার সঙ্গী একথা কেমন করে বুঝব'।

সগারে যাতে ভাল্ হয় তাক্ ভাবিয়া কাজ্ করো 'সকলের যাতে ভাল হয় তা ভেবে কাজ কর'। ইত্যাদি।

প্রকৃতি এবং কার্যকারিতার দিকে লক্ষ্য রেখে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় মিশ্র বাক্যে ব্যবহৃত অপ্রধান বাক্যাংশগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) বিশেষ্যধর্মী বাক্যাংশ

(২) বিশেষণধর্মী বাক্যাংশ

(৩) ক্রিয়া বিশেষণধর্মী বাক্যাংশ

এই উপভাষায় বিশেষ্যধর্মী বাক্যাংশ মূলতঃ কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়ার সম্পূরক হিসেবে কাজ করে।

উদাহরণ-

কর্তার সম্পূরক - যমট্টা কয়চে বোলে আজি বোধায় পাগাই আসিবে ।
'যমটা বলছে যে আজ বোধ হয় আঘ্রি আসবে'।

কর্মের সম্পূরক - তুই যিলা আম্ খাছাছিস্ তার্ সব্লায় কাচা ।
'তুমি যে আমগুলি খেয়েছো তার সবগুলিই কাঁচা'।

ক্রিয়ার সম্পূরক - গরুলা ধান্ খায়া যেটু তুলি দৌড়ি পালে গেইল্।
'গরুগুলি ধান খেয়ে লেজ তুলে দৌড়ে পালিয়ে গেল'।

বিশেষণধর্মী বাক্যাংশ উদ্দেশ্য এবং বিধেয়, দুয়েরই সম্পূরক হিসেবে কাজ করে।

উদাহরণ-

উদ্দেশ্যের সম্পূরক - যিলা মানুষি কালি পালে গেইচেলো আজি উঘুরা ফিরি আইচে।
'যে লোকগুলি কাল পালিয়ে গিয়েছিল আজ তারা ফিরে এসেছে'।

বিধেয়ের সম্পূরক - ডাকাতউগুলা যিলা আম্ পাকে বাই শিলাকে খাবার্ ধইচে।
'দাড়কাকগুলি যে আমগুলি পাকেনি সেগুলিকেই খাচ্ছে'।

ক্রিয়াবিশেষণধর্মী বাক্যাংশ বিধেয়ের ক্রিয়াকে বিশেষত্ব প্রদান করে এবং কখনও কখনও তা উদ্দেশ্যের প্রসারক উপবাক্যাশ্রিত ক্রিয়ার বিশেষণ হিসেবেও বাক্যে উপস্থাপিত হয়।

উদাহরণ-

বিধেয়-ক্রিয়ার সম্পূরক- বেলা যাই ডুবিতে বাড়ি ফিরিয়্ বুলি সঙ্গি-সাথি নাও্ যাই।
'বেলা না ডুবলেই বাড়ি ফিরব বলে সঙ্গী-সাথী নিইনি'।

উদ্দেশ্যের সম্পূরক - দৌড়ি পালে আইচে তায় তার্ আগোত্ লুকি থোন্।
'দৌড়ে পালিয়ে এসেছে যে তাকে আগে লুকিয়ে রাখ'।

(গ) একাধিক সরল বা মিশ্র বাক্যকে সংযোজক বা প্রতিষেধক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত করে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় যৌগিক বাক্যের গঠন সম্পন্ন হয়। নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারের যৌগিক বাক্যের

প্রচলন এই উপভাষায় লক্ষ্য করা যায়।

(১) সরল + সরল – মুই আসি দেখনুঙ্ যে তুই বসি আছিস্।
'আমি এসে দেখলাম যে তুমি বসে আছ'।

(২) মিশ্র + মিশ্র – উমুরা না দিলে পায় না, কিন্তুক উমুরা যে দিবে তার কোনো ঠিক নাই।
'তারা না দিলে পারে না, কিন্তু তারা যে দেবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই'।

(৩) সরল + মিশ্র – উমুরা দুই ভাইয়ে খুব ভাব, কিন্তুক অ্যাকজন্ যদি কোনেক্ অন্যায় করে তাহইলে অইন্যজনা ঝাপ্ তার বেপক্ষে দাঁড়ায়।
'তারা দুই ভাইয়ে খুব ভাব, কিন্তু একজন যদি একটু অন্যায় করে তাহলে অন্যজন তার বিপক্ষে দাঁড়ায়'।

(৪) মিশ্র + সরল – তুই আসিলা মুই আসিম্ বুলি উমায় সাহস্ করিছে।
'তুমি এলে আমি আসব বলে সে সাহস করেছে'।

(৩৩) বাক্যের অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যকে –

(ক) নির্দেশসূচক

(খ) প্রশ্নসূচক

(গ) ইচ্ছাসূচক

(ঘ) আজ্ঞাসূচক

(ঙ) কার্যকারণাত্মক

(চ) সন্দেহদ্যোতক এবং

(ছ) বিস্ময়াদিবোধক, মোটামুটিভাবে এই সাতটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। এদের গঠন বিশ্লেষণ –

(ক) নির্দেশসূচক বাক্য এবং এর দুটি উপশ্রেণী অস্ত্যর্থক এবং নাস্ত্যর্থক বাক্যের পদবিন্যাসরীতি সম্পর্কে পূর্ববর্তী সূত্রগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে।

(খ) প্রশ্নসূচক বাক্যে প্রশ্নসূচক অব্যয়টি বিধেয়ের আগে বা পরে যে কোনো জায়গায় বসতে পারে। আবার এই শ্রেণীর বাক্যে কখনও কখনও প্রশ্নসূচক অব্যয়ের সাহায্য ছাড়াই প্রশ্নবাচকতা আসে।

উদাহরণ–	তুই যাবু কি?	'তুমি যাবে কি'?
	তুই কি যাবু?	'তুমি কি যাবে'?
	তুই যাবু?	'তুমি যাবে'?
	যাবু তুই?	'যাবে তুমি'?

উল্লেখ্য যে প্রশ্নসূচক অব্যয়ের সাহায্য ছাড়া গঠিত প্রশ্নসূচক বাক্যের [illegible] প্রশ্নবাচকতা সম্পূর্ণরূপে

উচ্চারণনির্ভর। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাক্যের প্রশ্নবাচকতা বাক্যের সুরতরঙ্গের ওঠা নামার উপরে নির্ভর করে।

(গ) ইচ্ছাসূচক বাক্যে ক্রিয়ার ইচ্ছাসূচক, কখনও কখনও অনুজ্ঞাসূচক ভাব প্রযুক্ত হয়। উদাহরণ-

মুই যেমন নিন্ হাতে উঠি তোক্ দ্যাখোঙ্, 'আমি যেন ঘুম থেকে উঠে তোমাকে দেখি'।

ভগোবান্ তোর্ ভাল্ করুক, 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন'। ইত্যাদি।

(ঘ) আজ্ঞাসূচক বাক্যে ক্রিয়ার অনুজ্ঞাসূচক রূপ প্রযুক্ত হয়। উদাহরণ-

তুই হামার্ বারি আ 'তুমি আমাদের বাড়িতে যাও'।

তোমরা ঘাটোক্ জাও 'তোমরা ঘাট পর্যন্ত যাও'। ইত্যাদি।

(ঙ) গঠনের দিক থেকে মিশ্র বাক্যের সঙ্গে কার্যকারণাত্মক বাক্যের কোনো প্রভেদ নেই। এই শ্রেণীর বাক্যের প্রথমে থাকে একটি অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত উপবাক্য এবং শেষে থাকে মূল বাক্যটি। মূল বাক্যের ক্রিয়া এক্ষেত্রে উপবাক্যের ক্রিয়ার সংঘটনের উপর নির্ভরশীল, এবং উপবাক্য ও মূল বাক্য অবস্থাত্মক অব্যয় 'জদি' এবং ব্যবস্থাপক অব্যয় 'তাহইলে' দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। উদাহরণ-

ধান্ থাকিলে এন্দুরেরও সাতটা মাইয়া হয় 'ধান থাকলে ইঁদুরেরও সাতটি স্ত্রী হয়'।

মুই জদি জাও্ তাহইলে তুইও জাবু 'আমি যদি যাই তাহলে তুমিও যাবে' ইত্যাদি।

(চ) নির্দেশসূচক বাক্যে 'বোধায়', 'বুঝি', 'হয়তো' ইত্যাদি অব্যয়স্থানীয় ক্রিয়া বিশেষণ যোগ করে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সন্দেহদ্যোতক বাক্য গঠিত হয়। উদাহরণ-

মুই বোধায় ভুল করুনু, 'আমি বোধ হয় ভুলই করলাম'।

উমুরা বুঝি আর্ আসিবে না 'তারা বুঝি আর আসবে না'। ইত্যাদি।

(ছ) বিভিন্ন শ্রেণীর মনোভাবদ্যোতক অব্যয়ের সাহায্যে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বিস্ময় ইত্যাদি বোধক বাক্যের গঠন সম্পন্ন হয়। উদাহরণ-

উঃ কি গরোম্, 'উঃ কি গরম'

ছিঃ কি কুৎচোল্, 'ছিঃ কি কুৎসিত'

বাঃ ভালে হইছে 'বাঃ ভাল হয়েছে' ইত্যাদি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শব্দভান্ডার

উত্তরবঙ্গের উপভাষার উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনার উপসংহারে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত
হয়েছি যে আলোচ্য উপভাষাটি আসলে বাংলা ভাষারই একটি উপভাষা। সুতরাং অতঃপর এমন একটি
সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্ভবতঃ কোনো বাধা নেই যে অন্যান্য বিষয়ের মত শব্দভান্ডারের ক্ষেত্রেও বাংলার
সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে, যে সাদৃশ্য একটি মূল ভাষা এবং তার উপভাষাসমূহের মধ্যে থাকা
অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই কারণে উত্তরবঙ্গের উপভাষার শব্দভান্ডার সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বাংলা
শব্দভান্ডার সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিকদের বিভিন্ন মতামতের উল্লেখ এবং পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে যে কোনো নব্যভারতীয় আর্যভাষার শব্দভান্ডারকে
(১) তৎসম, (২) তদ্ভব, (৩) দেশী এবং (৪) বিদেশী, মোটামুটিভাবে এই চারটি ভাগে বিভক্ত
করা যায়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি বাংলা শব্দভান্ডারকে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন।
এই বিভাগ চারটি হ'ল -(১) তৎসম, (২)তদ্ভব, (৩) দেশী এবং (৪) বিদেশী।[1] ডঃ সুকুমার
সেন এই বিভাজনের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর মতে বাংলা
শব্দভান্ডার (১) মৌলিক এবং (২) আগন্তুক, এই দুটি প্রধান ভাগে বিভাজিত হতে পারে। এর মধ্যে
মৌলিক শব্দসমূহকে তিনি (ক) তদ্ভব, (খ) তৎসম, (গ) অর্ধ-তৎসম এবং আগন্তুক শব্দগুলিকে
(ক) দেশী ও(২) বিদেশী, এই কটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন।[2] ডঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ বসুর মতে বাংলা
শব্দের শ্রেণীবিভাজন নিম্নরূপ। তিনি বাংলা শব্দভান্ডারকে (১) উত্তরাধিকৃত বা প্রাকৃতজ এবং (২)
গৃহীত বা আগন্তুক, এই দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই দুটি বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগ-
উত্তরাধিকৃত বা প্রাকৃতজ শব্দসমূহ তাঁর মতে (ক) মৌলিক তদ্ভব এবং (খ) আগন্তুক তদ্ভব, এই দুটি
শ্রেণীতে বিন্যস্ত হতে পারে। শেষোক্ত প্রকারের তদ্ভব শব্দগুলিকে তিনি (১) দেশী (অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়
ইত্যাদি মূল ভাষা থেকে গৃহীত) তদ্ভব এবং (২) বিদেশী (গ্রীক, পারসিক ইত্যাদি মূল ভাষা থেকে
গৃহীত) তদ্ভব, এই দুটি উপশ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় প্রধান বিভাগ-গৃহীত বা
আগন্তুক বাংলা শব্দাবলীকে তিনি (ক) শুদ্ধ সংস্কৃত বা তৎসম, (খ) বিকৃত সংস্কৃত বা অর্ধ-তৎসম,

---

(১) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ, ১৯৭৫,
ভল্যুম -১, পৃঃ ১৮৯

(২) সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৪, পৃঃ ১১৩-১১৭

(গ) দেশী এবং (ঘ) বিদেশী, এই চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। এর মধ্যে দেশী শব্দসমূহ তাঁর মতে (১) প্রাদেশিক আর্য, (২) ভারতীয় আর্যেতর এবং বিদেশী শব্দসমূহ (১) এশীয় (আরবী, ফারসী, তুর্কী ইত্যাদি মূল ভাষা) ও (২) ইওরোপীয় (ইংরেজী, পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ইত্যাদি মূল ভাষা), ইত্যাদি উৎস থেকে আহৃত।[৩]

উপরে উল্লিখিত শ্রেণীবিভাজনের কথা মনে রেখে এবং ভারতীয় বৈয়াকরণদের দ্বারা ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলিকে প্রয়োগ করে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত শব্দাবলীকে -

(১) তৎসম

(২) অর্ধ-তৎসম

(৩) তদ্ভব

(৪) দেশী এবং

(৫) বিদেশী, এই পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

তৎসম

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় প্রচলিত তৎসম শব্দাবলীকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। এই শ্রেণী দুটি হ'ল-(১) প্রাচীনভারতীয় আর্য স্তর থেকে বিবর্তিত শব্দাবলী এবং (২) বাংলা ভাষা সৃষ্টির পরে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে গৃহীত শব্দাবলী।[৪] এর মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর শব্দ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে, বহু শতাব্দীর গ্রহণ-বর্জন পরম্পরার ভিতর দিয়ে আসার সময়ে তাদের মূল রূপ থেকে বিচ্যুত হলেও কিছু শব্দের মূল রূপ নব্যভারতীয় আর্য স্তর পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। নব্যভারতীয় আর্য স্তরের ভাষা বাংলায় প্রচলিত এই জাতীয় শব্দের সঙ্গে সংস্কৃতের সাদৃশ্যের কথা বিবেচনা করে এই শব্দগুলিকে বাংলা শব্দভাণ্ডারের তৎসম শব্দ বলে অভিহিত করা চলে। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সংখ্যায় স্বল্প হলেও এই শ্রেণীর তৎসম শব্দের প্রচলন রয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত প্রকারের তৎসম শব্দ এই উপভাষায় প্রায় নেই বললেই চলে। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, মূলতঃ সাহিত্য চর্চার সূত্রেই বাংলায় এই শ্রেণীর তৎসম শব্দ বিপুল পরিমাণে গৃহীত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বাংলায় তৎসম শব্দের আগমন, বলা যেতে পারে যে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অব্যাহত। পক্ষান্তরে উত্তরবঙ্গের উপভাষা একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের একটি কথ্য

---

(৩) বসু দ্বিজেন্দ্র নাথ, বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা, ১৯৭০, প্রথমাংশ, পৃঃ ১৮৩-১৮৫

(৪) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ, ১৯৭৫ ভল্যুম -১, পৃঃ ১৮৯

ভাষা যায়। সুতরাং এই উপভাষায় সাহিত্য চর্চা যে তেমন হয়নি একথা বলা যায়। ফলতঃ উল্লিখিত পদ্ধতিতে এই উপভাষার শব্দভান্ডারে সংস্কৃত শব্দ যে গৃহীত হয়নি এমন অনুমান সম্ভবতঃ অসঙ্গত নয়। এছাড়া প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিবর্তিত শব্দ, নব্যভারতীয় আর্য স্তর পর্যন্ত যাদের মূল রূপ অটুট, তার সংখ্যা বা অনুপাতও এই উপভাষায় বাংলা অপেক্ষা কম। উল্লিখিত দ্বিবিধ কারণে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তৎসম শব্দের অনুপাত সামগ্রিক ভাবে বাংলা অপেক্ষা কম। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' অবলম্বনে বাংলা ভাষায় প্রচলিত তৎসম শব্দের অনুপাত সম্পর্কে একটি হিসেব প্রস্তুত করেছেন। এই হিসেব অনুসারে বাংলায় তৎসম শব্দের অনুপাত শতকরা ৪৪ ভাগ।[৪] উত্তরবঙ্গের উপভাষার এই জাতীয় কোনো পূর্ণাঙ্গ আকরগ্রন্থ নেই। ফলে এই উপভাষায় তৎসম শব্দের অনুপাত কত এ সম্পর্কে কোনো নির্ভুল হিসেব প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে বাংলা অপেক্ষা তৎসম শব্দের অনুপাত যে কম হবে এ সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। নিম্নে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত তৎসম শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হ'ল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলায় প্রচলিত অনেক তৎসম শব্দের উচ্চারণ সম্পূর্ণ সংস্কৃতের মত নয়। যেমন- জল, রূপ, স্বামী, স্বাদ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে উচ্চারণগত আংশিক বিচ্যুতি সত্ত্বেও যে যুক্তিতে এই শব্দগুলিকে তৎসম শব্দ বলে চিহ্নিত করা হয় সেই একই যুক্তির উপরে নির্ভর করে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত, ঈষৎ বিকৃত উচ্চারণযুক্ত কিছু শব্দকে তৎসম শব্দের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। ফলতঃ তৎসম শব্দের প্রচলিত বানানরীতিরও আংশিক বিপর্যয় এই তালিকায় প্রদত্ত শব্দগুলির বানানে স্থান পেয়েছে। এই উপভাষার বাচকগোষ্ঠীর বিশুদ্ধ উচ্চারণকে লিপিবদ্ধ করার স্বার্থে এই বিপর্যয়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

অঙ্কো -অঙ্ক
অংশো -অংশ
অধিকার্ -অধিকার
অধিকারি -অধিকারী
অধির্ -অধীর
অন্তোর্ -অন্তর
অন্ন্যায় - অন্যায়
অনাচার্ - অনাচার
অনাচারি - অনাচারী
অনিশট্টো - অনিষ্ট
অনুচিত্ -অনুচিত
অপার্ -অপার
অপারোগ্ -অপারগ
অপোকার্ -অপকার
অপোকারি -অপকারী
অতোল্ -অতল
অবোতার্ - অবতার
অবোধ্ -অবোধ

---

(৪) তদেব, পৃঃ ২১৮

পতোন্ - পতন
পতিত্ - পতিত
পত্‌রিকা - পত্রিকা
পদ্‌দো - পদ্ম
পবোন্ - পবন
পরিশ্‌কার্ - পরিষ্কার
পশ্‌চিম্ - পশ্চিম
পাক্ - পাক
পাতাল্ - পাতাল
পাশোন্‌ডো - পাষণ্ড
পাপ্ - পাপ
পাখি - পাখী
পিড়া - পীড়া
পুরান্ - পুরাণ
বৈরি - বৈরী
বক্ - বক
বট্ - বট
বন্ - বন
বদোন্ - বদন
বরোন্ - বরণ
বল্ - বল
বলিয়ান্ - বলীয়ান
বশ্ - বশ
বৈরাগি - বৈরাগী
বহু - বহু
বাঘ্ - বাঘ
বাহোন্ - বাহন

বিকল্ - বিকল
ব্যাবোহার্ - ব্যবহার
ভয় - ভয়
ভয়াল্ - ভয়াল
ভর্‌সা - ভরসা
ভান্‌ডো - ভাণ্ড
ভান্‌ডার্ - ভাণ্ডার
ভান্‌ডারি - ভাণ্ডারী
ভাব্ - ভাব
ভার্ - ভার
ভিক্‌খা - ভিক্ষা
ভিন্‌নো - ভিন্ন
মঙ্‌গোল্ - মঙ্গল
মতি - মতি
মন্‌ডোল্ - মণ্ডল
মন্ - মন
মন্‌ডোলি - মণ্ডলী
মন্‌দির্ - মন্দির
মন্‌দো - মন্দ
মান্ - মান
মাঝি - মাঝী
মায়া - মায়া
মার্‌গো - মার্গ
মিনোতি - মিনতি
মিলোন্ - মিলন
মুক্‌তি - মুক্তি
মুনি - মুনী

অর্ধ-তৎসম

সংস্কৃত থেকে বাংলায় গৃহীত হওয়ার পরে বাংলা বাচকগোষ্ঠীর উচ্চারণে যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দের মূল রূপ বিকৃত হয়েছে ডঃ সুকুমার সেন সেই সমস্ত শব্দকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে চিহ্নিত করেছেন।[৬] উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তৎসম শব্দের আলোচনায় ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে সংস্কৃত শব্দভান্ডার থেকে সরাসরিভাবে প্রায় কোনো শব্দই এই উপভাষায় গৃহীত হয়নি। সুতরাং এই শ্রেণীর অর্ধ-তৎসম শব্দ এই উপভাষায় নেই। প্রাচীনভারতীয় আর্য স্তর থেকে বিবর্তিত যেসব শব্দের মূল রূপ কিছু পরিমাণে বিকৃত হয়েছে, আলোচ্য উপভাষাটিতে সেই শ্রেণীর শব্দ কিছু পরিমাণে আছে। এই শ্রেণীর শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল। এক্ষেত্রে প্রদত্ত শব্দসমূহের বানান প্রচলিত রীতি অনুসারী নয়। প্রচলিত রীতির এই ব্যতিক্রম বিশুদ্ধ ভাবে এই উপভাষার বাচকগোষ্ঠীর উচ্চারণকে উপস্থাপিত করার স্বার্থেই ঘটানো হয়েছে।

অকহুতো - অক্ষত
অগ্গ্যান্ - অজ্ঞান
অবোশ্যাশ্ - অবশেষ
অলপাই - অলাবু
আক্কোরোশ্ - আক্রোশ
আঙ্গ্রা - অঙ্গার
আত্তা - আত্মা
উনা - ঊন
উপ্ - ধূপ
ওগ্ - রোগ
ওদোর্ - উদর
কইনা - কন্যা
কঠুর্ - কঠোর
কান্দোন্ - ক্রন্দন
কাপাশ্ - কার্পাস
কিশশান্ - কৃষাণ
কিশ্শি - কৃষি
কুটুম্ - কুটুম্ব
ক্যাশ্ - কেশ
ক্লোশ্ - ক্লেশ
খ্যাম্ - ক্ষেম
গারাম্ - গ্রাম
গাহাক্ - গ্রাহক
গারোস্থো - গৃহস্থ
গিদ্দোর্ - গৃধ্র
গ্যান্ - জ্ঞান
গোত্ - গোত্র
গোন্দো - গন্ধ
গৈরোব্ - গৌরব
ঘিন্ - ঘৃণা
ঘিত্তো - ঘৃত
ঘরনি - ঘরণী

---

(৬) সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭০, পৃঃ ১৬০-১৬৬

তদ্ভব

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীনভারতীয় আর্য ভাষায় প্রচলিত শব্দাবলীর বহু শতাব্দীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মধ্যভারতীয় আর্য স্তর অতিক্রম করে নব্যভারতীয় আর্যভাষাসমূহের তদ্ভব শব্দ সম্পদে পরিণত হয়েছে, এবং এই তদ্ভব শব্দগুলিই যে কোনো নব্যভারতীয় আর্যভাষার মূল শব্দ সম্পদ।[৭] সুতরাং নব্যভারতীয় আর্য স্তরের ভাষা বাংলার একটি উপভাষা হিসেবে উত্তর-বঙ্গের উপভাষায় তদ্ভব শব্দের যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। এই উপভাষার শব্দভাণ্ডারের একটি বড় অংশ হ'ল তদ্ভব শব্দ। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম এবং দেশী শব্দের আনুপাতিক হিসেব নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে যৌথ ভাবে এই তিন শ্রেণীর শব্দের অনুপাত বাংলায় শতকরা ৫১.৪৪।[৮] এক্ষেত্রে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের উপভাষায় আকরগ্রন্থের অভাব হেতু এই প্রকারের হিসেব নির্দেশ করা সম্ভব নয়। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই উপভাষায় তৎসম শব্দের অনুপাত বাংলা অপেক্ষা কম। সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে তদ্ভব শব্দের অনুপাত এক্ষেত্রে বাংলা অপেক্ষা কিছুটা বেশী হবে। নিম্নে এই উপভাষায় বহুল প্রচলিত তদ্ভব শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হ'ল। এই তালিকায় প্রদত্ত শব্দগুলির পার্শ্বে সমার্থক বাংলা শব্দ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থবোধক বাক্যাংশ শব্দগুলির অর্থ হিসেবে প্রদত্ত হ'ল।

[অ]

অ - নঞর্থক উপসর্গ

অকাজুয়া - অকেজো

অকুমারি - কুমারী

অকাম্ - অপকর্ম, অপ্রয়োজনীয় কাজ

অকেচর - কুৎসিত স্বভাব বিশিষ্ট

অখুটা - নিকৃষ্ট ধানের কাঠি

অগুন্ - আগুন

অঘোন্ - অগ্রহায়ণ মাস

অচরিত্ - আশ্চর্য, অদ্ভুত

অজন্মা - জারজ

অজপা - নির্বোধ

অজাত্ - নিকৃষ্ট ধানের বীজ

অজোয়া - অসময়ের উৎপন্ন দ্রব্য

অতৃপিত্ - যার তিপ হয়না

অতো - সংখ্যা বা পরিমাণবাচক শব্দ

অত্তি - ওখানে, ঐদিকে

অগাও - এঁটো

অনাচোন্ - অযাচিত

---

(৭) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যাণ্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ, ১৯৭০, অধ্যায় - ১, পৃঃ ১৮৯, ১৯৭-১৯৮

(৮) তদেব, পৃঃ ২১৮

এই - এই (নির্দেশক সর্বনাম)

এইট্টে - এখানে

এত্তি - এই দিকে

এক্কিনা - এইটুকু

একুয়া - একাকী

এইনোও্ - এইরকম

এনুয়া - উলু খড়

এশুন্ - রসুন

[অ্যা]

অ্যাক্না - একটি

অ্যাক্ডালিয়া - একদেশদর্শী

অ্যাকরাখিয়া - একগুঁয়ে

অ্যাক্রাতারি - সতক্রিয়া

অ্যাকেলা - একলা

অ্যাকেলা খাটা - স্বার্থপর (পুং)

অ্যাকেলা খেটি - ঐ (স্ত্রী)

অ্যাকেলা খই - ঐ

অ্যাকক্কেকালে - একেবারে

অ্যানত্তা - এতক্ষণ

অ্যালা - এখন

অ্যাখোন্ - এখন

[ও]

ওই - ওই (নির্দেশক সর্বনাম)

ওইখোন্ - ঐরূপ

ওয়া - খড়ের চালা

ওক্রা - চোরকাঁটা

ওঝা - গুণীন

ওডা - দোষ

ওত্ - আড়াল

ওত্তি - ওখানে, ওদিকে

ওদো - কাঁচা

ওদোর্ - পেট

ওদোর্-ভোলা - অগোছালো বেশ ভূষা যার (পুং)

ওদোর্-ভুলি - ঐ (স্ত্রী)

ওনাম্ - মুড়ের বাঁট

ওহ্ - মেঘ

ওরোল্ - বাড়বোলা

ওসার্ - পরিসর

ওউশ্যা - উদ্বৃত্ত

[ক]

কই - কোথায়

কই - বলি

কচি - কচি

কটা - কটা রঙ

কটকুটা - শক্ত

কতো - কত

কতোরোন্ - কাতরোক্তি

কন্ - চিড়ের মতো মিশ্রিত ধানের কণা

কপাল্ - কপাল, ভাগ্য

কড়ি - কড়ি

কড়াই - কড়াই

কড়েয়া - ঐ

করোন্ - কাজ, পরিশ্রম

করুয়া - কটু স্বাদ বিশিষ্ট

কপালঠোকা - নিষ্ঠুর

কলপা - বাতি বা প্রদীপের খাপা

কল্‌সি - কলসী

কলা - কলা

কলো - ঐ

কলা-কদুলি - কলা ইত্যাদি

করোট্‌ - করাত

কশোন্‌ - প্রহার

কশাল্‌ - হরিতকী

কশট্টা - কটু স্বাদ বিশিষ্ট

কহোলা - কোলাহল

কায় - কে

কাইমড়া - ধড়ের অংশবিশেষ

কাইমট্টা - নিকট

কাউয়া - কাক

কাউয়া ঠোকা - নির্লজ্জ (পুং)

কাউয়া ঠুকি-ঐ (স্ত্রী)

কাকুয়া - কাকড়া

কাকাল্‌ - কোমড়

কাগ্‌ - কাক

কাগা-ঐ

কাচো - কেউ

কাচা - কাঁচা

কাচি - কাস্তে

কাছ্‌ - নিকট

কাজ্‌ - কাজ

কাছুয়া - কেজো

কাটাই - কাটারি

কাটি - কাঠি

কাট্‌ - কাঠ

কাতি - কার্তিক মাস

কাতিশালি - এক প্রকার ধান, যা কার্তিক মাসে পাকে

কাতিগছা - দীপান্বিতা উৎসব

কান - কান

কানকাটা - লজ্জাহীন

কানকাটি - লজ্জাহীনা

কানকাইলা - কানের পাশের জায়গা

কানদুরা - কাঁদা যার স্বভাব (পুং)

কানদুরি - ঐ (স্ত্রী)

কানচা - কাঁচা

কাদো - কাদা

কাপোড়্‌ - কাপড়

কাপেরা - ঐ

কাপোন্‌ - কাঁপুনি

কাম্‌ - কাজ

কামরা - কাজের লোক, কর্মপটু (পুং)

কামালি- ঐ (স্ত্রী)

কামার্‌ - কামার

কারাণি - চালের কুঁড়ো

কালা - কাল

কালি - কালি

কালা-কালি - বলোবালিশা

কাশ্‌ - কাঁশি

কাশা - কাঁসা

কাশিয়া - কাশ

কাশুরা - কাশ রোগগ্রস্ত (পুং)

কাশুরি - ঐ (স্ত্রী)

কাহার্‌ - পালকিবাহক

কি – প্রশ্নসূচক অব্যয়

কিছু – কিছু

কিনা – কেনা, ক্রীত

কিবা – কী যেন

কিরা – দিব্য, প্রতিজ্ঞা

কুকরা – মুরগী

কুচিয়া – সাপের আকৃতি বিশিষ্ট এক প্রকার মাছ

কুচরিত্ – দুশ্চরিত্র, অদ্ভুত

কুজ্ – কুঁজ

কুজা – কুব্জ

কুজি – কুব্জা

কুটা – কুটো

কুঠাট্ – কুৎসিত

কুত্তি – কোথায়

কুনো – কোনো

কুদি – কোন দিকে

কুপি – প্রদীপ

কুমার্ – কুমোর

কুড়ি – কুড়ি, বিশ

কুরা – প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট বড় জলাশয়

কুরিয়া – কুঁড়ে

কুরাল্ – কুড়াল

কুলা – কুলো

কুলচন্দ্রান্ – কুলক্ষণ

কুশান্ – এক ধরণের পালাবদ্ধ গান

কুসুম্ – এক ধরণের শাক

কুসুমা – কুসুম (ডিমের)

কেনতুয়া – কেন্নো

কেশুর্ – এক ধরণের সুস্বাদু কন্দ

ক্যা – কেন

ক্যানে – ঐ

ক্যানোম্ – কেমন

ক্যাশালি – কেশবতী

কোচা – কোল্, খুঁটি

কোটা – আঁকশি

কোদাল্ – কোদাল

কোদালি – যে কোদাল চালায়

কোনা – কোণ

কোটে – কোথায়

কোবা – বিরামহীন, শিশু

কোলা – কোল

কোলা-কুলি – কোলা-কুলি

[খ]

খই – খই

খইল্ – খোল

খকোরা – খাপী

খটুয়া – কৌটা

খন্তি – খুন্তি

খরোম্ – খড়ম

খড়ি – জ্বালানী কাঠ

খলাই – মাছ রাখার বাঁশের তৈরী ঝুড়ি

খাই – ক্ষুধা, অভিলাষ

খাইয়া – খাদক

খাইল্ – গর্ত

গোহা - গুহা

গোহাড়ি - এলোমেলো

গোটা - গোটা

গোটাল্ - সম্পূর্ণ, অখন্ড

গোন্ধালি - গন্ধযুক্ত

গোপ্ - গোঁফ

গোপালু - গোঁফ বিশিষ্ট

গোবোর্ - গোবর

গোম্ - গম

গোল্ - গোলাকার

গোল্ - গন্ডগোল

গোলা - ঢেলা, গুলা

গোলাতি - গোলাকার

গোর্ - গোড়া

গোরা - ফর্সা

গোরাতি - গোড়ার অংশ, গোড়া

গোরালি - গোড়ার অংশ, পুরনো

গোসাই - ভেকধারী বৈষ্ণব

গোহারা - শোচনীয় পরাজয়

গোহারি - আবেদন

[ঘ]

ঘই - রেখা

ঘইন্ - রেখা

ঘইলা - ঘুঁটে

ঘকুটি - ঘটক

ঘটি - ঘট, জলপাত্র

ঘনট্টা - ঘন্টা

ঘনুটি - ছোট ঘন্টা

ঘর্ - ঘর

ঘরা - কলসী

ঘরা - কলসী

ঘরি - সময়ের একক

ঘরুয়া - ঘরকুনো, ঘরোয়া

ঘসি - ঘুঁটে

ঘাও - ঘা

ঘাউয়া - ঘা

ঘাইস্ - ঘাস

ঘাগু - বুদ্ধিমান, চতুর

ঘাটা - পথ

ঘাটি - ঘাঁটি, পথ, কেন্দ্র

ঘাট্ - ঘাট

ঘাটিয়ার্ - ঘাটী

ঘাম্ - ঘাম

ঘামাচি - ঘামাচি

ঘানা-ঘাটা - ঘনঘটা, আয়োজন

ঘার্ - ঘাড়

ঘিআ - ঘী রঙের

ঘিউ - ঘী

ঘিনলাগা - ঘৃণিত

ঘাঙারি - কাতরোক্তি, গোঙানি

ঘ্যাগ্ - গলগন্ড রোগ

ঘ্যাগা - গলগন্ড রোগী (পুং)

ঘেগি - ঐ (স্ত্রী)

ঘেরোন্ - বেষ্টনী

ঘোমোর্ - ঘোমটা

ঘোরা - ঘোড়া

ঘোরা দৈর্ - সাময়িক ভ্রমণ

ঘোরা খালাশ্ - পুরনোর জন্য ঘোড়া

ঘোঙা - বোবা

জোনাক্ – জোৎস্না

জোনাকি – জোনাকি

জোড়্ – জোড়া

জোরা – জোড়া

জোয়া – জোরা

[ঝ]

ঝরা – সোনার তৈরী ফুল

ঝড়ি – ঝড়-বৃষ্টি

ঝড়িয়া – ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কিত

ঝাঝরি – এক প্রকার জলপাত্র

ঝাড়ু – ঝাঁটা

ঝাপ্ – লাফ

ঝাপা – ধাতুমিশ্রিত বৃষ্টি

ঝাল্ – ঝাল

ঝাড়্ – ছোট্টো জঙ্গল

ঝি – কন্যা

ঝিয়া-পুতা – পুত্র-কন্যা

ঝুকি – পুচ্ছ, কলার ছড়ি

ঝুটি – ঝুঁটি

ঝুটুলি মাহো – ঝুঁটি ওয়ালা শালিক পাখি

ঝুরঝুরা – শুকনো

ঝুমা – ঐ

ঝুপ্লি – অপরিসর

ঝুপ্ড়ি – ঝাঁকড়া

ঝুর্ – ঝুর

ঝুরি – ঝুড়ি

ঝ্যালড়া – ন্যাকড়া

ঝোন্ – জন

ঝোপ্ – ঝোপ

ঝোপা – গুচ্ছ

ঝোলা – ঝোলা

ঝোল্ – ঝোল্

[ট]

টক্ – টক

টঙ্ – উঁচু স্থান

টলা – পাড়া

টাক্ – টাঁক

টাকা – টাকা

টাকুরি – রশি পাকানোর যন্ত্র (?)

টাঙি – কুড়ুল

টাট্ – উচ্চ স্থান

টাড়ি – পাড়া, বাসযোগ্য স্থান

টান্ – টান

টিয়া – টিয়া পাখি (?)

টিকলি – অলঙ্কার বিশেষ

টিহ্ – শরীরের অংশবিশেষ

টুটি – গলা

টুঙি – ঘরের শীর্ষস্থান

ট্যাঁটিয়া – বাঁকা, বাঁকা স্বভাবের

ট্যাবট্যোবা – কৃপণ, বাঁকা স্বভাবের

ট্যারা – বাঁকা, বক্র দৃষ্টিসম্পন্ন (পুং)

টেঁরি – ঐ (স্ত্রী)

টেঁড়িয়া – বাঁকা

টোঙ্ – উঁচু স্থান

[ঠ]

ঠক্ – ঠগ, প্রতারক

ঠকামি - প্রতারণা

ঠাই - স্থান

ঠাকুর্ - ঠাকুর

ঠাকুর্ খাবা - পূজা

ঠাকুর বশা - দেবস্থাপন

ঠাটারি - বাসনপত্র বিক্রেতা

ঠান্ডা - ঠাণ্ডা(?)

ঠারা - উত্তেজিত (?)

ঠুটা - ঠুঁটো

ঠুলি - ঠুলি

ঠাক্ - বিপদ

ঠাকা - ঐ

ঠাক্রা - অবলম্বন

ঠাটা - প্রতারক (পুং)

ঠেটি - ঐ (স্ত্রী)

ঠালা - ঠেলা

ঠাল্ - অবলম্বন

ঠোট্ - ঠোঁট

ঠোট্ভাঙেরা - বাক্পটু (পুং)

ঠোট্ভাঙিরি - ঐ (স্ত্রী)

[ড]

ডক্ - পাপ

ডক্যারা - বণিকদের সর্পদষ্ট হয়ে মারা যাওয়ার কাহিনী নিয়ে রচিত মনসামঙ্গলের পালা

ডক্জিয়ানি - সর্পদষ্ট হয়ে মৃত বণিকদের পুনর্জীবন লাভের ঘটনা নিয়ে রচিত মনসামঙ্গলের পালা

ডম্ - ডোম

ডর্ - ডর

ডাইন্ - ডান

ডাইনা - ডান দিকে অবস্থিত

ডাইনি - ডাইনি

ডাহুনা - ডাইনির মত স্বভাব বিশিষ্ট (পুং)

ডাক্ - ডাক

ডাগোর্ - বড়, ডাগর

ডাঙ্ - আঘাত, দণ্ড

ডাটি - হাতল

ডাবট্টা - ডাণ্ডা, দণ্ড

ডাব্ - ডাব

ডাবোর্ - মাটির কলসী

ডালি - ডালা

ডালিম্ - ডালিম

ডাড়ি - হাতল

ডাম্ - ডাঁশ

ডাহোন্ - দহন

ডাউকি - ডাহুকী

ডিঘি - দীঘি

ডিমা - ডিম

ডিব্বা - ডিবি

ডিঙা - ডোঙা (?)

ডুব্ - ডুব

ডুবাহু - ডুবুরি

ডুমোর্ - ডুমুর

ডুরি - ডোর

ডুলি - বড় আকারের বাঁশের ঝুড়ি (?)

ডাবড়া - হাতল

ডার্ - দেড়

ডালা - অস্থায়ী বাসস্থান (?)

ডেলি - ডালা

ডোম্ - ডোম

ডোর্ - ডোর

ডোমরা - ডোম জাতীয় পুরুষ

ডুমনি - ডোম জাতীয়া স্ত্রীলোক

ডোল্ - দোল

ডৌল্ - আকৃতি

[ঢ]

ঢল্ - প্রবাহ, বানা

ঢাক্ - ঢাক

ঢাকি - যে ঢাক বাজায়

ঢাকুনি - ঢাকনি

ঢাকুয়ার্ - ঢাকী

ঢাল্ - ঢাল

ঢিপ্ - স্তূপ

ঢুলানি - দোলনা

ঢুলি - যে ঢোল বাজায়

ঢেউ - ঢেউ

ঢ্যাল্ - ঢিল (?)

ঢোক্ - ঢোঁক

ঢোঙা - কলাগাছের খোল

ঢোঙকাটা - পুরোহিত বৃত্তিতে নিযুক্ত লোক

ঢোঙোল্ - কলাগাছের খোল

ঢোড়া - ঢোঁড়া সাপ

ঢোল্ - ঢোল

[ত]

তত্ - সত্য

তত্কারায় - সত্য সত্যই

তবু - তবু

তবি - তবু

তল্ - তল, নীচ

তলমুড়া - যে সর্বদাই মাথা নীচু করে থাকে

তল্-উপোর্ - উপর-নীচ, অগ্র-পশ্চাৎ

তলানি - তলানি

তাই - তালি

তাও - তাপ, রাগ

তাও - তবু

তায় - সে (সর্বনাম)

তাক্ - লক্ষ্য

তাও্ - তবু

তাম্ - তামা

তামরা - তামা

তামালি - তামাটে

তামাম্ - সমস্ত

তালা - তালা

তাল্ - তাল, সময়

তিক্ - প্রতিজ্ঞা, অভিমান, আত্মসম্মানবোধ

তিকাল্ - অভিমানী, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন

তিলা - তিলের মত আকারের কালো দাগ

তিলা - তিল থেকে তৈরী জিনিস

তিতা - তিক্ত

তিতকু - তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট

তুকড়া - এক ধরনের প্রশ্নোত্তরমূলক গান

ধাই – ধাত্রী
ধাউতানি – দুরন্ত (স্ত্রী) (?)
ধাওয়া – শাস্তি, আঘাত
ধাত্ – ধাতু, প্রকৃতি
ধান্ – ধান
ধানুয়া – ধান মিশ্রিত
ধাধা – বাঁশের তৈরী বড় আকারের ঝুড়ি
ধার্ – ধার
ধুয়া – ধোঁয়া
ধুয়া – ধ্রুবপদ
ধুতুরা – ধুতুরা
ধুন্ – ধন্দ, ধাঁধা
ধুলা – ধুলা
ধুতি – ধুতি
ধুম্ – ধুমধাম
ধুনা – ধুনা
ধুলানি – ধুলিধুসরিত
ধুলিয়া – ঐ
ধুর্ – ধূর্ত
ধুরুত্ – ধূর্ত
ধোকা – প্রতারণা
ধোঁআ – ধোঁয়া
ধোআনি – ধোঁয়াটে
ধোলাই – ধোয়ার কাজ, বিশিষ্টার্থে- প্রহার
ধোপা – ধোপা

[ন]

নও – নয়
নওলারি – নববধূ
নওয়া – নবম
নয়া – নতুন
নই – নদী
নঙ্ – নবজা (?)
নটুয়া – দুরন্ত
ননোদ্ – ননদ
নন্দাই – ননদের স্বামী
নগুল্ – আঙুল
নমড়া – লম্বা
নল্ – নল্
নলি – নল
না – নঞর্থক অব্যয়
নাইওর – নব বিবাহিতা কন্যার পিত্রালয়ে যাত্রা
নাই – নাভি
নাইয়া – নাবিক, মাঝি
নাইরকোল্ – নারিকেল
নাও – নৌকা
নাও – নাম
নাউ – লাউ
নাউয়া – নাপিত
নাউয়ানি – নাপিত জাতীয়া স্ত্রীলোক
নাক্ – নাক
নাকারু – যার নাক আকারে বড় (পুং)
নাকারি – ঐ
নাকু – যার উচ্চারণ নাসিকা
নাথান্ – মত
নাগোর্ – অবৈধ প্রণয়ী

নাগোরি - অবৈধ প্রণয়িনী
নাঙ্ - উপপতি
নাঙ্ - নাম
নাচ্ - নাচ
নাচোন্ - নাচ
নাচারি - এক ধরণের ছন্দ
নাটি - লাঠি
নাটিয়াল্ - লেঠেল
নাটেরা - লাঠির মত দীর্ঘদেহী এবং দুর্বল
নাদোর্ - উপনদী
নাতি - নাতি
নাতিনি - নাতনী
নানান্ - নানা, বিবিধ
নাত্ - লাত
নার্ - অন্ত্র, নাড়ি ভুঁড়ি
নাল্ - লাল
নাল্ - লালা
নাল্চিয়া - লোভী
নালোচ্ - লালসা
নালি - নালা, নালী
নাশি - নাসিকা উচ্চারণযুক্ত উচ্চগ্রামের এক প্রকার সুর
নি - নঞর্থক উপসর্গ
নিকাশ্ - নিঃশ্বাস
নিচা - নীচ
নিচ্চয় - নিশ্চয়
নিহাল্টিয়া - দুর্দশাগ্রস্ত
নিদয়া - নির্দয়
নিধুয়া - নির্জন
নিন্ - নিদ্রা
নিন্দালি বাণা - ঘুম পাড়ানোর আভিচারিক ক্রিয়া
নিন্দালু - নিদ্রালু (পুং)
নিন্দালি - ঐ (স্ত্রী)
নিপাতারি - নিরক্ষর
নিপুতা - নপুতা (পুং)
নিপুতি - ঐ (স্ত্রী)
নিভা - নেভানো, নির্বাপিত
নিভু-নিভু - নিভন্ত
নিমুখা - মুখচোরা (পুং)
নিমুখি - ঐ (স্ত্রী)
নিমাইয়া - বিপরীত
নিলা - নীল রঙের
নিলি - শ্যাওলা
নিলি - বাঁশের গায়ের উপরের সবুজ আস্তরণ
নুকানুকি - লুকোচুরি
নুটপুটা - লুণ্ঠিত
নুন্ - লবন
নুনিয়া - লবণাক্ত
নুনচি - ঐ
ন্যাখা - লিখিত
ন্যাটপ্যাটা - লিপ্ত
নেঙুট্ - লেজ
নেটু - লেজ
ন্যাচেরা - ন্যাকড়া
নেচুরা - অবশেষ

পুর্- পুরনো চালকুমড়া

পুর্- পুর, পিঠের ভিতরের পুর

পুরা - পুরা, সম্পূর্ণ

পুরানি - পুরাতন, পৌরাণিক

পুরান্তিয়া - পুরাকালীন

পুরা - ধান রাখার জন্য বাঁশ ও
খড় দিয়ে তৈরী ডুলি

পুরাট্- পরিণত

পুষ্- পৌষমাস

পুষা - পৌষমাস সংক্রান্ত

পুষুয়া - পৌষ সংক্রান্তি

পুষ্টাই - পুষ্টিকর

পুষ্কুনি - পুষ্করিণী

প্যাক্- কাদা

প্যাক্র্যাকা - কর্দমাক্ত

প্যাট্- পেট

পেটি - কোমরবন্ধ

পেটুক্- পেটুক

প্যাটেরা - পেট মোটা পুরুষ

পেটিনি - পেট মোটা স্ত্রীলোক

পেপুরা - পিঁপড়ে

প্যালা - ঠেলা, শাস্তি, প্রহার

প্যাতড়া - প্রেত

প্যাত্নানি - পেত্নী

প্যান্- প্রাণ

পোয়া - পোয়া, এক চতুর্থাংশ

পোয়া - সন্তান

পোয়াতি - প্রসূতি

পোয়াল্- বিচুলি

পোকা - পোকা

পোটোল্- পটল

পোন্- প্রতিজ্ঞা

পোনোয়াড়্- বংশধর(?)

পোরা - দগ্ধ

পোষা - পালিত

পোষ্- পোষা

পোষানি ব্যাটা - পোষ্য পুত্র

পোষানি বেটি - পালিতা কন্যা

[ফ]

ফড়িং্- ফড়িং

ফড়িঙা - ফড়িংয়ের মত চঞ্চল

ফলুয়া - ফলবান

ফল্-পাকোর্- ফলমূল

ফাউরা - মাটির ঢেলা ভেঙে মাটি সমান করার জন্য
ব্যবহৃত কাঠের টুকরা

ফাইকট্যা - টুকরা

ফাগ্- আবির

ফাগুনা - ফাল্গুন মাস সংক্রান্ত

ফাগুয়া - বসন্তোৎসব

ফাটা - ফাটা

ফারা - ছেঁড়া

ফাল্- ফাল, ফলা

ফিচা - লেজ

ফিচাফাটেরা - বড় লেজ ওয়ালা, বিশিষ্টার্থে - অহংকারী

ফুকট্যা - মোটা বাঁশের চোঙ্গা

ফুটা - ছিদ্র

ফুল্ - ফুল

ফুলা - ফুলা

ফ্যাকোন্ - পেথর, আবদার

ফ্যানা - সাপের ফণা

ফ্যান্ - ভাতের ফ্যান

ফোট্ - ফোটক

ফোটা - ফোঁটা, বিন্দু

ফোড়্ - ছিদ্র

[ব]

বইন্ - বোন

বইনি - ঐ

বইনা - ভগ্নীপতি

বইদো - প্রিয়জন, বন্ধু

বইরাত্ - বরযাত্রী

বইরাতি - বিবাহের সময়ে বরকে সাহায্য করে যে মহিলা

বওনাই - ভগ্নীপতি

বয়োশ্ - বয়স

বয়রা - কানে শোনে না যে (পুং)

বইরি - ঐ (স্ত্রী)

বকমুন্ - বামুন

বঠি - বঁটি

বটুয়া - ঝোলা

বত্তা - জীবন্ত

বত্তুতান্ - বাঁচা

বতুয়া - এক প্রকার শাক

বনু - ভগ্নীপতি

বনুয়া - বন্য

বনুশ্ - স্ত্রী

বন্ধুয়া - বন্ধু

বন্ধুয়ালা - বন্ধুত্ব

বর্ব্বরিয়া - বর্বর, জেদী

বড়ো - বড়

বড়াই - পিতামহী

বড়াই - অহংকার

বড়োমা - প্রপিতামহী

বশুখি - বুদ্ধি

বশিয়া - যে শিশু সদ্য বসতে শিখেছে, যে বসেই সময় কাটায়

বশ্তি - বসতী

বহেরা - বধির

বহিরি - বধিরা

বা - বা (বৈকল্পিক অব্যয়)

বাই - দিদি

বাইদা - বেদে

বাইন্ - বায়েন

বাইশ্যা - বর্ষা

বাইশ্যালি - বর্ষাকালীন

বাইগোন্ - বেগুন

বাইগুনিয়া - বেগুনি, সবুজ

বাইর্ - বাহির

বাউ - স্নেহসূচক সম্বোধন

বাউল্ - বাউল (পুং)

বাউলানি - ঐ (স্ত্রী)

বাউনি - খর্বাকৃতি স্ত্রীলোক

বাউদিয়া - উদাসীন বা বাতাসে ভাসমান

বাউদিয়ালি - উদাসীনা

বাউনকুয়া - বালুকাময়

বাও - বাতাস

বাও - বাম

বাওআলি - ঘূর্ণী বায়ু

বাওনা - খর্বাকৃতি পুরুষ

বাওয়া - বামে অবস্থিত

বাগুরা - বাহির

বাগেল্ - বাকল

বাঙুয়া - বাঁক, ভারবহনদন্ড

বাখান্ - বিবরণ, কাহিনী

বাঘ্ - বাঘ

বাঘোর্ - বাঘাকৃতি

বাচ্ - নিকৃষ্ট, পরিত্যক্ত

বাছা - স্নেহসূচক সম্বোধন

বাছুর্ - বাছুর

বাজেনা - বাজনা

বাট্ - দুধের বাঁট

বাট্ - পথ

বাট্টা - বাটা

বাট্টি - বাটি

বাটি - থলি

বাত্ - সময়

বাটুয়া - বাঁশের তৈরী ছোট ঝুড়ি

বাটুন্ - বাঁটুন

বাত্ - বাতরোগ

বাতা - বাঁশের বাতা

বাতাস্ - বাতাস

বাতি - বাতি

বাতুল্ - রোগীর পক্ষে অনিষ্টকর খাদ্য

বান্ - বন্যা

বান্ - বাঁধন

বানি - গয়না তৈরীর মজুরী

বানিয়া - স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী

বানুয়া - বন্য

বান্দা - নিঃসন্তান

বান্দি - সন্তানহীনা

বান্জি - ঐ

বান্দোর্ - বাঁদর

বান্ধোন্ - বন্ধন

বাপ্ - পিতা (উল্লেখে)

বাপ্ছেলাবৃত্তি - পৈতৃক

বাপ্কালিয়া - ঐ

বাপ্খিলা - পিতৃবংশজ

বাপু - পিতামহ

বাপোই - স্নেহসূচক সম্বোধন

বাবা - পিতা (সম্বোধনে)

বামুনি - ব্রাহ্মণী

বামোন্ - ব্রাহ্মণ

বার্ - বার, দিন

বারি - বাড়ি

বারোবাট্ - বিনষ্ট

বাল্ - যৌনকেশ

বালা - বালা, হাতের গহনা

বালা - বালি

বালা - পুত্র

বালি - কন্যা
বালাগনা - কৃপণ (বিশিষ্টার্থে)
বালাশি - বেলে, বালিযুক্ত
বাশ্ - বাঁশ
বাশেনা - গন্ধ
বাশি - বাঁশি
বাশিয়াল্ - বংশীবাদক
বাহা - বাহু
বাহেরা - বাহির
বাহার্ - চাকচিক্য, জৌলুস
বাহি - একগুঁয়েমি
বিয়াই - বৈবাহিক
বিয়ানি - বৈবাহিকা
বিঘা - বিঘা
বিখাউজ্ - বিষাক্ত এক প্রকার ঘা
বিচোন্ - পাখা
বিচোন্ - বীজ
বিচি - বীজ
বিচা - অণ্ডকোষ
বিছা - বৃশ্চিক
বিছিনা - বিছানা
বিজি - বেজী
বিজুলি - বিদ্যুত
বিড়িরিধান - আউশ ধান
বিথার্ - বিস্তার
বিথান্ - ঐ
বিদা - কৃষিযন্ত্র(?)
বিদাকি - বিদায় দক্ষিণা

বিদুয়া - বিধবা
বিন্ - ব্যতীত
বিনাচর্ - ঐ
বিনি - ঐ
বিনি - বেণী
বিন্নি - এক প্রকার ধান
বিচুনা - পাখা
বিন্দি - সূঁচ
বিলাই - বিড়াল
বিষ্ - বৃষ্টি
বিশি - বৃষ্টির সমাহার
বিষ্ - বিষ, ব্যথা
বিষালু - ব্যথায় কাতর (পুং)
বিষালি - ঐ (স্ত্রী)
বিষুয়া - মহাবিষুব সংক্রান্তি
বিস্তি - এক ধরনের তিক্ত ফল
বিস্যুতিবার্ - বৃহস্পতিবার
বিহা - বিবাহ
বিয়াও - বিবাহ
বিহান্ - প্রত্যুষ
বুক্ - বুক
বুক্নি - বক্ষাবরণ
বুকাশি - বুকের পাশের জায়গা
বুকারি - বুকের হাড়
বুকাল্ - দয়ালু, শক্তিমান, সাহসী
বুজ্ - জ্ঞান
বুজগ্যান্ - হিতাহিত জ্ঞান
বুঝাবুঝি - পরামর্শ

বুড়্হা - বুড়া

বুড়্হি - বুড়ি

বুরবুরি - বুদ্‌বুদ্‌

বুরা - বুড়া

বুরি - বুড়ি

বুরাতি - বার্ধক্য

বুরালি - ঐ

বুলি - কথা

ব্যাকড়া - বিকৃত

ব্যাঙ্‌ - ব্যাঙ

ব্যাটা - বেটা, পুত্র

বেটি - কন্যা

ব্যাটা ছাওয়া - পুরুষ

বেটিছাওয়া - স্ত্রীলোক

ব্যাদেরা - বিদীর্ণ

ব্যানা - এক তার বিশিষ্ট এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র

ব্যানাকুশান - রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীভিত্তিক এক প্রকার পালাবদ্ধ গান

ব্যাত্‌ - বেত, তাড়নদণ্ড

ব্যার্‌ - বেষ্টনী

ব্যাল্‌ - বেল

ব্যালাডাটি - বিকাল

ব্যালোর্‌ - মাকের ফুল, পর্বে

বেচড়িত্‌ - বিচিত্র, অদ্ভুত

বেতাল্‌ - অসময়

বেনাম্‌ - ছদ্মনাম

বেভোল্‌ - বিহ্বল

বেহাত্‌ - হাতছাড়া

বেহার্‌ - কোচবিহার রাজ্যের প্রচলিত একটি নাম

বেহা - বিবাহ

বৌল্‌ - বকুল

বৌ - বৌ

বোঝ্‌ - বোঝা

বোঝাই - বোঝাই

বোঝারু - বোঝা বহনে সক্ষম

বোটা - বোঁটা

বোবা - মূক

বোল্‌ - কথা, আওয়াজ

ভ

ভইচাল্‌ - ভূমিকম্প

ভইষ্‌ - মোষ

ভজি - ভ্রাতৃজায়া

ভরা - ওজন

ভরুতি - ভর্তি

ভরা - ঐ

ভরুসা - ভরসা

ভাই - ভাই

ভাউজ্‌ - ভ্রাতৃজায়া

ভাও - দাম, অবস্থা

ভাগ্‌ - ভাগ, অংশ

ভাগি - অংশীদার, জ্ঞাতি

ভাঙ্‌ - ভাঁড়

ভাঙ্‌ - ভাঙ্‌

ভাঙা - ভাঙা

সিরি - প্রজন্ম

সিল্ - পাথর

সিলাই - সেলাই

সিস্ - সিস

সুই - সুঁচ

সুয়া - শুকপাখি

সুকান্ - শুকনো

সুকট্টা - শুকনো মাছ

সুকা - সিকি(?)

সুকাতি - শুকানো পাতা

সুকুর্ - শুক্রবার

সুখাতি - সুখী

সুঠ্ - শুকনো জিনিস

সুদায় - সঙ্গে

সুধু - শুধু

সুনস্নান্ - অকারণে

সুর্ - হাতির শুঁড়

সুরুঙ্ - সুড়ঙ্গ

সুলি - শূল

স্যাক্ - তাপ

স্যাজা - বিছানা

স্যাজারি - বিছানার উপকরণ

সেনদুর - সিন্দুর

স্যাতা - সাদা রঙের

স্যাবাইত্ - সেবায়েত

স্যার্ - সেড়

স্যালা - তখন

স্যাশুয়া - সর্বশেষ

সোগাত্ - স্বাদ

সোতান্ - স্রোতবান

সোনা - সোনা

সোনালি - স্বর্ণময়

সোদোর্ - সহোদর, আত্মীয়

সোদোরানি - আত্মীয়া

সোভা - সভা

[হ]

হই - হই

হয় - হয়

হতোদারা - হতাদর

হতোনাগুরা - ক্ষতিকারী

হর্ - দেখ

হরিঙ্ - হরিণ

হলদি - হলুদ

হরিহাট্ - কোলাহল

হাউ - ভয়

হায় - আবেগসূচক অব্যয়

হায় হায় পাথার্ - বিস্তীর্ণ জনহীন প্রান্তর

হাক্ - ডাক

হাগরা - পেটের অসুখ

হাগুরা - পেটরোগা (পুং)

হাগুরি - ঐ (স্ত্রী)

হাগুরা - হামাগুড়ি

হাঘরিয়া - গৃহহীন

হাভাতিয়া - হাভাতে, অন্নহীন

হাট্ - হাট, বাজার

হাটুয়া - হাটুরে, হাট থেকে কেনা জিনিস

দেশী

প্রাগার্য যুগে ভারতবর্ষে প্রচলিত দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ইত্যাদি গোষ্ঠীর ভাষা থেকে অনেক শব্দ ভারতীয় আর্যভাষীদের দ্বারা গৃহীত হয়। এই শব্দগুলি কালক্রমে নব্যভারতীয় আর্য স্তরে এসে নব্যভারতীয় আর্যভাষাসমূহের নিজস্ব শব্দসম্পদে পরিণত হয়। নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলিতে প্রচলিত অধিকাংশ ধ্বন্যাত্মক শব্দ এভাবেই অনার্যভাষীদের কাছ থেকে আর্যভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। এই শব্দগুলিকেই প্রাচীন বৈয়াকরণরা 'দেশী' শব্দ বলে চিহ্নিত করেছেন। নব্যভারতীয় আর্য স্তরের ভাষা বাংলার শব্দভাণ্ডারে এই জাতীয় শব্দের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। উত্তরবঙ্গের উপভাষার শব্দভাণ্ডারের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হ'ল এই শ্রেণীর শব্দ। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত বাংলায় তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম এবং দেশী, এই ত্রিবিধ শব্দের সামগ্রিক হিসেবের উল্লেখ করে ইতোপূর্বে এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে যেহেতু অন্যান্য উপাদান, অর্থাৎ তৎসম শব্দের অনুপাত উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাংলা অপেক্ষা কম তাই তদ্ভব শব্দের অনুপাত এই উপভাষায় বাংলা অপেক্ষা বেশী। এক্ষেত্রে সেই একই যুক্তির উপরে ভিত্তি করে বলা যায় যে দেশী শব্দের অনুপাতও এই উপভাষায় বাংলা অপেক্ষা কিছুটা বেশী হবে। পর্যাপ্ত, এই উপভাষায় প্রচলিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়াধাতুর বিভিন্নমুখী ব্যবহার (যা বাংলায় তুলনামূলক ভাবে কম) এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি। নিম্নে এই উপভাষার বহুপ্রচলিত দেশী শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হ'ল।

অ

অবোকা - নির্বোধ

অথা - ঐ

অবাটিনা - অদ্ভুত

অচুকা - অচেনা, অনভ্যস্ত

অচোদা - নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন

অটাইল্ - শক্ত

অড্ডা - অবাধ্য

অদুয়া - অলসহীন

অপোকাল্ট্যা - নির্বোধ

অপোভাবট্যা - কাণ্ডজ্ঞানহীন

অলাবিল্ - সময়সাপেক্ষ

অখাড়িল্ - অসমা, দরিদ্র

আ

আচা - বিবাহিত পুরুষপোকা

আচাভুয়া - অদ্ভুত

আউলুবাউল্ - কিংকর্তব্যবিমূঢ়

আওলাও্ - যেমন তেমন

আদলাও্ - গভীর, অসমতল

আপাও্ - নির্বোধ

আবাও্ - ভিত্তিহীন

[ছ]

ছচ্‌কা - কৌশল

ছমছুমি - বুক জ্বালার অনুভূতি

ছাইচক্কা - খাখাড়া

ছাইতোন্ - ডালিম গাছ

ছাটা - চাবুক

ছাতু - ছাতু (?)

ছাতুয়া - তীর্থযাত্রী

ছান্ - গোবর

ছান্দি - দুই আঙুলের মধ্যের জায়গা

ছাপরা - খাঁচু

ছাপি - খাপলা জাল

ছিচ্‌কা - খাখারা, ছোট

ছিপরা - দুষ্ট, চঞ্চল

ছিমছাম্ - দুষ্টুমিপূর্ণ

ছিলছিলা - মসৃণ

ছিলিয়া - পাগল

ছিনালি - পাগলিনী

ছুচিছুচি - খুবই ছোট জিনিস

ছুচা - দুষ্ট

ছুচকুনি - বাঁশের চিক্‌ন বাখারি

ছুট্‌টা - টুকরা

ছ্যাও - আকৃতি

ছ্যাকা - চাল দিয়ে তৈরী একপ্রকার খাবার

ছ্যাওটা - আগুনের উত্তাপ, ছ্যাঁকা

ছ্যাচরা - নির্লজ্জ

ছেচিরি - নির্লজ্জা

ছ্যাচা - বাঁশের চাঁচ

ছ্যাবলা - লঘু প্রকৃতির

ছ্যারাব্যারা - এলোমেলো

ছ্যানরা ছ্যানরি - বাড়া বাড়ি

[জ]

জড়িয়া - বাজি প্রস্তুতকারক

জও্ - খড়িচা

জলপোই - জলপাই ফল

জাই - যক্ষ

জলদা - যেখানে বৈবাহিক সম্পর্ক শাস্ত্রানুমোদিত নয় সেখানে যে ব্যক্তি বিবাহ করে

জাম্ - মাছ ধরার একপ্রকার যন্ত্র

জাম্‌রা - চটের থলে

জাবুর্ খাবুর্ - এলো মেলো

জুরা - বিচুলিতে পাকানো ছোট বোঝা

জুলজুলা - অসহায়

জেট্যুয়া - বিদ্রুপ

জ্যালজ্যালা - জীর্ণ

জহর্ - ঝগড়া

জই জই - ব্যাপক

জোকা - খাপ

জোড়জোড়া - নির্বোধ

[ঝ]

ঝকঝকা - পরিচ্ছন্ন

ঝমঝমা - গমগমি বিশিষ্ট

ঝটপটে - তাড়াতাড়ি

ঝরা - সোনার তৈরী দুল (?)

ঝরঝরা - পরিস্কার

ঝর্ - ঝাঁপ

ঝাক্ - ঝাঁক, সমষ্টি

ঝাড়ুয়া – ঝাঁকের অন্তর্ভুক্ত

ঝাইমড়া – খোঁড়া

ঝাইঙড়া – ঐ

ঝাউলা – যার মাথার চুল এলোমেলো (পুং)

ঝাউলি – ঐ (স্ত্রী)

ঝাট্‌টাউ – হঠাৎ

ঝালাম্‌, ঝাটাম্‌ – এলোমেলো

ঝিরঝিরা – ঝর ঝরে, ঝুরঝুরে

ঝিল্‌ঝিলা – জীর্ণ

ঝুমঝুমা – ঘনসন্নিবিষ্ট

ঝুপড়ি – ঝাঁকড়া

ঝুপঝুপে – অবাধে

ঝেচু – ফিঙে পাখি

ঝ্যাটোল্‌ – ঢিল

ঝ্যাম্বুরা নাগা – নিস্তেজ

ঝ্যালরা – ন্যাকড়া

ঝ্যালরা – মন্থরগামী (পুং)

ঝেলরি – ঐ (স্ত্রী)

ঝোকা – মাছ ধরার একপ্রকার যন্ত্র

ঝোড়োল্‌ – কলাগাছের শুকনো পাতা

ঝোলঝোলা – তরল, জলীয়

ঝোলঝোলা – শিথিল, নিস্তেজ

[ট]

টইনরা – দুর্বল ও ক্ষুদ্রাকৃতি

টইবরা – ক্লান্ত, পর্যুদস্ত

টইমলা – নিশ্ছিদ্র

টউলিয়া – পরিবেশনকারী

টটেয়া – ক্ষুদ্রাকৃতি

টটপুরা – দুর্বল, হতশ্রী

টনটুনা – শক্ত, সমর্থ

টমরা – ছোট

টমড়িয়াল্‌ – পর্যুদস্ত, ক্লান্ত

টমড়ু – ছোট

টপটুপা – পরিপূর্ণতাজ্ঞাপক ধ্বন্যাত্মক শব্দ

টপটুপে – দ্রুত

টরটরা – শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া জিনিস

টলটলা – নির্মল

টলা – কানা (পুং)

টলি – ঐ (স্ত্রী)

টাইল্‌ – ঘাত, বিপদ

টাউরিয়া – পরিদর্শী

টাঙাস্‌ টাঙাস্‌ – বিরক্তির ভাব

টাটারি – বাবা

টাটারি ভাটারি – স্পষ্ট, নিঃসংকোচ

টাটারি কাটা – অহংকারী

টাপ্‌ – গরুর খুর

টাম্‌ – পেয়ারা

টামটুম্‌ – পরিপাটি

টারা – খুঁটির মাথাতে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে স্থাপিত বাঁশ

টারুয়া – হাড়

টারুয়া খিরা – হাড় সর্বস্ব

টারুয়া ঢোঁঙরা – আপাদ মস্তক

টাস্‌ – অবাক

টাহোর্‌ – পুং জাতীয় জীব

টিকা – নিতম্ব

ঠুঘ্ - টুকরা

ঠুঘা - ঐ

ঠুঘঠুঘা - বিষণ্ণ, বিরক্ত

ঠুনরা - প্রতারক

ঠুমঘুম্ - কান্না

ঠুমঘুমা - করুণ

ঠুমঠুমা - শীর্ণ, দুর্বল, পাংশুবর্ণ

ঠ্যাক্ - বিপদ

ঠ্যাকা - ঐ

ঠ্যাঙ্ - পা

ঠ্যাঙা - ডান্ডা

ঠেঙু - কৃপণ

ঠ্যাল্ - গাছের ডাল

ঠ্যাল্যাঠেল্লি - কলহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব

ঠোগা - ঠোঙা

ঠোঙঠোঙা - একাকী, অবলম্বনহীন

ঠোঁটা - খাপা

ঠোনা - মৃদু আঘাত

ঠোলা - হাতের তালু বাঁকা করলে হাতে যে গর্ত সৃষ্টি হয়

ঠোসঠোসা - দুর্বল, শীর্ণ, পাংশুবর্ণ

ঠোসা - খাদ রাখার জন্য বাঁশের তৈরী একপ্রকার ঝুড়ি

[ড]

ডগ্‌ডগা - লাল রঙের গাঢ়তাবোধক বিশেষণ

ডক্‌ডকা - অহঙ্কারী, সতেজ

ডক্‌ডকানি - সতেজতা, অহঙ্কার

ডগ্‌ডলা - সতেজ

ডম্‌ডমা - সতেজ, অহঙ্কারী

ডাই - বড় আকারের একপ্রকার পিঁপড়ে

ডাইঙ্ - স্তূপ

ডাউঙ্গা - বড় টুকরা

ডাউঙ্গা - স্বামী বিয়োগের পর বিবাহ অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে গৃহীত স্বামী বা অভিভাবক

ডাউরিয়া - অহঙ্কারী

ডাউড়্যা - ঐ

ডাউশা - উপপতি

ডাউশানি - উপপত্নী

ডাঙা - উঁচু জমি (?)

ডাট্ - অহঙ্কার

ডাটুয়া - অহঙ্কারী (পুং)

ডাটুয়ানি - ঐ (স্ত্রী)

ডাহুটাচার্ - অহঙ্কারী

ডাহুমান্ - অভিমান

ডাপ্ - ঝুঁড়ির মতো টাঙানো বাঁশ

ডাম্‌ডিরি - অহঙ্কার

ডাবুয়া - কাঁকড়া ইত্যাদি প্রাণীর দাঁড়া, অহঙ্কার

ডাবুয়াচার্ - অহঙ্কারী

ডাম্‌ডিম্ - আস্থাবান, স্বনির্ভর

ডিকা - ঢেলা

ডিকারি - ঢেঁকুর

ডিপ্‌ডিপা - লাল রঙের মাত্রাজ্ঞাপক বিশেষণ

ডিডিরাম্ - গর্জন

ডিম্‌ডিরি - ঐ

ডিলা - শ্বেত প্রদর রোগ

ডিলডাঙ্ - চিৎপাত, দুর্বল ভঙ্গী
ডিঙ্গাল্ - মজবুত
ডুঙডুঙি - নির্বোধ স্ত্রীলোক
ডুকডুকা - স্বাস্থ্যবান
ডুম্ - দুগ্ধ
ডুলডুলা - স্বাস্থ্যবান
ডুমডুমা - অপদার্থ
ড্যাগোর্ - দিগন্ত
ডেঙ্ড়িয়া - অকৃতজ্ঞ
ড্যাঙরা - বড়
ডেকুয়া - তাজা, যুবক
ড্যাঙড্যাঙ্ - উন্মুক্ত
ড্যানড়েরা - কলঙ্ক
ড্যাপড্যাপা - ভিজে
ড্যাম্ - স্বাস্থ্য, সতেজতা
ড্যামা - তামাক ইত্যাদি গাছে কাণ্ড
এবং পাতার সন্ধিস্থলে
উদ্গমিত পাতা
ডেমুয়া - স্বাস্থ্যবান, সতেজ
ড্যালা - ঢলা
ডোকরা - পরিস্ফুটিত
ডোকড়োক্ - মনোযোগ সহকারে
ডোকড়োক্ - তীব্র
ডোকড়োকা - নির্বোধ
ডোগা - মাটির ছোট হাড়ি
ডোঙড়োঙা - নির্বোধ, উন্মুক্ত
ডোলড়োলা - শিথিল, তরল
ডোহোরা - একগুঁয়ে, জেদী

[ঢ]

ঢক্ - সৌকর্য
ঢকাল্ - সুকর
ঢকুয়া - ঐ
ঢকো - সুকরী
ঢঙ্ড়া - উঁচু, দীর্ঘ
ঢঙ্ - ভঙ্গী (?)
ঢমঢমা - মোটা, প্রচুর
ঢমড়া - শক্ত, অসমান
ঢমড়মা - মোটা
ঢাই - প্রতিদ্বন্দ্বিতা
ঢাউস্ - বড়
ঢাঙা - দীর্ঘদেহী (পুং)
ঢাঙি - ঐ (স্ত্রী)
ঢাপুসা - দণ্ড সমেত কলার পাতা
ঢাড়া - দীর্ঘদেহী (পুং)
ঢাড়ি - ঐ (স্ত্রী)
ঢালুয়া - বড়
ঢাসা - চালচলন
ঢিকঢিকা - শক্ত, পরিষ্কার
ঢিঙাইত্ - নিকর্মা
ঢিল্ - ঢিলার ভাব
ঢিলা - ঢিলা
ঢিপ্ - গুঁতো
ঢিপালি - যে গরুর গুঁতো মারার অভ্যাস আছে
ঢুই - নিকৃষ্ট
ঢুড়া - দুশ্চরিত্র
ঢুড়ি - দুশ্চরিত্রা

ফ্যার্ - পার্থক্য

ফেরুয়া - পার্থক্যযুক্ত

ফোক্ - ফুঁ

ফোকড়াই - ভারযুক্ত একপ্রকার তরকারী

ফোঙ্ - বড় আকারের ছিদ্র

ফোঙ্ফোঙা - ফাঁকা, প্রশস্ত

ফোতা - পাঁচ হাত মাপের বিশেষ
ধরনের কাপড়

ফোতাচিপা - আত্মাবধ (বিশিষ্টার্থে)

ফোম্ফোলা - নরম

[ব]

বউনি - প্রথম বিক্রী

বয়া - খারাপ

বয়ু - গন্ধ

বক্কিল্ - কৃপণ

বথেয়া - হাস্যরসিক

বখুকা - একপ্রকার মাছ

বলরা - দড়ি পাকানোর যন্ত্র

বহেনা - বন্ধ্যা

বাতান্ - পাখা গজায় যে পিঁপড়ের

বাতান্ - ঘ্রাণ

বাদা - ফলের গুচ্ছ

বাদু - শুকরের চর্বি

বানা - মাছ ধরার জন্য বাঁশের তৈরী যন্ত্র

বান্নি - ঝাঁটা

বাবুরি - একপ্রকার শাক

বারা - চাল তৈরীর শুকনো ধান

বারুন - ঝাঁটা

বাড়োজারি - বিতর্ক

বাড়োকাটাই - নিরর্থক যুদ্ধ

বাড়োকান্দা - দুষ্ট তার্কিক

বাগুনি - কলেরা ইত্যাদি রোগে রোগীর হাতে পায়ে
খিল ধরার যে লক্ষণ প্রকাশ পায়

বাহেছা - মজুরীর বিনিময়ে ধান ভাঙার চুক্তি

বাহো - সার্বজনীন জলাশয়ে সর্বসাধারণের মাছ
ধরার অনুষ্ঠান

বিজিলা - বাঁধানো

বুকি - বোকা স্ত্রীলোক

বুচি - খর্বকায়া

বুচুরি - খর্বাকৃতি, হাতলবিহীন

বুজরান্ - বড় আকারের

বুম্রা - ছিদ্র

ব্যাঙ্গাতা - গভীর

বেঙ্টি - পায়ের গোড়ালি

ব্যাদেকফুদেকা - বোকা (পুং)

ব্যাদেকদেদি - ঐ (স্ত্রী)

ব্যাদেঙ্ - বোকা (পুং)

ব্যাদেদি - ঐ (স্ত্রী)

ব্যাদেলেঙ্ - জল জোঁক

ব্যান্দ্রাপা - ছোট, খচা

ব্যাঙ্গ্রাঙ্গা - কর্মব্যস্ত

ব্যানরানা - পচা, নরম

বোই - কচুর গাঁট

বোয়া - একপ্রকার ধান

বোহোর্বোহোর্ - ক্রোধসূচক উক্তি

বোঙবোঙা - নির্বোধ

সর্‌সরা – সোজা, পরিষ্কার, অবাধ

সল্‌সলা – সোজা, পরিষ্কার

সলেয়া – ছোট আকারের ইঁদুর

সাইঙ্‌ – দন্ডের মাঝখানে ওজন ঝুলিয়ে বহন করার পদ্ধতি

সাইল্‌ – একপ্রকার খাঁটো গাছ

সাইত্‌ – যাত্রা, শুভ, যাত্রারম্ভ

সাইতা – শুভপ্রদ

সাকুয়া – উন্মুক্ত

সাঙ্‌না – উপপতি

সাঙ্‌নি – উপপত্নী

সাঙ্‌সাঙা – ফাঁকা ফাঁকা

সাচি – একপ্রকার মাছ

সাটা – পাটাতন

সানিয়া – টুকরা

সাঙ্কুরা – বড় আকারের শামুক

সালরাঙ্‌ – অবাধে

সিক্‌সিকা – পরিষ্কার, ঝিরঝিরে

সিক্‌টি – বাঁশের সরু কঞ্চি

সিকিয়া – সিকে (?)

সিয়ান্‌ – বয়োপ্রাপ্ত

সিয়ানি – কফ

সিজু – ফণী মনসা গাছ

সিঙ্‌সিঙা – সরু একহারা চেহারা

সিট্‌সিটা – ঐ

সিদোল্‌ – শুকনো মাছের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী এক ধরনের খাদ্য

সিদ্‌রা – অকর্মণ্য, শ্লথ গতিসম্পন্ন

সির্‌সিরা – ঝিরঝিরে, বাহুল্যবর্জিত

সিরু – একপ্রকার ঘাস

সুঙা – রোম

সুঙারি – বিষাক্ত শুঁয়াপোকা

সুঙ্‌লাই – এক প্রকার ফল, যা শরীরে লাগলে শরীর চুলকায়

সুট্‌সুটা – সোজা, বাধ্য

সুড়্‌লি – কলাগাছের অংশবিশেষ

সুরসুরি – সুড়সুড়ি

সুলসুলা – ঢিলেঢালা, অকর্মণ্য (পুং)

সুলসুলি – ঐ (স্ত্রী)

সুলসুলে – অজান্তে, অলক্ষ্যে

সুল্‌কি – চাতালের চারটি ঘরের সন্ধিস্থলের ফাঁকা জায়গা

সূল্‌কি – সময়, সময়ের একক

স্যাঙ – ঢালু, পরাজিত, বিনীত

স্যাঙ্‌স্যাঙা – নিস্তেজ, নিরুত্তাপ

স্যাঙ্‌র‍্যাঙ্‌ – দ্বিধা

স্যাঙ্‌র‍্যাঙা – দ্বিধাগ্রস্ত

স্যাত্‌স্যাতা – ভিজে

স্যাম্‌স্যামা – ঐ

স্যাল্‌স্যালা – শিথিল

সোকোরদোম্‌ – শক্ত, মজবুত

সোলসোলা – শিথিল, নিস্তেজ, নিরুত্তাপ

সোলরোঙ্‌ – অবাধে

সোসারি – ঝালের প্রতিক্রিয়ায় মুখ দিয়ে যে শব্দ বেরিয়ে আসে

সোত্‌রা – জাঁতি

[হ]

হ হ - গরু খ্যাদানোর আওয়াজ

হকহুক্ - ক্লান্তিজনিত শব্দ

হকহুকি - ঐ

হটহুটা - শুকনো

হতোমজ্লাত্ - পর্যুদস্ত, উপর্যুপরি চেষ্টা

হম্হুনি - ক্রোধসূচক কথা

হমক্বা - হঠাৎ

হমক্বা - অস্থায়ী বৃষ্টি

হর্হরা - শুকনো এবং শক্ত

হর্হরে - দ্রুত

হর্হরি - গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ, গর্জন

হলহলা - শক্ত গড়নের, স্বাস্থ্যবান

হাই - নিঃশ্বাস

হাই কাই শব্দ আটকানোর ভাব

হাইলোন্ - বাচ্চাওয়ালা স্ত্রী ছাগল

হাউ - ভয়

হাউক্দাউক - ব্যস্ততা, আগ্রহ

হাউলি - সাহায্য, সাহায্যকারী

হাউকা - আনুমানিক

হাউঙ্ - যার মুখ বড়

হাউঙ্দা - ঐ

হায়দারি - বড় আকারের করাত(?)

হকোই - পাখা

হাকুদাকু - ব্যস্ততা, আগ্রহ

হাকড়াউ - হঠাৎ, চমক

হাঙহাঙা - প্রশস্ত, শূন্য

হাচ্কিনি - শস্যক্ষেত্রে আগাছা পরিষ্কারের যন্ত্র

হাচিনি - ঐ

হাইচাও - একপ্রকার খেলা

হাদাঙ্ - বোকা (পুং)

হাদাঙি - ঐ (স্ত্রী)

হাযাল্ - দুষ্কি(?)

হিক্নি - ডাক, হাঁক

হিচিরিম্, চিকিরিম্ - তর্জন গর্জন

হিচিরা হিচিরি - টানা টানি

হিডিম্ - মাথা, মস্তিষ্ক

হিড়্হিড়ে - সবলে

হিরিম্ - হঠাৎ

হুচুরু - একপ্রকার বনজ সবজী

হুচাই মুচাই - তাড়াতাড়ি

হুদুমা - উলঙ্গ

হুদু - বোকা

হুদুঙা - অসভ্য (পুং)

হুদুঙি - ঐ (স্ত্রী)

হুদুমা খ্যালা - বর্ষাকালে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে উত্তরবঙ্গের মহিলারা এক বিশেষ পদ্ধতিতে বৃষ্টিদেবতার পূজা করে। এই পূজাকে 'হুদুমা খ্যালা' বলে।

হুদুমাগালি - যে স্ত্রীলোকের গাল ফোলা

হুদ্ড়াঙ্ - দুরন্ত, কাণ্ডজ্ঞানহীন (পুং)

হুদ্ড়াঙি - ঐ (স্ত্রী)

হুমুর্, হুমুর্ - অবিন্যস্ত, এলোমেলো

হুড়াহুড়ি - ঠেলাঠেলি

হুড়্ - গণ্ডগোল

হুড়্যালা - যে ব্যক্তি জবরদস্তি করে কাজ করে

হুশ্কিল, মুশ্কিল - বিপদ আপদ

বিদেশী

শিষ্ট বাংলার মতই উত্তরবঙ্গের উপভাষায় আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ এবং সামান্য সংখ্যক বিকৃত উচ্চারণযুক্ত ইংরেজী শব্দ প্রচলিত। এছাড়া কোচ-রাভা এবং বোড়ো, প্রতিবেশী এই দুটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সহাবস্থান জনিত কারণে সামান্য কিছু শব্দ কোচ-রাভা এবং বোড়ো ভাষা থেকে সংশ্লিষ্ট উপভাষার শব্দভান্ডারে অনুপ্রবেশ করেছে। তবে এই উপভাষার বাচকগোষ্ঠীর উচ্চারণে এই সব শব্দের মূল রূপ অংশতঃ বিকৃত হয়েছে। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শব্দগুলির উৎস সম্পর্কে নিঃসংশয়িত হওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে রাজবংশী ছাড়াও উত্তরবঙ্গের অন্য যেসব সম্প্রদায় এই উপভাষা ব্যবহার করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল মুসলমান সম্প্রদায়। এই উপভাষায় প্রচলিত আরবী, ফারসী ইত্যাদি শ্রেণীর শব্দগুলি, ধর্মীয় অথবা যে কোনো কারণেই হোক, এই মুসলমান সমাজেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। রাজবংশী এবং এই উপভাষা ব্যবহারকারী অপরাপর হিন্দু সমাজের ব্যবহারে এই জাতীয় শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। তবে জমিজমা, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত,এই শ্রেণীর শব্দগুলি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এই উপভাষাভাষী সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক সমপরিমাণে ব্যবহার করে থাকে।

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের হিসেব অনুসারেবাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের অনুপাত শতকরা ৪.৫৫ ভাগ।[১] উত্তরবঙ্গের উপভাষায়, ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনো পূর্ণাঙ্গ আকরগ্রন্থ নেই। সুতরাং এই ধরণের হিসেব এক্ষেত্রে নির্দেশ করা সম্ভব না হলেও অনুমান করা যেতে পারে যে এই উপভাষায় বিদেশী শব্দের অনুপাত বাংলা অপেক্ষা কম হবে। এর একাধিক কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে।

(এক) এই উপভাষাভাষী জনগোষ্ঠীগুলির দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চল,অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ দীর্ঘকাল থেকে ভৌগোলিক কারণে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে ভিন্ন ভাষাভাষী জনসমাজের সঙ্গে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সংযোগসূত্র গড়ে ওঠেনি।

(দুই) শিক্ষার প্রসার এই উপভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীগুলিতে তেমন ঘটেনি। ফলে মাতৃভাষা ব্যতিরিক্ত অন্য কোনো ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা বা সুযোগ এক্ষেত্রে ছিল না।

(তিন) এই অঞ্চলটির রাজনৈতিক ইতিহাসের চরিত্র বঙ্গদেশের অপরাপর অঞ্চলের তুলনায়

---

(১) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ, ১৯৭৫, ভল্যুম - ১, পৃঃ ২১৮

স্বতন্ত্র। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে রাজনৈতিক পালাবদলের সূত্রে একাধিক বিদেশী শক্তি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। পক্ষান্তরে ভৌগোলিক কারণেই, এই অঞ্চলে একাধিকবার বৈদেশিক আক্রমণ সংঘটিত হলেও কোনো বিদেশী শক্তিই দীর্ঘকাল ধরে এখানে আধিপত্য করতে পারেনি। ফলতঃ সেই বিদেশী শক্তিগুলির দ্বারা বাহিত সংস্কৃতি ও ভাষা এই অঞ্চলের ভাষা এবং সংস্কৃতির উপরে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি

(চার) উনিশ শতকের বঙ্গদেশে কলকাতাকেন্দ্রিক যে নবজাগরণ সংঘটিত হয় তা বাংলা ভাষাকেও প্রভাবিত করেছিল। এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার এবং শক্তিমান লেখকদের সাহিত্য-চর্চার মাধ্যমে বিদেশী, বিশেষতঃ ইংরেজী ভাষা থেকে বিপুল পরিমাণে শব্দ গ্রহণ করে বাংলা শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, বাংলা শব্দের সীমানা সম্প্রসারিত হয়। বিশেষ করে এই সময়েই বাংলা ভাষায় ফারসীর আধিপত্য হ্রাস পেয়ে ইওরোপীয় ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উত্তর-বঙ্গের ক্ষেত্রে এই জাতীয় ঘটনা ঘটার কোনো সুযোগই ছিল না। কারণ এই সময়ের উত্তরবঙ্গ ছিল এই নবজাগরণের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরে।

সঙ্গত কারণে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় আরবী, ফারসী ইত্যাদি শব্দ কিছু পরিমাণে থাকলেও ইংরেজী বা অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষার শব্দের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এই কারণেই এই উপভাষায় সামগ্রিকভাবে বিদেশী শব্দের অনুপাত বাংলার তুলনায় কম।

নিম্নে পৃথক পৃথক তালিকায় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত বিদেশী শব্দের কিছু নমুনা দেওয়া হ'ল। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রেও বিপর্যস্ত বানানে শব্দসমূহের মূল উচ্চারণকে না ধরে, এই উপভাষার বাচকগোষ্ঠীর উচ্চারণকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

ফারসী

অন্দার্ - অন্তর, ভিতর

আইন্ - আইন

আইয়োত্ - প্রজা

আওয়াজ্ - শব্দ

আয় - রায়, বিচারকের সিদ্ধান্ত

আচার্ - আচার

আপ্সোস্ - অনুশোচনা

আবহাওয়া - আবহাওয়া

আবাদ্ - আবাদ

আব্রু - আবরণ, পর্দা

আন্দাজ - অনুমান

আম্দানি - আমদানী

আস্কারা - প্রশ্রয়

আস্মান্ - আকাশ

আসান্ - সাহায্য, সহজ, সমাধান

আরাম্ - আরাম

আস্তে - আস্তে

ইমানদার্ - সৎ

ইয়ার্ - বন্ধু

ইয়ার্কি - রসিকতা

উর্দ্দি - উর্দি

এলাকা - এলাকা

উকিলাতি - ওকালতি

ওয়াশিল্ - পরিশোধ

ওয়াদা - প্রতিশ্রুতি

ওস্তাদ্ - দক্ষ, শিক্ষক

কইতোর্ - কবুতর

কমবখ্তা - মূর্খ

কম্ - কম

কমোর্ - কোমর

কদু - লাউ

কশি - রেখা

কাজিয়া - কলহ

কারবার্ - ব্যবসা, কারবার

কারসাজি - ষড়যন্ত্র

কারোয়া - ঘটক

কাকা - কাকা

কাকি - কাকী

কামরা - ঘর

কামাই - কাজ, উপার্জন

কারখানা - কারখানা

কারচুপি - কারচুপি, গোপনীয়তা

কারদানি - কৌশল, অহঙ্কার

কুদরত্ - শক্তি

কুস্তি - কুস্তী, শারীরিক কসরৎ

কোতোয়াল - কোটাল, শান্তিরক্ষক

কোবা - [illegible] ছোট আকারের হাতুড়ি

খরিদ্ - ক্রয়

খরগোশ্ - খরগোশ

খরমুজা - খরবুজা, তরমুজ

খাকি - খাকি রং

খাজা - একপ্রকার মিষ্টি

খাতা - খাতা

খান্কি - বেশ্যা

খানা তল্লাশি - অনুসন্ধান

খামকা - অকারণে

খামখেয়াল - খামখেয়াল

খামার্ - খামার

খালি - খালি, শূন্য

খাল্ - চামড়া

খাস্তা - মুচমুচে, তাজা, মিষ্টি

খিদমত্ - পরিশ্রম, দয়া

খিদমতগার - পরিশ্রমী, দয়ালু

খির্ - দুধ

খুব্ - খুব

খুন্ - খুন, হত্যা, রক্ত

খুশ্কি - চুলকানি

খুশি - খুশী

খোদ্ - আসল, স্বয়ং

খোজা - নপুংসক

খোয়ার্ - খোয়াড়

খোদা - ভগবান

খোর্ - আসক্ত(তাড়িখোর)

খোরা - বাটি

খোরাক্ - খাবার, খাদ্য

খোশ্খবর্ - ভালো সংবাদ

খোশামোদ্ - অনুরোধ

গজ্ - গজ

গজা - এক প্রকার মিষ্টি

গন্জো - গঞ্জ

গন্জি - গেঞ্জী

গয়রোহ - সমস্ত

গরোম্ - গরম

গর্ - গড়

গর্দান্ - মাথা, ঘাড়

গুনাগার্ - দোষ, পাপ

গুম্ - গোপন, নিরুদ্দিষ্ট

গুড্ডি - ঘুড়ি

গুমার্ - অহঙ্কার, অভিমান, বাক্তিত্ব

গুজোব্ - গুজব, জনরব, মিথ্যা খবর

গুম্ড়া - গুম্ফা

গুজরান্ - অতিবাহন

গুলতানি - গালগল্প

গেরেপ্তার্ - গ্রেপ্তার

গোমোস্তা - গোমস্তা, বিশিষ্টকার্যে- মোটা লোক

গোয়েল্ - স্নান

গোয়েন্দা - গোয়েন্দা

গোর্ - সমাধি

গোনা - পাপ

গোস্তো - মাংস

চর্কা - চরকা

চর্কি - ঘূর্ণায়মান চক্র

চর্বি - চর্বি

চশোমখোর্ - চক্ষুলজ্জাহীন

চাকোর্ - চাকর

চাকিরি - চাকরি

চারাক্ - বাতি

চেহেরা - চেহারা

চোবোথা - চত্বর

চান্দা - চাঁদা

চাবুক্ - চাবুক

চালাক্ - চালাক

চালান্ - চালান

চিজ্ - জিনিস

চিনি - চিনি

খারাপ্ - বিনষ্ট

ছিনিয্ - কেড়ে

জখোম্ - আহত

জর্দা - জর্দা

জবান্ - কথা, প্রতিশ্রুতি

জবোর্ - শক্তিশালী

জবোর্দস্তো - ঐ

জমি - জমি

জমিদার্ - জমিদার

জরি - জরি

জল্দি - তাড়াতাড়ি

জহোর্ - বিষ

জাগা - জায়গা

জাগির্ - জায়গীর, জমিজমা

জাগির্দার্ - জায়গীরদার, জম…

জাস্তি - প্রচুর

জাদু - যাদুবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র

জান্ - প্রাণ

জানোয়ার্ - জানোয়ার

জামা - জামা

জাহাবাজ্ - ঝগড়াটে

জিন্ - কল্পিত অপদেবতা

জিরা - জিরে

জিলাপি - জিলিপি

জোত্ - জমিজমা

জোত্দার্ - জমিজমার মালিক

জেরা - প্রশ্নোত্তর

জোর্ - জোর, শক্তি

জোব্বা - একপ্রকার লম্বা জামা

জোয়ান্ - যুবক

জেয়াদা - প্রচুর

জিঞ্জিরি - শেকল

ঝিলি - ঝলক

ঝুটা - মিথ্যা, উচ্ছিষ্ট

টহল্ - ভ্রমণ

ডিল্ - মন, হৃদয়

ডেক্চি - বড় আকারের ধাতব পাত্র

তক্তা - তক্তা

তক্তি - তক্তার আকার বিশিষ্ট খাদ্য

তক্তাপোশ্ - তক্তপোষ

তর্জমা - অনুবাদ

তরমুজ্ - তরমুজ

তল্লাশ্ - অনুসন্ধান

তাও - তা, কাগজের সংখ্যা নির্দেশক

তাকত্ - শক্তি

তাগদা - তাগাদা

তাকিয়া - বালিশ

তাজ্ - মুকুট, চূড়া

তাজা - তাজা, সতেজ

তাজি - তেজী, দ্রুতগামী

তাবেদার্ - আজ্ঞাবহ

তার্ - তার

তালুক্ - গ্রাম, এলাকা

তালুক্দার্ - জমিদার

তির্ - তীর

তুখার্ - দক্ষ

তুষ্ - পশমের চাদর

তাব্ - তেজ

তোপ্ - তোপ, কামান

তোফা - সুন্দর

তোশোক্ - তোষক

দপ্তরাজি - দপ্তরী

দফা - সময়, বার, পর্যায়

দম্ - নিঃশ্বাস

দর্ - দাম

দরকার্ - প্রয়োজন

দরকারি - প্রয়োজনীয়

দর্খাস্তো - আবেদনপত্র

বেদম্ - একনাগাড়ে, প্রচণ্ড
বেনামি - নামহীন
বেপরোয়া - বেপরোয়া
বেকায়দা - অকারণ
বেফাস্ - গোপন
বেবাক্ - সমস্ত
বেমালুম্ - অজ্ঞাতসারে
বেমক্কা - অহেতুক
বেশরোম্ - নির্লজ্জ
বেশি - বেশী
বেহায়া - লজ্জাহীন, আত্মসম্মান বোধহীন
বেহিসাব্ - বেহিসাব
বেহিসাবি - বেহিসাবী
বেহুদা - বোকা, মূর্খ
বেহুঁশ্ - অজ্ঞান
মগোজ্ - মস্তিষ্ক
মজা - আনন্দ
মজুর্ - মজুর
মজুরি - পারিশ্রমিক
মর্দা - শক্তিশালী ও সাহসী পুরুষ
মর্দানি - সাহসী সুলভ আচরণ
মলোম্ - মলম
মলিদা - একপ্রকার পশমী কাপড়
মহোকুমা - মহকুমা
মন্ - চল্লিশ সেরের একক
মম্ - মোম
ময়দা - ময়দা
মহোল্লা - এলাকা, অংশ

মাহিনা - মাইনা, বেতন
মাত্ - চমৎকৃত, মোহিত
মানান্ - সৌকর্য
মাফ্ - মার্জনা
মামুলি - সাধারণ
মাল্ - জিনিসপত্র, মাল
মালিশ্ - মালিশ
মাশুল্ - মাশুল, দাম
মুদ্দাই - অভিযোগকারী, শত্রু
মুনাফা - লাভ
মুফত্ - বিনামূল্যের জিনিস
মুরগা - মোরগ
মুরগি - মুরগী
মুরাদ্ - সামর্থ্য
মুলতুবি - স্থগিত
মুশাবিদা - মুসাবিদা, পদ্ধতি
মেজাজি - মেজাজী
মেহনত্ - পরিশ্রম
মেহেরবানি - দয়া
মাহোতর্ - মেথর
মোকাবিলা - মোকাবিলা, সাক্ষাৎ
মোজা - মোজা
মোলাকাত্ - সাক্ষাৎ
মোহোর্ - মোহর, ছাপ
শকতো - শক্ত (?)
সওদা - ব্যবসা, ব্যবসার জিনিসপত্র
সওদাগর্ - ব্যবসায়ী
সোয়ার্ - সওয়ার, আরোহী

সোয়ারি – আরোহী
সতোরঞ্চি – সতরঞ্জি
সন্ – সন, বৎসর
সবাকতুতো – সবাক্ত
সব্জি – সবজী
সরকার্ – সরকার
সরকারি – সরকারী
সর্দার্ – সর্দার, দলপতি
সরোম্ – লজ্জা
সরবোত্ – সরবৎ
সহোর্ – শহর
শাদি – মুসলমানী মতে বিবাহ
শামকি – বালা
শাবাশ্ – প্রশংসাসূচক অব্যয়
সাল্ – বৎসর
শাল্ – পশমী চাদর
সায় – সম্মতি
সায়বানা – সামিয়ানা
সায়েস্তা – ধরা, জব্দ
সাজা – শাস্তি
সাকরেদ্ – শিষ্য, অনুচর
সানাই – সানাই
সাদা – সাদা
সাফ্ – সাফ, পরিষ্কার
সাফাই – সাফাই, পরিষ্কার করার কাজ
শিকার্ – শিকার
শিকারি – শিকারী
শিমুনি – একপ্রকার সিন্নি

সিসি – শিশি
সেনদুক্ – সিন্দুক
হুশার্ – সাবধান
হুশারি – সাবধানতা, গণনা
সোর্ – গণ্ডগোল
সোর্‌গোল্ – ঐ
সৌখিন্ – সৌখীন
হজোম্ – হজম
হপ্তা – সপ্তাহ (?)
হর্দম্ – সর্বদা
হরেক্ – নানা প্রকার
হল্লা – গোলমাল
হাজার্ – হাজার
হাজি – মুসলমান ধর্মীয় শিরক
হাজোত্ – হাজত
হাঙ্গামা – গোলমাল
হামলা – আক্রমণ
হামেশা – সর্বদা
হামেহাল্ – ঐ
হালাল্ – পবিত্র
হিকিমত্ – পরামর্শ
হামু – হামান দিস্তা
হিস্‌সা – ভাগ
হুকা – হুঁকা
হুশ্ – জ্ঞান, চেতনা
হুশিয়ার্ – সাবধান
হাওয়ালদার্ – দলপতি
হুশিয়ারি – সতর্কবাণী

আরবী

অছিলা - ছল

অজুহাত্ - কারণ

আক্কেল্ - জ্ঞান

আউলিয়া - উদাসীন মুসলমান ফকির

আখের্ - ভবিষ্যত

আজি রাজী

আজোব্ - আশ্চর্য

আতোর্ - আতর

আদায় - আদায়

আদালত্ - আদালত

আদোত্ - স্বাভাবিক

আদোব্ - কায়দা

আদোল্ - গড়ন, আকৃতি

আবির্ - আবির(?)

আমলা - উচ্চপর্যায়ের কর্মচারী

আমিন্ - ভূমি রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী

আমানত্ - জমা

আশিক্ - আশিক

আর্জি - আবেদন

আলাহিদা - আলাদা, পৃথক

আলোয়ান্ - গায়ের চাদর

আসামি - আসামী, অভিযুক্ত ব্যক্তি

আসোল্ - আসল

আহামমোক্ - মূর্খ

ইজ্জোত্ - সম্মান

ইজারা - ইজারা

ইনাম্ - পুরস্কার

ইমান্ - বিশ্বাস

ইমান্দার্ - বিশ্বাসী

ইশারা - ইশারা, ইঙ্গিত

ইস্তামি - রসিকতা

ইস্তফা - স্থগিত, বন্ধ

উকিল্ - আইনব্যবসায়ী

উজু - হাত পা ধোয়া

উমের্ - বয়স

উসুল্ - পরিশোধ

এজমালি - সার্বজনীন

এজলাস্ - বিচারালয়

এজাহার্ - পুলিশের সামনে ঘোষণা

এলাকা - এলাকা

এলাহি - বিপুল

ওজোন্ - ওজন

ওয়ারিশ্ - উত্তরাধিকারী

কদোম্ - পদক্ষেপ

কবজা - কব্জা

কবজি - কব্জী

কবোর্ - কবর, সমাধি

কবোলা - জমি বিক্রির অঙ্গীকারপত্র

কবুল্ - স্বীকৃতি, স্বীকারোক্তি

কয়াল্ - যে ব্যক্তি ওজন করে

কয়েদি - কয়েদী

করার্ - চুক্তি, প্রতিশ্রুতি

করোজ্ - ধার, ঋণ

কলোম্ - কলম

কসোম্ - প্রতিজ্ঞা

কলোপ্ - রঙ

কসোর্ - শক্ত

কসাই - কসাই, মাংস বিক্রেতা

কসুর্ - দোষ

কাগোজ্ - কাগজ

কাজি - বিচারক

কানুন্ - আইন

কায়দা - কায়দা, কৌশল

কাবার্ - শেষ

কামিজ্ - জামা

কাহিল্ - দুর্বল

কিচ্ছা - কাহিনী

কিস্তি - পর্যায়

কেতা - চলচলন

কেতাব্ - বই

কেরামতি - কৃতিত্ব, বাহাদুরি

কেল্লা - কেল্লা, দুর্গ

কৈফিয়োত্ - কৈফিয়ত

কোরবানি - বলি

কোরোক্ - ক্রোক

খত্ - প্রতিজ্ঞাপত্র

খতোম্ - শেষ

খবোর্ - খবর

খয়রাত্ - দান

খাজনা - খাজনা

খাতির্ - সমাদর

খাতিরজমা - নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ

খাস্ - খাস

খারাপ্ - খারাপ

খারিজ্ - মুক্ত, শেষ, মীমাংসা

খালাস্ - মুক্তি

খালি - শূন্য, অহেতুক

খাস্ - আসল, একান্ত

খাসা - সুন্দর

খেতাব্ - সম্মান

খেলাপ্ - অবমাননা

খোশামোদ্ - তোষামোদ, স্তুতিগান

খোলসা - খোলামেলা, পরিষ্কার

গজোব্ - বিপদ, রাগ

গরিব্ - গরীব

গলোদ্ - ভুল ভ্রান্তি

গাইব্ - গায়েব, লুকনো

গাফিলতি - অবহেলা

গিলাফ্ - চাদর, বালিশের ঢাকনি

গোলাম্ - চাকর

গোলামি - চাকরি

গোস্সা - রাগ, অভিমান

ছবি - ছবি

জখ্মো - ক্ষত

জবাই - শিরশ্ছেদ, হত্যা

জবাব্ - উত্তর

জমা - জমা

জরুর্ - জরুরী

জল্লাদ্ - ঘাতক

জলুষ্ - জৌলুস

নাগাদ্‌ - নাগাদ
নাজির্‌ - নাজির, রাজকর্মচারী
নাজেহাল্‌ - পর্যুদস্ত
নালা - নুবালা
লায়েক্‌ - যোগ্য
নিশা - নেশা
নিকা - মুসলমান মতে বিবাহ
নেহাত্‌ - নিতান্তই
ন্যাপ্‌ - লেপ
নোক্‌সান্‌ - লোকসান
থাক্‌ - স্তর, সোপান
ফইজ্‌হাত্‌ - দুঃখ কষ্ট
ফকির্‌ - ফকির, মুসলমান সন্ন্যাসী
ফতুর্‌ - সর্বস্বান্ত
ফতুয়া - একপ্রকার খাটো জামা
ফতে - শেষ, জয়
ফতোয়া - আদেশ
ফল্না - অমুক
ফয়সালা - মীমাংসা, সমাধান
ফসোল্‌ - ফসল
ফারাক্‌ - দূরত্ব
ফুস্‌ - স্মৃতি
ফাক্‌ - দূরত্ব
ফাকি - ফাঁকি
ফাজিল্‌ - অপ্রয়োজনীয়
ফৌজ্‌ - সৈন্য
ফৌজ্‌দার্‌ - সেনাধ্যক্ষ
বদোল্‌ - বদল, পরিবর্তন

বরাত্‌ - প্রয়োজন
বরাত্‌ - ভাগ্য (?)
বাকি - বাকি
বাজে - অপ্রয়োজনীয়
বাজেয়াপ্‌তো - বাজেয়াপ্ত
বাদ্‌ - বাদে
বাব্‌ - জন্য
বিল্‌কুল্‌ - সমস্ত
ব্যাপারি - ব্যবসা
মওকা - সুযোগ
মক্কেল - মক্কেল
মজবুত্‌ - মজবুত
মজ্‌লিশ্‌ - মজলিশ, আসর
মজুত্‌ - মজুদ, সংগ্রহ এবং জমা
ময়দান্‌ - মাঠ
মদোত্‌ - সাহায্য, সাহস
মর্জি - ইচ্ছা
মশাল্‌ - মশাল
মশাল্‌চি - মশালবাহক
মশগুল্‌ - বিভোর
মশ্‌লা - মশলা
মহাল্‌ - মহল
মাম্‌লা - মামলা
মারফত্‌ - মারফত
মালিক্‌ - মালিক
মালুম্‌ - স্মরণ
মেজাজ্‌ - মেজাজ
মেরামত্‌ - মেরামত

মেয়াদ্ - সময়সীমা
মুলুক্ - দেশ, স্থান
মুনাফা - মুনাফা, লাভ
মুশকিল্ - মুশকিল
মুসাফির্ - পথিক
মুহুরি - মুহুরি, দলিললেখক
মোকাম্ - বাসস্থান বা কর্মস্থান
মোক্তার্ - মোক্তার, আইনজীবি
মোতাবেক্ - অনুসারে
মোতায়েন্ - নিযুক্ত
মোল্লা - মুসলমান পুরোহিত
মোলায়েম্ - নরম
মৌজ্ - আনন্দ
মৌজা - জমির এলাকা
সই - স্বাক্ষর
সখ্ - শখ
সপ্ - একপ্রকার মাদুর
সয়তান্ - শয়তান
সয়তানি - শয়তানী
সরাব্ - মদ
সরিক্ - অংশীদার
সাকিন্ - ঠিকানা, বাসস্থান
সাবেক্ - পুরাতন
সাবেকি - পুরাতনী
সাবুদ্ - সাক্ষী
সালাম্ - অভিবাদন
সৈলতা - সলতে
হক্ - যথার্থ
হদ্ - সীমারেখা
হয়রান্ - হয়রান, ক্লান্ত
হাইল্ - হাল
হাউস্ - ইচ্ছা, সাধ
হাওই - হাউই, বাজি
হাওয়া - বাতাস
হাওলাত্ - ধার, ঋণ
হাকিম্ - বিচারক
হাজির্ - উপস্থিত
হাজিরা - উপস্থিতি
হাজামত্ - নাপিত
হারাম্ - খারাপ
হারামজাদা - বদ লোক বা বদ লোকের সন্তান
হারামি - বদ লোক
হাল্ - অবস্থা, হাল
হাল্ - বর্তমান
হালি - বর্তমানের
হালচাল্ - অবস্থা, পরিস্থিতি
হাল্লাক্ - লোলুপ, উদগ্রীব
হালাল্ - পবিত্র, শাস্ত্রসম্মত
হিম্মত্ - সাহস
হিসাব্ - হিসাব
হুকুম্ - আদেশ
হুকুমনামা - আদেশপত্র
হুজুর্ - মনিব, হুজুর
হুবহু - অবিকল
হুরি - হুরী, পরী
হেফাজত্ - দায়িত্ব

পর্তুগীজ

আচার্ - আচার

আলক্যাত্রেতরা - আলকাতরা

আল্পিন্ - আলপিন

আয়া - আয়া, ধাত্রী

ইস্পাত্ - ইস্পাত লোহা

আল্মারি - আলমারি

আনারস্ - আনারস

বাল্টিও - বালতি

বোতাম্ - বোতাম

বাসোন্ - বাসন

কামিজ্ - জামা

ক্যারানি - কেরানি

চাবি - চাবি

কপি - কপি

ফিতা - ফিতা

কাল্তু - কালতু, অর্থহীন

গাম্লা - গামলা

জান্লা - জানলা

টুপি - টুপি

নিলাম্ - নীলাম

গুদাম্ - গুদাম

মার্কা - মার্কা

মশ্করা - রসিকতা

মিস্তিরি - মিস্ত্রী, ছুতার

বয়াম্ - বোয়েম

পাওরুটি - পাঁউরুটি

পাইপা - পেঁপে

পাচার্ - পাচার, অপসারণ

পাস্তুল্ - পাস্তুল

পাপু - পাপু

পায়া - পায়া

সাবোন্ - সাবান

পেয়ারা - পেয়ারা

পিপা - পিপে

তাম্বু - তামাক

বেহালা - বেহালা

আতা - আতা

তুর্কী

উজবুক্ - মূর্খ

আলখাল্লা - একপ্রকার লম্বা জামা

কাচি - কাঁচি

কালিয়া - কালিয়া

কুলি - কুলি, মালবাহক

চাকু - চাকু

চাবুক্ - চাবুক

চিক্ - পর্দা

বুচকুলখা - লিখিত প্রতিশ্রুতি

তোপ্ - তোপ

বোড্- বোর্ড
ঘিচিঙ্- ঘিচিং
নটারি - নটারি
লেকচার্- লেকচার্
চাচ্- চার্চ্
টিল্- স্টীল্
টাহোন্- টাউন্
টায়ার্- ট্যায়ার্
টিউ- টিউব্
টিফিন্- টিফিন্
রিপুজি - রিফিউজি
ল্যানটেঙ্- লেন্ঠার্ন
পাট্- পার্ট
পিন্- পিন্
বাল্লি - বার্লি
বেডিঙ্- বেডিং
ব্যাগ্- ব্যাগ্
বিলডিঙ্- বিলডিং
বুট্- বুট্
ব্যাটোন্- ব্যাটন্
ম্যাচ্- ম্যাচ্
পোস্টাফিস্- পোস্ট অফিস্
ছাইচ্- সাইজ্
সোটা - সোডা
পাসপোট্- পাসপোর্ট
স্যানডেল্- স্যান্ডেল্
মেশিন্- মেশিন্
ডাইভার্- ড্রাইভার্

বোড়ো

আউ আউ - শিশুদের বাধা দেওয়ার শব্দ
আয়লা-অয়লা - দুর্বল(পুং)
আয়লা-অইলি - ঐ (স্ত্রী)
বাকচুলা - উদরাময় রোগ
ব্যাঙা - কানা
বোকালি - শিশুর স্তন্যদানকারিণী
বাদা - গুচ্ছ (?)
বোকোলা - পোঁটলা
পাঠা - পাঁঠা, পুং ছাগল
পাঠি - স্ত্রী ছাগল
মোন্দা - পুং বিড়াল
মুনদি - স্ত্রী বিড়াল
ডাকা - ডেলা, খণ্ড, পিণ্ড
ডাকলা - ঐ
দলাঙ্- সেতু
দাহলা - বাহু(?)
চেমনি - একপ্রকার টক্ স্বাদযুক্ত শাক
ডিগ্রাঙ্- অবলম্বহীন
ডাবড়ি - মাঠ
গাসেরা - ঘৃণ্য স্বভাবের পুরুষ
গেসিরি - ঐ (স্ত্রীলোক)
হাবাঙ্- বোকা (পুং)
হাবাঙি - ঐ (স্ত্রী)
হাওরা - যাত্রার ছাউনি বা তাঁবু
হাকা - বন বিড়াল
ফেকরি - মাছ ধরার একপ্রকার যন্ত্র
খামফুলাই - সিঁড়ি

কুমিয়ার্ - বাঘ

খান্ডি - বিড়াল

ওদোলা - অকর্মণ্য পুরুষ

উদুলি - অকর্মণ্য স্ত্রীলোক

অবন্ধালু - আদরণীয় (সম্বোধনে)

পাকড়া চিকড়া - চিত্র বিচিত্র

পাছড়া - উর্দ্ধাঙ্গের কাপড়

সাবন্ধলা - প্রস্তুত করা

বুরি - বাঁশের চোঙা

উয়া - ঘরের অংশবিশেষ

উকুন্দি - বন্ধ্যা

জাথ্বোই - ছোট বাঁধ

গিদ্রি - গৃহকর্তা, মালিক

কোচ-রাভা

আঙ্লাঙ্ - এলোমেলো, দ্বিধা

কান্নি - বাখারি

গাম্ - মুণ্ড

গাবার্ - প্রান্তভাগ

হাম্ - উদুখল

গাইন্ - উদুখল দণ্ড

খামিলা - কাঁথা

খামেলা - ঐ

দোমোর্ মোমোর্ - ইতঃস্তত ভাব

ব্যাদা - শস্যক্ষেত্রের আগাছা পরিষ্কার করার যন্ত্র

বুরুঙ্ - বাঁশের তৈরী মাছ ধরার যন্ত্র

গোবড়া - হাতের তালু দিয়ে বধা

চরু - জানু

চাঙ্রা - বক্র, বাঁকা

ছিল্ছিনা - বগুল

জাক্রা - একপ্রকার বাঁশের সাহায্যে তৈরী মই

জাবুরা - আবর্জনা

জাঙ্জাবুরা - ঐ

টুটি - গলা(?)

টাঙোর্ - বিবস্ত্র

টাঙোয়া - পুগলি

দোন্ - গর্ত

জাঙ্গেয়াই - বগলতলা

বায় - বন্ধু বা দেবতা

বাদেলেঙ্ - জলজোঁক

তুতি - বিচুলির তৈরী আগুন জ্বালিয়ে রাখার সরঞ্জাম

হাউরিয়া - দুর্বিনীত

গুড্রি - চুলকানি(?)

তাটোক্ - ঢেঁকী

টোপরা - পোটলা

হাঙ্রাঙা - শীতল

বভোর্ - কচু

গাতি - প্রান্তভাগ

খ্যাঙ - সঙ্কুচিত

উপসংহার

(১) বাংলা উপভাষাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের উপভাষার বিশিষ্টতা

উত্তরবঙ্গের উপভাষার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এর ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব এবং পদবিন্যাসরীতির আলোচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। বাংলার অন্যান্য উপভাষাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

ধ্বনিগত স্বাতন্ত্র্য

(ক) স্বরধ্বনির বিবর্তনে বঙ্গালী অপিনিহিতি এবং রাঢ়ী অভিশ্রুতির স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সীমিত সংখ্যক ক্ষেত্রে অপিনিহিতি ঘটলেও তা এই উপভাষার নিয়মিত ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য নয়। অভিশ্রুতিও এই উপভাষায় ঘটে না। অর্থাৎ পূর্বস্তরের স্বরধ্বনিসমূহ এই উপভাষায় অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছে। যেমন- সংস্কৃত কল্য   প্রাকৃত কল্লিং   প্রাচীন ও মধ্যবাংলা কালি   বঙ্গালী কাইল   রাঢ়ী কাল, কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কালি।

(খ) /র/ এবং /ল/ রাঢ়ী ও বঙ্গালীতে আদ্য ব্যঞ্জন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই ব্যঞ্জন দু'টি অস্থায়ী। এক্ষেত্রে /র/-এর স্থানে স্বরধ্বনি এবং /ল/-এর স্থানে /ন/-এর প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন -

রাঢ়ী ও বঙ্গালী	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
রূপ	অপ্
লজ্জা	নইজ্জা ইত্যাদি।

(গ) রাঢ়ী এবং বঙ্গালীতে একক ব্যঞ্জন হিসেবে /স/-এর ব্যবহার আছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় একক ব্যঞ্জন হিসেবে এই ধ্বনিটির ব্যবহার নেই। এক্ষেত্রে এই ধ্বনিটি কোনো দন্ত্য ব্যঞ্জনকে দ্বিতীয় ব্যঞ্জন হিসেবে রেখে যুক্তব্যঞ্জন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

রাঢ়ী ও বঙ্গালী	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
সকাল	শাকাল্
রূপ	অপ্ ইত্যাদি।

(ঘ) রাঢ়ীতে /র/ এবং /ড়/ এই দুটি ধ্বনিরই ব্যবহার আছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় /ড়/-এর ব্যবহার নেই, কেবলমাত্র /র/-এর ব্যবহার আছে। যেমন-

রাঢ়ী	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
বাড়ি	বারি
বড়	বরো ইত্যাদি।

রূপগত স্বাতন্ত্র্য

(ক) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত বিভক্তিসমূহ রাঢ়ী এবং বঙ্গালী অপেক্ষা স্বতন্ত্র। রাঢ়ী এবং বঙ্গালিতে গৌণকর্ম এবং সম্প্রদানের বিভক্তি হ'ল 'কে'। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তা 'ক'। রাঢ়ী এবং বঙ্গালিতে অধিকরণ কারকে প্রযুক্ত বিভক্তিগুলি হ'ল 'এ', 'তে', 'য়' ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় অধিকরণে 'ত' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন-

	রাঢ়ী ও বঙ্গালী	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
গৌণকর্ম -	তোমাকে	তোমাক,
সম্প্রদান -	গরীবকে	গরিবোক,
অধিকরণ -	ঘরে	ঘরোত, ইত্যাদি।

(খ) রাঢ়ী এবং বঙ্গালিতে ক্রিয়াপদে বহুবচন নেই। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বচন ভেদে ক্রিয়াপদের রূপে পার্থক্য ঘটে। যেমন-

	রাঢ়ী ও বঙ্গালী	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
একবচন-	আমি যাই	মুই জাও,
বহুবচন -	আমরা যাই	হামরা যাই ইত্যাদি।

পদবিন্যাসরীতির স্বাতন্ত্র্য

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যগঠনে নঞর্থক অব্যয় 'না' ক্রিয়ার আগে বসে। কিন্তু রাঢ়ী এবং বঙ্গালিতে তা ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন-

রাঢ়ী ও বঙ্গালী	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
আমি যাব না	মুই না জাইম,
আমি যাই না	মুই না যাও, ইত্যাদি।

এই বিষয়গুলিতে রাঢ়ী ও বঙ্গালীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষার আর কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।

বাংলার অন্যান্য উপভাষার সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষার যে সমস্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উপরে প্রদর্শিত হ'ল বলাই বাহুল্য, সেগুলি প্রাচীন ও মধ্যবাংলা স্তরের বৈশিষ্ট্য। সময়োপযোগী পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য উপভাষায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি আর বজায় নেই। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি সজীব ভাবে বর্তমান। সুতরাং একথা অতঃপর নিঃসংশয়িত ভাবে বলা যেতে পারে যে বাংলার অন্যান্য উপভাষাগুলির তুলনায় উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাংলার প্রাচীন বৈশিষ্ট্যসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে সংরক্ষিত। এই প্রাচীনত্বই অন্যান্য উপভাষার তুলনায় এই উপভাষার বিশিষ্টতার মূল সূত্র। এদিক থেকে বিচার করলে বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই উপভাষার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

বাচক সংখ্যা এবং ভৌগোলিক পরিসীমার দিক থেকেও এই উপভাষা বাংলা উপভাষাসমূহের পরিমণ্ডলে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলাদেশে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দার্জিলিং, অখণ্ড দিনাজপুর, মালদা, বগুড়া এবং রাজশাহী জেলার কিছু অংশ মিলিয়ে বাংলাদেশের একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা ছিল এই উপভাষা। বাংলাদেশের বাইরে আসামের গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার কিছু অংশে, নেপালের ঝাপা জেলার কিছু অংশে এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশেও এই উপভাষা প্রচলিত। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে দেশবিভাগের ফলে বাংলাদেশের এই উপভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলের কিছু অংশ উত্তরবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে এই উপভাষাভাষী অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিসীমা কিছুটা কমে গিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা-পূর্ব কালের হিসেবে এই উপভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিসীমা নিতান্ত ছোট ছিল না।

স্বাধীনতা-পূর্ব কালে আসাম, বিহার এবং বাংলাদেশের উল্লিখিত অঞ্চলগুলি মিলিয়ে এই উপভাষার বাচক গোষ্ঠীর একটি মাত্র অংশ – রাজবংশী সমাজের জনসংখ্যাই ছিল দশ লক্ষের কাছে। এই উপভাষাভাষী অপরাপর সম্প্রদায়গুলিকে ধরলে, অনুমান করা যেতে পারে যে সেই সময়ে এই উপভাষার বাচকসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী কালে দেশবিভাগ জনিত কারণে এই উপভাষার বাচক সংখ্যা কমে যায়। কারণ দেশবিভাগের ফলে এই উপভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলের একটি বড় অংশ যেমন তদানীন্তন পাকিস্তানের ভাগে চলে যায় তেমনি এই উপভাষার বাচক গোষ্ঠীর একটি বড় অংশও বর্তমান উত্তরবঙ্গের বাচকগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে এই উপভাষার বর্তমান বাচক সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেনসাস রিপোর্ট অনুসারে এই উপভাষাভাষী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একমাত্র রাজবংশী সমাজের জনসংখ্যাই হ'ল ৮৯৮১১৯।[১] মুসলমান সহ এই উপভাষাভাষী অন্যান্য সম্প্রদায়গুলিকে ধরলে এই সংখ্যা কিছুটা বেশী হবে। এছাড়া ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব জনিত কারণে বহু সংখ্যক রাজবংশী হিন্দু প্রথমে শরনার্থী হিসেবে উত্তরবঙ্গে চলে আসে এবং পরবর্তীকালে তাদের অনেকেই উত্তরবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হয়। এই হিন্দু উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর এবং বগুড়া জেলা থেকে এসেছে তাদের ভাষা উত্তরবঙ্গের উপভাষার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। অধিকন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা থেকে যে সমস্ত বাঙালী-বঙ্গালীভাষী উদ্বাস্তু দেশবিভাগের অব্যবহিত পরবর্তী কালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জনিত কারণে, এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব জনিত কারণে উত্তরবঙ্গে চলে এসেছে তাদের একটি বড় অংশ এই অঞ্চলের ভাষা এবং সংস্কৃতিকে ক্রমশঃ গ্রহণ করে চলেছে। বর্তমানে একান্ত নিরস্ত

---

(১) সেনসাস রিপোর্ট অব ইণ্ডিয়া, ১৯৬১, ওয়েষ্ট বেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম, পার্ট -৫-এ(১), স্পেশাল টেবল অন সিডিউলড্ কাষ্ট।

পারিবারিক এবং সামাজিক পরিমণ্ডলের বাইরে বাঙালিভাষী এই সব মানুষ যে উত্তরবঙ্গের উপভাষা ব্যবহার করে একথা বর্তমান নিবন্ধের ভূমিকা অংশে পূর্বেই বলা হয়েছে। সুতরাং ভাষাগত দিক থেকে এদেরও উত্তরবঙ্গের উপভাষাভাষী বাচকগোষ্ঠীর পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এই ভাবে হিসেব করলে দেখা যায় যে উত্তরবঙ্গের ২০৫ ৩ বর্গ কিলোমিটার সহ রাজ্যের ৬৮৩৩৬০ অধিবাসীকে বাদ দিলে এই উপভাষা উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা।

বাংলার অন্যান্য উপভাষার তুলনায় এই উপভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। এই উপভাষা সুপ্রাচীন কাল থেকে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাই শুধু নয়, কোচবিহার রাজবংশের অন্যতম রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে এই উপভাষা কামতারাজ্যের রাজভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২] এই রাজভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হ'ল ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ কর্তৃক তৎকালীন অহোম রাজকে লিখিত একখানি চিঠি। এই চিঠির ভাষা উত্তরবঙ্গের উপভাষারই ঈষৎ মার্জিত রূপ মাত্র। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা এই চিঠিখানির ভাষাকে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৩] শুধু এই চিঠিখানিই নয়, কামতারাজ্যের অধিকাংশ রাজকীয় চিঠিপত্র এই উপভাষাতেই লেখা হত।

ব্যবহারিক চিঠিপত্র ছাড়াও কোচবিহার রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় এই উপভাষায় সাহিত্য চর্চার সূত্রপাতও ঘটেছিল। কোচবিহার রাজসভার আনুকূল্যে তৎকালীন উত্তরবঙ্গের একাধিক [illegible] কবি মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদির অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদক কবিদের মধ্যে কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ এবং কবি দ্বিজ কবিরাজের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহাভারতের আদিপর্ব, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর এবং দ্রোণপর্বের অনুবাদ করেন। প্রায় সমসাময়িক কালেই কবি দ্বিজ কবিরাজ উদ্যোগ, দ্রোণ এবং গদা (সৌপ্তিক), মহাভারতের এই তিনটি পর্বের অনুবাদ করেন। অনুবাদকর্ম ছাড়াও মৌলিক সাহিত্য রচনার চেষ্টা এই রাজসভার আনুকূল্যে হয়েছিল। কোচবিহার রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এই রাজসভায় অনেক কবি বংশাবলী, নাটগীত, পদাবলী এবং মঙ্গলকাব্য ইত্যাদিও রচনা করেছিলেন। এইভাবে উত্তরবঙ্গীয় উপভাষায় সাহিত্য চর্চার একটি ঐতিহ্য কোচবিহার রাজবংশের পৃষ্ঠপোষণায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্যের পররাষ্ট্রনীতিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ঘটে এবং সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে আত্মরক্ষায় অক্ষম [illegible] স্বাধীন রাজ্য কোচবিহার কালক্রমে ভারতের অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের মত

---

(২) দাস নির্মল, উত্তরবঙ্গের উপভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব, মধুপর্ণী, বালুরঘাট, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা

(৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৭৯

যেতে পারে যে পরিবর্তমান সময় এবং বাচক সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্ষেত্র হিসেবে এই উপভাষার এই জাতীয় রূপান্তর এর কালোপযোগী পরিবর্তনেরই একটি ইঙ্গিত।

আবার এই উপভাষার বাচক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান মানুষের একটি অংশের ব্যতিক্রমী একটি প্রবণতাও সেই সঙ্গে লক্ষ্য করার মত। নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি গভীর আগ্রহ এবং মমত্ববোধ সম্পন্ন এই অংশের মানুষেরা সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের উপভাষার সংরক্ষণ এবং প্রসারে চেষ্টাশীল হয়ে উঠেছেন। লিখিত সাহিত্যের ভাষা হিসেবে এই উপভাষার ব্যবহারে আগ্রহ সঞ্চারের কাজে এঁরা ইতোমধ্যেই নেমে পড়েছেন। এই আগ্রহের ফলশ্রুতিতে এই উপভাষায়, বিগত দুই দশকের মধ্যে রচিত হয়েছে দুখানি কাব্যগ্রন্থ ('অললই বললই মাদারের ফুল'-তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি, 'দোতোরিয়ার বাঁশী' - গোকুল রায়, জলপাইগুড়ি) এবং দুখানি উপন্যাস ('ভকোল' - বীরেন রায়, পশ্চিম দিনাজপুর, 'সতী দুখীতি' - গোকুল রায়, জলপাইগুড়ি)। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে একটি প্রবাদের সংকলন ('রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ, প্রবচন ও হেঁয়ালী' - উপেন্দ্র নাথ বর্মণ), একটি গ্রাম্য ছড়ার সংকলন ('ভোকাতুর ছড়া' - সুনীল পাল, জলপাইগুড়ি), দুই খণ্ডে সমাপ্ত একটি পল্লীগীতির সংকলনগ্রন্থ ('উত্তর বাংলার পল্লীগীতি' - হরিশ্চন্দ্র পাল, কোচবিহার) এবং এই উপভাষার একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান ('রাজবংশী অভিধান' - কলীন্দ্র নাথ বর্মণ, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং)। কয়েকটি স্বল্পায়ু সাহিত্য ত্রৈমাসিকও ('দোহাতি' - সম্পাদক-রাজমোহন রায়, ময়নাগুড়ি, 'দোহাতিয়া তারা' - সম্পাদক -নগেন্দ্র নাথ রায়, শিলিগুড়ি, 'দুবালী'- সম্পাদক - বীরেন্দ্র নাথ বর্মণ, শিলিগুড়ি) এই উপভাষায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরে সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেছে। এর বাইরে উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্রপত্রিকায় এই উপভাষায় গল্প, কবিতা ইত্যাদির চর্চাও ক্রমশঃ একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিক ভাবে এই সমস্ত প্রচেষ্টার সাহিত্যিক বা মৌলিক মূল্য যা-ই হোক না কেন এই উপভাষার সংরক্ষণ এবং প্রসারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে এই সমস্ত রচনা বা সংকলন এবং এগুলির রচয়িতা বা সংকলনকর্তারা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

পরিমাণগত দিক থেকে খুব সামান্য হলেও এই উপভাষার প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে সরকারী আনুকূল্যের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। আকাশবাণী শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত ভাবে এই উপভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করে সরকারী পর্যায়ে সাহায্য দানের চেষ্টা চলছে।

এই উপভাষার সংরক্ষণ এবং প্রসারের প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত শিল্পীদের অবদানের কথাও এখানে স্মরণযোগ্য। উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের খ্যাতনামা শিল্পী আব্বাস উদ্দিন আহমদ

(জন্ম – ২৭ শে অক্টোবর, ১৯০১, বলরামপুর, কোচবিহার, মৃত্যু – ৩০ শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯, পুরানা পল্টন, ঢাকা) থেকে শুরু করে একেবারে সাম্প্রতিক কালের শিল্পী গঙ্গাচরণ বিশ্বাস, দময়ন্তী বর্মণ, আয়েশা সরকার পর্যন্ত আজ অবধি এই উপভাষায় রচিত যতগুলি পল্লীগীতির রেকর্ড করেছেন, তা সংখ্যায় হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। এছাড়াও এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ প্রয়াত হরিশ্চন্দ্র পালের সম্পাদনা এবং পরিচালনায় দুটি পল্লীনাটিকা 'কমলি মানাই' এবং 'বিষহরা'-এর রেকর্ডও প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এই সমস্ত প্রচেষ্টার একটি ব্যবসায়িক দিকও আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলা যায় যে এই রেকর্ডগুলি শুধু শিল্পী তথা রেকর্ড কোম্পানীর ব্যবসায়িক প্রয়োজনকেই সিদ্ধ করেনি, সমগ্র বঙ্গদেশের লোকসংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে এই উপভাষার পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রেও এগুলি অব্যর্থ সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। অধিকন্তু এই উপভাষার একটি বিশেষ কালের পরিচয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কালের জন্য এই রেকর্ডগুলিতে মুদ্রিত হয়ে থাকবে। সেই হিসেবে এগুলিকে এই উপভাষার ভবিষ্যতের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

সমস্ত আলোচনার উপসংহারে একথাই বলা যেতে পারে যে স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েক দশক ধরে উত্তরবঙ্গে শিক্ষার বিস্তার যেভাবে ঘটেছে এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উত্তরবঙ্গের উপভাষাভাষী মানুষ যেভাবে শিষ্ট বাংলাকে ক্রমাগত আত্মস্থ করে চলেছে তাতে কয়েক প্রজন্মের মধ্যে এই সমৃদ্ধ উপভাষার ব্যবহারক্ষেত্র সঙ্কুচিত হতে হতে তা অন্তঃপুরবাসীদের ভাষায় পরিণত হবে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এই উপভাষার বাচকগোষ্ঠীর একটি অংশ যেভাবে নিজেদের ভাষার সংরক্ষণ, প্রসার এবং ব্যাপক চর্চার প্রেরণা সঞ্চারের কাজে উদ্যমী হয়ে উঠেছেন এবং এই উদ্যমের কল্যাণে সরকারী ও বেসরকারী, ব্যক্তিগত এবং যৌথ উদ্যোগের যে সমস্ত নজির ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে, তা দেখে মনে হয় যে এই উপভাষা এর আপাত অনিবার্য পরিণামের হাত থেকে মুক্ত হতে পেরে যাবে। একটি বৃহৎ অঞ্চলের এই ঐতিহ্যশালী উপভাষার সংরক্ষণ এবং প্রসারের প্রচেষ্টায় নতুন মাত্রা যোজনার দায়িত্ব একটি সম্মিলিত দায়িত্ব। নিরক্ষর পল্লীবাসী মানুষ থেকে শুরু করে সাহিত্যকর্মী, গবেষক, সকলেই এই দায়িত্বের শরিক।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) অসমীয়া ব্যাকরণ আৰু ভাষাতত্ত্ব : কালিরাম মেধি, গৌহাটি, ১৯৭৮

(২) আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪

(৩) উত্তরবঙ্গের ইতিহাস : সুকুমার দাস, কলকাতা, ১৯৮২

(৪) কামৰূপৰ বুৰঞ্জী : সূর্য কুমার ভুঞা, গৌহাটি, ১৯৫৮

(৫) কালিকাপুরাণম্ : নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

(৬) কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খণ্ড) : খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহার, ১৯৩৬

(৭) কোচ-রাজবংশী জাতির ইতিহাস আরু সংস্কৃতি : অম্বিকাচরণ সরকার, গোসাইগাঁও, আসাম, ১৯৬৯

(৮) গৌড় রাজমালা : রমাপ্রসাদ চন্দ, রাজসাহী, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

(৯) চর্যাগীতি কোষ (ষষ্ঠ মুদ্রণ সংস্করণ) : নীলরতন সেন, কলকাতা, ১৯৭৮

(১০) জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ : জলপাইগুড়ি, ১৯৭০

(১১) ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব : মুহম্মদ আবদুল হাই, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪

(১২) ধ্বনি-বিজ্ঞানৰ ভূমিকা : গোলকচন্দ্র গোস্বামী, গৌহাটি, ১৯৭৭

(১৩) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী নির্দেশিকা : অমল কুমার দাস ও শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তপশিলী ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৭

(১৪) বড়ো অসমীয়া অভিধান : রাজেন্দ্রলাল মার্ডারী, শিলং, ১৯৬২

(১৫) বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড) : রমেশচন্দ্র মজুমদার, কলকাতা, ১৯৭৪

(১৬) বাংলা ভাষা : পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৯৭৬

(১৭) বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা (প্রথমাংশ) : দ্বিজেন্দ্র নাথ বসু, কলকাতা, ১৯৭৫

(১৮) বাংলা ভাষা পরিক্রমা (২ খণ্ড) : পরেশচন্দ্র মজুমদার, কলকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

(১৯) বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (২ খণ্ড) : জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, কলকাতা, ১৯৭৫

(২০) বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে : সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭৫

(২১) বাঙালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা : সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২

(২২) বাঙালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ

(২৩) বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব (২ খণ্ড) : নীহার রঞ্জন রায়, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০

(২৪) বাল্মীকি রামায়ণ : উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় অনুদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ

(২৫) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলকাতা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ

(২৬) বিষ্ণুপুরাণ : বঙ্গবাসী প্রকাশিত, কলকাতা, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ

(২৭) ভাষার ইতিহাস : মুরারী মোহন সেন, কলকাতা, ১৯৭৭

(২৮) ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন, কলকাতা, ১৯৭৫

(২৯) ভাষা প্রকাশ বাঙালা ব্যাকরণ : সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

(৩০) মহাভারত (বেদব্যাসকৃত) : কালী প্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুদিত, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৪

(৩১) যোগিনীতন্ত্রম্ : দত্ত বড়ুয়া অ্যান্ড কোম্পানী, গৌহাটি, ১৯৭২

(৩২) রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস : উপেন্দ্র নাথ বর্মণ, জলপাইগুড়ি, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ

(৩৩) রাজবংশী অভিধান : কবীন্দ্র নাথ বর্মণ, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

(৩৪) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

(৩৫) A Bengali Phonetic Reader : Suniti Kumar Chatterji, London, 1928

(৩৬) A Comparative Vocabulary of the Gondi Dialects : J. Burrow and S. Bhattacharya, The Asiatic Society, Calcutta, 1960

(৩৭) A complete Dictionary of the Languages of India and High Asia : W.W. Hunter, Delhi, 1978

(৩৮) A Descriptive Analysis of the Boro Language : Promod Chandra Bhattacharya, Gauhati University, 1977

(৩৯) A Dictionary of Linguistics : M.A. Pu and F. Gaynor, Peter Owen, London, 1965

(৪০) A Dictionary of Tibetan and English : Alexender Cosma de Covos, (Assisted by Sangs Rgyas Phun Tshogs) Delhi, Reprint, 1978

(৪১) A Dravidian Etymological Dictionary : J. Burrow and M.B. Emenew Oxford University, London, 1961

(৪২) A Reader in Historical and Comparative Linguistics : Allan R. Keiler, Holt, Rinehart and Winston Inc. U.S.A. 1972

(৪৩) A Study on Kamrupi, A Dialect of Assamese : Upendra Nath Goswami, Gauhati, 1970

(৪৪) A Survey of Structural Linguistics : B.C. Lepschy, Faber and Faber, London, 1972

(৪৫) A Tri-lingual Dictionary : Govinda Gopal Mukhopadhyay and Gopika Mohan Bhattacharya, Calcutta, 1966

(৪৬) An Etymological Dictionary of Bengali (Two Volumes) : Sukumar Sen, Calcutta, 1971

(৪৭) An Encyclopeadic Dictionary of Sanskrit : A.M. Ghatagi, Poona, 1976

(৪৮) An Introduction to Descriptive Linguistics : H.A. Gleason, Jr., Delhi, 1979

(৪৯) An Introduction to Language : Victoria Fromkin and Robert Rodman, Holt, Rinehart and Winston Inc. U.S.A., 1974

(৫০) Assamese, Its Formation and Development : Banikanta Kakati, Gauhati, 1972

(৫১) Bengali Language, Historical Grammar (Two Volumes) : Atindra Majumdar, Calcutta, 1972

(৫২) Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement : H.N. Chowdhury, Cooch Behar, 1903

(৫৩) Descriptive Ethnology of Bengal : E.T. Dalton, Calcutta, 1872

(৫৪) Dictionary of Foreign Words in Bengali : Gobinlal Bonerjee, University of Calcutta, 1968

(৫৫) English-Sanskrit Dictionary : Anundoram Borrooah, Gauhati, 1971

(৫৬) General Linguistics, An Introductory Survey : R.H. Robens, Longman Group Limited, London, 1971

(৫৭) Guide to Transformational Grammar : John T. Grinder, Holt, Rineh and Winston Inc., U.S.A., 19

(৫৮) Historical Linguistics and Indo-Aryan Languages : A.M. Ghatage, University of Bombay, 1962

(৫৯) Introduction to Bengali : E.C. Dimock, Jr., S.Bhattac and S. Chatterji, Delhi, 19

(৬০) Introductory Readings on Language : Wallace L. Anderson and N. Stageberg, Holt, Rinehart Winston Inc., U.S.A., 1975

(৬১) Invitation to Linguistics : Mario Pei, George Allen and Unwin Ltd., London, 1965

(৬২) Kirata Jana Kriti : Suniti Kumar Chatterjee, The Asiatic Society, Calcutta, 1974

(৬৩) Language : Leonard Bloomfield, George Allen and Unwin Ltd., London, 1969

(৬৪) Language and Learning : Games Britton, Penguin Books Ltd. England, 1980

(৬৫) Language, its Nature, development and Origin : Otto Jesperson, George Allen and Unwin Ltd., London, 1969

(৬৬) Linguistic Survey of India, Vol. V, Part I : G.A. Grierson, Delhi, 1968

(৬৭) Linguistics : David Crystal, Penguin Books Ltd., England, 1980

(৬৮) Literature of Kamta Kochbihar Raj Darbar : A.K. Chakraborty, Dhubri, Assam, 1964

(৬৯) Modern Linguistics : Neli Smith and Deirdre Wilson, Penguin Books Ltd., England, 1980

(৭০) Manual of Phonetics (Two Volumes) : Edited by Bertil Malmberg, North Holland Publishing Company, London, 1970

(৭১) Nepali Language, Its History and Development : Dayanand Srivastava, Calcutta University, 1962

(৭২) New Horisons in Linguistics : Edited by John Lyons, Penguin Books Ltd. England, 1980

(৭৩) Nominal Composition in Middle Indo-Aryan : G.A. Davane, Poona, 1956

(৭৪) Old Bengali Language and Text : T.P. Mukherjee, University of Calcutta, 1963

(৭৫) Outline of Linguistic Analysis : B. Bloch and G.L. Trager, Baltimore, 1942

(৭৬) Phonetic Change in Indo-Aryan Languages : S.C. Majumdar, Vaishali, 1974

(৭৭) Phonetics : J.D.O. Connor, Penguin Books Ltd. England, 1976

(৭৮) Pisaca Language of North-Eastern India : G.A. Grierson, Delhi, 1969

(৭৯) Semantics (Two Volumes) : John Lyons, Cambridge Univer-sity Press, 1978

(৮০) Semantics : Geoffrey Leach, Penguin Books Ltd., England, 1981

(৮১) Sign, Symbol and Script : Hans Jenson, George Allen and Unwin Ltd. London

(৮২) Socio-linguistics : Edited by B. Pride and Janet Holmes, General Editor-David Cryslal, Penguin Books Ltd. England, 1972

(৮৩) Statistical Account of Bengal, Vol. X : W.W. Hunter, Calcutta, 1076

(৮৪) Tabquat-i-Naseri : Minhaju-s-Siraj (Translated by Reverty), London, 1881

(৮৫) The History, Antiquity, Topography and Statistics of Eastern India : M. Martin, Calcutta, 1838

(৮৬) The Life of Mir Jumla : J.N. Sarkar, Calcutta, 1951

(৮৭) The Origin and Development of the Bengali Languages, 3 Volumes : Suniti Kumar Chatterji, Calcutta, 1975

(৮৮) The Origin and Development of Bhojpuri : Udai Narayan Tiwari, The Asiatic Society, Calcutta, 1960

(৮৯) The Place of Assam in the History and Civilisation of India : Suniti Kumar Chatterji, Gauhati University, 1970

(৯০) The Rajbanshis of North Bengal : Charu Chandra Sanyal, The Asiatic Society, Calcutta, 1965

(৯১) The Science of Language : F. Max-Mullar, Delhi, 1965

(৯২) The Tribes and Castes of Bengal : H.H. Risley, Calcutta, 1891

(৯৩) Verbal Composition in Indo-Aryan : R.N. Vale, Poona, 1948

(৯৪) Wild Tribes of India : H.B. Rowny, Calcutta, 1872

(৯৫) Census Report of India, 1872, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1951, 1961, 1971

(৯৬) District Census Hand book, Cooch Behar, Jalpaiguri, Darjeeling, West Dinajpur, Malda, Census-1961, 1971

পত্রপত্রিকা

(১) বাংলা সাহিত্য পত্রিকা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

(২) বিশ্বভারতী পত্রিকা : বিশ্বভারতী

(৩) মধুপর্ণী : বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর

(৪) রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা : রবীন্দ্র ভারতী, কলকাতা

(৫) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : রঙ্গপুর

(৬) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা : কলকাতা

(৭) সাহিত্য পত্রিকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(৮) Indian Linguistics : Linguistic Society of India, Madras

(৯) Journal of the Asiatic Society of Bengal : Calcutta

(১০) Journal of the Department of Letters : Calcutta University